ছোট গল্প যাঁদের আদর ও ভালবাসা
পেয়েছে, তাঁদের হাতেই—

—ঃ আরা প্রকাশনীর অন্যান্য বই ঃ—

কবিতা সঙ্কলন—সোনালী রোদের বন্যা

উপন্যাস—ঝরা বসন্ত

নাটক—ব্যথার প্রদীপ

কবিতা—সাম্পান

রম্য রচনা—চলার পথে (যন্ত্রস্থ)

সোনালী রোদের বন্যা (২য় খণ্ড, যন্ত্রস্থ)

সবিনয় নিবেদন,

'এই পৃথিবী' বাইণ্ডিং-এর মুখে সংবাদ পেলাম কিছু ছাপা কাগজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এরকম পরিস্থিতির মুখে আমরা অসহায় বোধ করছি। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও যে বড় ধরণের ত্রুটি থেকে যাচ্ছে, তার জন্যে সুহৃদ পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা সব কিছু পরিশোধ করে দেবো।

শেখ নজরুল ইসলাম

কিছু বলবো বলে ঃ

বাংলা সাহিত্যাকাশে ছোট গল্পের মৃত্যু পরোয়ানা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা ঝুলিয়ে দিয়েছেন তাঁরা কতটুকু সত্যিকার সাহিত্য প্রেমিক জানি না, তবে বাংলা সাহিত্য সম্প্রদ নিয়ে আমাদের গর্ব করার দিনও ফুরিয়ে এসেছে। ছোট গল্প নিযে প্রকাশকের দরবারে হাজির হলে তিনি সামনের সোজা রাস্তা দেখিযে দেন। পত্রিকা সম্পাদক গল্প ছাপেন না এই অজুহাত দেখিয়ে মুখ ঘুরিয়ে অন্য কাজে ডুবে যান। গাঁটের কড়ি খরচ করে বই প্রকাশ করা ছাড়া ছোট গল্প লেখকের আর কোন পথই সামনে খোলা থাকে না। বাধ্য হযে গল্প লেখক নিজের পযসাতেই একখানা গল্প সঙ্কলন

গল্পাংশ

সংগ্রাম	অপূর্ব বিকাশ সেন	৫
শুধু চোখ দিয়ে	সুনীল কুমার চৌধুরী	৯
কসাই	শিশির বিশ্বাস	১৭
নবারুণ	ভয়ংকরী রূপায়ণা	২৩
প্রতীক্ষা	সলিল কুমার ভৌমিক	২৮
স্বীকারোক্তি	দীপঙ্কর সেন	৩২
অনুশোচনা	শিপ্রা মুখোপাধ্যায়	৩৫
সুন্দর	মহঃ রফিক	৩৮
কার জন্যে	গোপা মুখোপাধ্যায়	৪১
কৃষ্ণ সমাচার	জয়ন্ত চক্রবর্ত্তী	৪৭
বিধবা	আরণ্যক	৫০
সমীকরণ	শোভেন বন্দোপাধ্যায়	৫৭
নগ্ন নির্জন	অমিয় মুখোপাধ্যায়	৬৩
বংশীবালা	শেখ গিয়াসউদ্দিন	৬৮
অজান্তে	গৌতম চট্টোপাধ্যায়	৭৩
কখনও অন্ধকারে	রতন মহাপাত্র	৭৬
সৌদামিনী	তরুন কুমার চট্টোপাধ্যায়	৮০
হুকারী	সূর্যকান্ত নন্দী	৮৫
নবমী নিশি	মৃনাল চক্রবর্ত্তী	৮৭
ওয়েসিস্	শেখ গোলাম মইনুদ্দিন	৯২

কবর	অতুল দাস	৯৪
খাঁচার পাখী	নিতাই চন্দ্র রায়	৯৯
কাক জ্যোৎস্না	দীপ্তি প্রকাশ ভট্টাচার্য্য	১০৩
অলকার বিয়ে	গৌরীশঙ্কর দাস	১০৬
ভালোবাসা কারে বলে	নীলিমা পাল	১০৯
রাহেলা	সামসুন নাহার ইসলাম	১১১
হারানো আলো	সলিল কুমার দত্ত	১১৩
শুভদৃষ্টি	দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	১১৬
ভাগ্যরত্ন	গিরিশ চন্দ্র রায় বর্মণ	১১৮
আধুনিকা	অনিমেষ চক্রবর্তী	১২২
স্বপ্নের সমাধি	এম রফিক	১২৪
যাযাবর	প্রতাপ চন্দ্র সরকার	১২৭
সাদা পর্দার আড়ালে	তালাত আমেদ তরফদার	১৩০
সেই মুখ কোথায়	কিঙ্কর দাশগুপ্ত	১৩৩
ফেলে আসা দিনগুলি	লীনা রায় [খুকু]	১৪৫
শান্তনুর গল্প	নন্দলাল আচার্য	১৪৮
গল্প নয়	সৌরভ	১৭৭
ছোরদি	অভয়া মুখোপাধ্যায়	১৯৬

যা হতে পারত

সম্পূর্ণ ভাবে সোনালী রোদের বন্যার আলাদা একটি খণ্ড বার হবার কথা। হতোও তাই। কিন্তু পরিস্থিতি ও ঘটনার চক্রে এই পৃথিবীর গল্পের সংগে বন্যার দ্বিতীয় খণ্ডের কবিতা গুলো দিয়ে একটি সংকলন প্রকাশ করে দেওয়া হোলো।

বন্যার দ্বিতীয় খণ্ডের পাতায় বহু পরিচিত মুখের দেখা পাওয়া যাবে। এদের সম্পর্কে নতুন করে বক্তব্য নেই। স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রুফ দেখার কাজে ক্রটী হীন হয়নি। যার জন্যে কিছু কিছু ভুল চোখে পড়তে পারে। যথেষ্ট সময় না পাওয়ার জন্যে ভুল ক্রটী থেকে গেলো।

অথচ অনেক ভালো ভাবেই সংকলনটি সকলের হাতে তুলে দেওয়া যেতো। পরবর্ত্তী সোনালী রোদের বন্যার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ হবে। কবি বন্ধুদের যোগাযোগ করার জন্যে আহ্বান জানিয়ে রাখছি।

শেখ নজরুল ইসলাম

সূচীপত্র

কবিতাংশ

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ১৬৩

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কবিতা ১৬৪

শেখ নজরুল ইসলামের কবিতা—

সেই দিন ১৬৫

দীর্ঘার বিথীতলে ১৬৬

সেই অনাগত দিনে ১৬৬

স্নেহ সাগরে ১৬৮

আজ শুধু তারই পথ চাওয়া ১৬৯

সব কিছু নিয়ে গিয়েছে সেই পাখী ১৬৯

সে দিন জুবিলি পার্কে ১৭০

খেতাব তুমিই পাবে ১৭২

শকুনের হাসিতে আমরা ১৭২

মানসী ১৭৩

সাগরে মিশে যাবে একদিন ১৭৩

এমনি করে আর কত দিন ১৭৪

পাওয়ার পূর্ণতায় ১৭৫

একটি দিনের জন্য ১৭৬

মনবত্তর সুলতানার [সরস্বতী সাহা] কবিতা—

প্রশ্ন ১৭৭

তুমি পরাজিত নও ১৭৮

নিজের অজান্তে ১৭৮

বিষণ্ণ মন ১৭৯

ভালোবাসার ডাক ১৮০

বসন্ত ১৮০

জাফরি		১৮১
আমরা		১৮২
জনতার মিছিলে		১৮৩
তোমার জন্য		১৮৩
সে জীবনের বুঝি অন্ত নেই		১৮৪
হঠাৎ মেঘ হঠাৎ বৃষ্টি		১৮৫
চির বিজয়ী আমরা		১৮৫
সমুদ্র সৈকত		১৮৬
মানুষ কেন মরে		১৮৭
সফল স্বপ্ন		১৮৭
কবিতা একান্ত আমার		১৮৮
তুলনা		১৮৮
সাবধান ! নগরবাসী সাবধান !	শ্রীমৃগাঙ্ক শেখর রায়	১৮৯
এর জন্যই কি সংগ্রাম	শ্রীমৃগাঙ্ক শেখর রায়	১৯০
অতএব মানসী	অসিত কুমার বসু	১৯১
বন্ধুর বিদায়ে	শিশির কুমার মাইতি	১৯২
মনে করো	তাপস কুমার মণ্ডল	১৯২
হৃৎপিণ্ড	শ্রীমান বসন্ত বৌবী	১৯৩
রূপসী কবিতা	অনিল কুমার চক্রবর্ত্তী	১৯৫
যাত্রা কর শুরু	প্রবীর সরকার	১৯৫
একক	নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য্য	১৯৬
শ্রীমতী বিমলা বসুর কবিতা—		
রুদ্ধ বেদনা		১৯৭
সঠিক		১৯৭
ভিক্ষা		১৯৮
বন্ধন মুক্ত		১৯৯
পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো/পবিত্র ভূষণ সরকার		২০০

একটি যুবকের অকাল মৃত্যু	শ্রীঅঞ্জন সরকার	২০১
জীবনানন্দ দাস, তোমাকে	নির্মল কুমার সিংহ মহাপাত্র	২০২
প্রয়াসী	মহঃ রফিক	২০৩
কবিতার জন্য	নিতাই চন্দ্র রায়	২০৩
বন্দী শিবিরেব বন্ধুকে	শ্রীমতী শুভা চন্দ	২০৫
চিন্তাগুলো আমার মেয়ো অভিধানে	ধ্রুবজ্যোতি বাগচী	২০৫
ভাগ্যের দোষে	অমলেশ ভট্টাচার্য্য	২০৫
এ রাত	অতুল দাস	২০৬
উত্তর তিরিশ	পার্থ সারথি	২০৭
সেখ সাদরে আলমের কবিতা—		
রাত্রি বাস		২০৮
পরিবর্ত্তন		২০৮
সমাধি		২০৮
রাত্রি গভীর	ভাস্কর ভট্টাচার্য্য	২০৯
নির্জন তটিনী	গীতা ভট্টাচার্য্য	২১০
সে কি সুখী যে জন উদাসী	অভিজিত ঘোষ	২১১
নদীর খেলা	গীতা ভট্টাচার্য্য	২১২
দু'টি মিছিল কাল সকালে	নির্ম্মল সেনগুপ্ত	২১২
প্রেম	অমলেশ ভট্টাচার্য্য	২১৩
পল্লীর ইজ্জত রানী	অমলেন্দু রায়	২১৪
আর আমি আলোর স্বর্গে যাব না'ক/নন্দ দুলাল আচার্য্য		২১৫
আত্মরূপ	অঞ্জন মজুমদার	২১৫
আর বোলনা 'জেগোনা'	তুহিন শংকর চন্দ	২১৬
পঁচিশ বছরের স্বাধীনতা ও আমরা/সলিল কুমার দত্ত		২১৭
যেহেতু	সোনালী দত্ত	২১৮
কফি হাউসে	অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়	২১৯
কে নেবে এ বিচারের ভার	তপন চৌধুরী	২২০
আসামের আয়নায় বাংলা	তপন চৌধুরী	২২১
অসীম শূন্যতা	জয়ন্ত বিজয় দাশ	২২১

শঙ্কর ঘোষের কবিতা—
কর্ত্তব্য ২২২
ভালবাসার সঙ্গী ২২২
ডাইরির ছেঁড়া পাতা অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়
লিমেরিক ২২৩
ধারাবাহিত ২২৩
মনে রেখো কল্যাণ মুখোপাধ্যায় ২২৪
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা—
মধ্যবিত্তে ট্র্যাজেডী ২২৫
বিবক্ষা ২২৫
রহস্য সন্ধানী সন্তোষ সেনগুপ্ত ২২৬
আমার প্রেমের মৃত্যু হল মহাম্মদ হাফিজ ২২৭
স্কেচ পুলিন চক্রবর্ত্তী ২২৮
রিলিফরোড পার হয়ে অলোক ভাদুড়ী ২২৯
একটি পাগলের জন্য গোপীনাথ দাস ২৩০
ব্যর্থতার ইজেলখানা দেবাশীষ দাস ২৩১
রবীন্দ্রনাথ দরজীর কবিতা—
সুভদ্রা ২৩২
পরিবর্ত্তন ২৩৩
সভ্যতার দ্বার নির্মল কুমার মাইতি ২৩৬
দুনিয়ার সংগা বৃন্দাবন গুছাইত ২৩৭
পলাতক সাথী রায় ২৩৮
আমরা বেকার অলোক কুমার নন্দী ২৩৯
সৈনিক দুর্গাপ্রসন্ন মালাকার ২৪০
হারানো প্রেমিকার সন্ধানে পবন কুমার মাহাতো ২৪১
গোপা মুখোপাধ্যায়ের কবিতা—
রাধা ২৪২
যুগের দাবী ২৪২
চাহিবার নাই কিছু আর ২৪৩
আমার যে ২৪৪

সংগ্রাম

অপূর্ববিকাশ সেন

তেমাথার মোড়ের কাছাকাছি এসেই সুমিতার মনটা অস্বস্তিতে ভরে উঠল। এখনই দেখা হয়ে যাবে সেই রকবাজ ছেলেগুলোর সঙ্গে। তাকে দেখেই শিস্ দিয়ে উঠবে, আর সেই সঙ্গে দু-একটা আশালীন মন্তব্য। কিছু বলা যাবে না। প্রতিবাদ করতে গেলে আরও বাড়াবাড়ি করবে।

হ্যাঁ, যা ভেবেছিল তাই। মূর্তিমানগুলো ঠিক বসে আছে। একদিনও কি কামাই নেই! এতক্ষণে ওরাও তাকে দেখতে পেয়ে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র শিস্ধ্বনি। সমস্ত পাড়াটা যেন সচকিত হয়ে উঠল। প্রচণ্ড বিদ্বেষ নিয়ে সুমিতা নীরবে চোখদুটি নত করে পথটা অতিক্রম করল।

বাড়ী গিয়েই সুমিতা নালিশ জানাল মায়ের কাছে। 'জান মা, ও পাড়ার ছেলেগুলো দিন দিন যা শুরু করেছে না, রাস্তা চলাই দায়।'

মেয়ের কথার ঝাঁঝে মা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'তুই কিছু বলিস্নি তো সুমি?'

বইগুলো তাকের ওপর রাখতে রাখতে সুমিতা বলল, 'না, এখনও কিছু বলিনি। তবে একদিন কিছু না বললে আর চলছে না।'

'না, না, তুই কিছু বলতে যাস্নি। তাহলে ওরা বাড়াবাড়ি করবে।'

'বাড়াবাড়ি করলে থানায় জানিয়ে আসব না।'

'তাতে আর লাভ হবে কী? পুলিশে না হয় কাউকে ধরে নিয়ে যাবে। তারপর একদিন তোর বাবার মাথায় বোম পড়বে।'

তা সত্যি; ওদের অসাধ্য কিছু নেই। ওই ভয়েই তো সুমিতা কিছু বলে না। 'জান মা, কদিন থেকে দেখছি গাঙ্গুলীদের বড় ছেলেটাও ওদের দলে ভিড়েছে।'

'হ্যাঁ, আমার চোখেও একদিন পড়েছে। ছেলেটা আগে কিন্তু ওরকম ছিল না।'

সেদিন সুমিতাদের স্কুল কি উপলক্ষ্যে 'হাফ হলিডে' হয়ে গেল। দুপুরে রাস্তাটায় মোটেই লোক চলছিল না। দলের দুই-একজন অতি উৎসাহী ছোক্‌রা রোয়াক থেকে উঠে এসে পথ আগ্‌লে দাঁড়াল। সুমিতা এতটা ভাবতে পারেনি। রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল। তবু গলায় যতটা সম্ভব জোর এনে বলল, 'রাস্তা ছাড়ুন।'

'যদি না ছাড়ি।'

এমন সময় গাঙ্গুলী বাড়ীর ছেলেটা বলল, 'ছেড়ে দে ভোম্‌লা, দেখছিস্‌ না কেমন ভয় পেয়ে গেছে। হয়ত কেঁদেই ফেলবে।'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। ভোম্‌লা, আর তার সঙ্গী পথ ছেড়ে দিল। এই প্রথম সুমিতা মৃদু গলায় বলল, 'ছোট লোক।'

সকলে আর একবার হো হো করে হেসে উঠল।

না, যাকে বলে লাভ নেই। বাবার মাথায় বোমা পড়ার ভয়ে পুলিসের কাছেও যাবে না। তার চেয়ে ওই রাস্তাটা ত্যাগ করতে হবে। ওদিকে আর একটা রাস্তা আছে। অনেকটা ঘুরতে হয়। কিন্তু উপায় কি।

কটা দিন বেশ নিরুপদ্রবেই কাটল। কিন্তু এড়িয়ে যাব বললেই কী আর যাওয়া যায়। সেদিন বাস স্টপেজে গিয়েই দেখল গাঙ্গুলীবাড়ীর ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে।

'কী, আর দেখতে পাই না যে?' যেন কতকালের আলাপ। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। তবু সুমিতা একটু বিদ্রূপ করার লোভ সামলাতে পারল না। বলল, 'কেন শিস্‌ মারার সুবিধা হচ্ছে না?'

'শিস্‌ দিতে তো পারি না আমি।'

'সে কি! এতদিনেও শেখেননি।'

'না, চেষ্টাও করিনি।'

'খুব সাধুপুরুষ। লজ্জা করে না মেয়েদের পেছনে লাগতে?'

'অনেক কিছুর অভাবের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জার অভাব ঘটেছে।'

'আপনি আগে তো এরকম ছিলেন না?'

'বছরের পর বছর বেকার হয়ে বসে থাকলে এর চেয়ে ভাল কিছু হওয়া যায় না।'

'লেখাপড়া করলে তো পারতেন?'

'লেখাপড়ার খরচটা চালাবে কে? বাবার আয় তিনশ' টাকা। দুখানা ঘরের ভাড়া আশী টাকা। আমরা পাঁচ ভাইবোন। ছোট ভাইবোনগুলোরও পড়াশুনা আছে। কলেজে পড়াবার খরচ বাবা আর জোগাতে পারলেন না। ট্যুইশানির চেষ্টা করলুম। কিন্তু কুড়ি টাকায় যেখানে বি. এ. পাশ মাষ্টার পাওয়া যায়, সেখানে স্কুল ফাইনাল পাশ মাষ্টার কে আর রাখবে। আর চাকরী পাওয়ার আশা তো আরো দুরাশা।

সুমিতা এবার একটু সুর নরম করে বলল, 'কিন্তু রকে বসে আড্ডা না মারলে কী সময় কাটানো যায় না?'

'যায় হয়তো। কিন্তু আমি তো দেখি না। প্রথম প্রথম বাড়ীতে বসে গল্পের বই পড়তুম। কিন্তু রাতদিন মায়ের গঞ্জনার জ্বালায় বাড়ী ছাড়তে হলো এখন দুপুরে একবার খেতে বাড়ী ঢুকি, আর রাত্রে।'

'কিন্তু এদের দলে না ভিড়ে পার্কে বসে থাকলে হয়।'

'একা একা মানুষ আর কতদিন কাটাতে পারে। তাছাড়া এরাও সবাই খুব খারাপ নয়। অভাব আর হতাশার মধ্যে থেকেই এরা এরকম হয়েছে। এইভাবেই সামান্য আনন্দ উপভোগ করে। একটা চাকরী পেলেই দেখবেন ওরা ভদ্র হয়ে গেছে।' একটু চুপ করল সে। একটা বাস এলো। গাঙ্গুলিবাড়ীর ছেলেটা বলল, 'চলি আমার বাস এসে গেছে। একটা ইন্টারভিউ আছে।'

সুমিতার বাস এখনও আসেনি। কথা বলার জন্য ওরা স্টপেজে এসে একটু সরে দাঁড়িয়েছিল। সুমিতা এবার ধীরে ধীরে বাস স্টপেজে এসে দাঁড়াল। ছেলেটার কথাগুলো ভাবতে লাগল। সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করা না গেলেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না কথাগুলো।

'হ্যাঁরে, তুই নাকি আজকাল রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাঙ্গুলিবাড়ীর ছেলেটার সঙ্গে গল্প করিস্?'

মায়ের কথার জবাবে সুমিতা হঠাৎ কিছু বলতে পারে না। তারপর একটু থেমে বলল, কে বলল তোমায়?'

'কেন বোসগিন্নী নিজের চোখে দেখেছে।'

এবার সুমিতা বলল, গল্প নয় মা, দুই একটা কথা বললে জবাব দিই মাত্র।'

'তা তোর সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলারই বা তার দরকার কী? আর কথা বললেও তুই কথার জবাব দিবি কেন?'

'বারে, কথা বললে জবাব দেব না। খারাপ কিছু তো আর বলছে না।'

'খারাপই বলুক আর ভালই বলুক, ওসব বখাটে ছোঁড়ার সঙ্গে তুমি কথা বলবে না।'

'অজয় কিন্তু খারাপ ছেলে নয়।'

'কিন্তু তুই-ই সেদিন ওকে খারাপ বলেছিলিস্।'

'তখন আমি ওকে জানতুম না।'

'ও, এরই মধ্যে সব জানাজানি হয়ে গেছে। তবে আর কী, দিদির মতো তুমিও এবার পথ খুঁজে নাও।'

'তাহলে তো তুমিই বাঁচো। বিয়ের খরচটা বেঁচে যাবে।'

মা আর সহ্য করতে পারলেন না। ঠাস্ করে মেয়ের গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন। বহুদিন পরে মায়ের হাতে চড় খেয়ে সুমিতা প্রথমটায় অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর অভিমানে চাপা-কান্নার বেগ সামলাতে সামলাতে ঘরে গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

অতবড় মেয়েকে রাগের বশে হঠাৎ মেরে মায়ের মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু 'খরচ বেঁচে যাওয়ার' খোঁচাটা তিনি সামলাতে পারেননি। কথাটা অতি নিষ্ঠুর সত্য। মেয়ের বিয়ে দেওয়ার খরচের হাত থেকে তিনি বেঁচে গেছেন সত্যি, কিন্তু তাই বলে মেয়েটা চলে যাওয়ার আঘাত তিনি কম পাননি। মেয়ের বাপেরও রাগ কম নয়। মেয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে বলে ও মেয়ের মুখও আর দেখবেন না বলে পণ করেছেন। মায়ের মনটা আকুলি-বিকুলি করে।

রাত্রে স্বামীকে খেতে দিয়ে সুমিতার মা বলেন, 'হ্যাঁগো, মেয়েটার যে বয়েস হচ্ছে, বিয়ে থা দেবে না নাকি ?'

মুখের রুটিটাকে চিবিয়ে নিয়ে হরিহর বলেন, 'বিয়ে! কার বিয়ে ? সুমির ?'

সর্বাণী মুখ ঝামটা দিয়ে বলেন, 'তবে নাতো কি আমার ?'

'আহা, আমি তাই বলছি নাকি ? বলছিলুম যে সুমির কী এমন বয়েস হয়েছে যে এখনই বিয়ে দিতে হবে।'

'না, বয়েস কী আর হয়েছে? এই অঘ্রাণে সতেরয় পা দিয়েছে।'

'তা এবয়সে আজকাল মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে নাকি।'

'তা কমটাই বা কী হয়েছে? আসছে বছর পাশ দেবে। তখনই ওর বিয়ে দেব। এখন থেকে চেষ্টা না করলে হবে?'

'চেষ্টা তো করব, কিন্তু টাকা পাব কোথায়?'

'তার মানে অমিতার মতো কিছু একটা হলেই তোমার সুবিধা হয় কেমন? খরচ বেঁচে যাবে।'

হরিহরবাবুকে এবার খুব অসহায় দেখাল। আঙুলে করে রুটিটা ছিঁড়তে গিয়েও থেমে গেলেন। তারপরে একটু পরে ধীরে ধীরে বললেন, 'সে রকম কিছু দেখেছ না কি?'

'তুমি-আমি চোখ বুজে থাকলেই সবাই তো আর চোখ বুজে নেই।'

'কেন, কে আবার কী দেখল?'

'সে খোঁজে তোমার দরকার নেই। তোমাকে যা বললুম তাই খোঁজ।'

সুমিতা আজকাল আবার সোজাপথ দিয়েই যাতায়াত করে। সুমিতাকে দেখে রোয়াকের ছেলেগুলো আর শিস্ দিয়ে ওঠে না। সেদিন অজয় তার পেছন পেছন এসে ধরে ফেলল। সুমিতা জিজ্ঞাসা করল, 'সেই যে ইণ্টারভিউটা দিয়ে এলেন, তার খবর কিছু পেয়েছেন?'

'না, ব্যাটাদের লোক ঠিক করাই আছে, কেবল লোক দেখানো ইণ্টারভিউ নেওয়া।' দুই একটা সাধারণ কথার পরই সার্টিফিকেট দেখতে চাইলেন। স্কুল ফাইনালের সার্টিফিকেটটা দেখার পর একজন বললেন, "কোনও ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট নেই?" বললুম, "আজ্ঞে না, আমাদের পাড়ায় কোনও মন্ত্রী বা এম. এল. এ. বা কাউন্সিলার বাস করেন না; আর আমি রাজনীতিও করি না। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ নেই। অবশ্য কারও 'থ্রু'তে গেলে একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করা কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু সেটা সত্য হবে না। তাছাড়া ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের অনেকেই নিজেরা দেবোপম চরিত্রের নয়। সুতরাং তাঁদের কাছ থেকে আমার 'ক্যারেকটার সার্টিফিকেট' নেবার ইচ্ছা হয় না।"

সব শুনে ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে বললেন, "আপনি আসতে পারেন।" ব্যস্, আর কি, বুঝলুম, চাকরী আর ওখানে হচ্ছে না।'

সুমিতা চুপ করে রইল। অজয়ই আবার বলল, 'শুনলুম, কাল তোমাকে দেখতে এসেছিল!'

সুমিতা হেসে বলল, 'এর মধ্যে সে খবরও পেয়ে গেছেন?'

'খবরটা পাওয়া কী খুব শক্ত? তা ওদের পছন্দ হয়েছে?'

'না।' তারপর হেসে বলল, 'জানেন ওদেরও বোধ হয় কনে ঠিক করাই আছে।' না হলে মেয়ে দেখতে এসে কেউ জিজ্ঞাসা করে, "উত্তম আর সৌমিত্রের মধ্যে কাকে আপনার ভাল লাগে?"

দুজনেই হেসে উঠল। অজয় বলল, 'ছেলের বন্ধুরা এসেছিল বোধ হয়?'

'হ্যাঁ। পাত্র নিজেও ছিল।'

'তা তুমি কি বললে?'

বললুম, "দুজনকেই ভালবাসি। কিন্তু কারও সঙ্গেই বিয়ে হবার চান্স নেই।'

আবার দুজনে হেসে উঠল। কিছুক্ষণ পরে অজয় বলল, 'যদি আমি একটা চাকরী পেতুম…'

'তাহলে আমাকে বিয়ে করতেন, তাই না?' সুমিতা হেসে বলল।

অজয় একটু ম্লান হেসে বলল, 'তোমার অবশ্য আমাকে পছন্দ হবে না। বখাটে ছেলে বই তো নই।'

'বেশ তো, চাকরী একটা পানই না। তারপর দেখবেন পছন্দ হয় কি না!'

'ততদিন তুমি থাক কি না তার ঠিক নেই।'

'ভয় নেই, বাবার টাকা নেই।'

অফিস থেকে ফিরে হরিহরবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুমি কোথায়?'

সর্বাণী উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন, কী হয়েছে?'

'ওকে বলে দাও, আর ওকে স্কুলে পড়তে হবে না।'

'কী আবার হলো?'

'ওর জন্যে আমাকে লোকের টিট্‌কিরি সহ্য করতে হবে?'

'কে আবার কী বলল ?'

'ওই যে মিত্তির মশাই। একগাড়ি লোকের মধ্যে ট্রামেই বলে বসল, "রায়, তোমার মেয়ে নাকি গাঙ্গুলীর ছেলের সঙ্গে মেশে ? রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করে ? তা বাপু, তোমার বড় মেয়েটা যে জাতেরই হোক্ একটা চাকুরে ছেলের সঙ্গে পালিয়ে ছিল, এ মেয়েটার দেখছি সে বুদ্ধিও নেই।" ওর জন্যে আমাকে এইসব শুনতে হবে ?'

হরিহরবাবু ঘরে ঢুকে মেয়েকে বই নিয়ে পড়তে দেখে রাগে বইগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'আর পড়তে হবে না। বাড়ী থেকে একদম বের হবে না।

ক্ষোভে আর অপমানে সুমিতার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো। বলল, 'তা বইগুলো ওভাবে ছুঁড়ে না ফেললেও পারতে বাবা, পুরানো বইয়ের দোকানে বিক্রী করলে কিছু পয়সা পাবে।'

হরিহরবাবুর মাথায় আগুন জ্বলছিল। মেয়ের এই বিদ্রূপে রাগের মাথায় এক চড় মেরে বললেন, 'আবার আমাকে বিদ্রূপ করা। আমার পয়সা থাক্ বা না থাক্, তোদের এতগুলোকে খাওয়াচ্ছে কে ?'

চড়টা আগে না পড়লে সুমিতা হয়তো জবাব দিত, এতগুলো হয়েছে কেন ?' কিন্তু চড় খেয়ে সুমিতা ততক্ষণে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। সর্বাণী স্বামীকে একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, 'তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে না কি ? এত বড় মেয়ের গায়ে হাত দিলে ?'

হরিহরবাবুরও ততক্ষণে খেয়াল হয়েছে যে, কাজটা তার খুব গর্হিত হয়েছে। মাথা হেঁট করে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সর্বাণী মেয়ের কাছে বসে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'কাঁদিস্‌নি মা, শোকে-দুঃখে ওঁর মাথার ঠিক নেই। কদিন থেকেই অফিসে গোলমাল চলছে। কজন ছাঁটাই হবে বলে শুনেছি। তার ওপর পাঁচজনের কথা শুনে রাগের মাথায় মেরেছেন। আর তুইও তো চুপ করে থাকতে পারতিস্। রাগটা পড়ে গেলেই ঠিক হয়ে যেত।'

সুমিতা কথা বলে না। ফুলে ফুলে কাঁদতেই থাকে।

সুমিতা রাত্রে কিছুতেই ঘুমতে পারছিল না। সেদিন মায়ের কাছে মার খেয়ে তার অভিমান হলেও এতখানি মনোকষ্ট হয়নি। আজ মনে হচ্ছে বেঁচে

থেকে লাভ নেই। মা অনেকক্ষণ সাধাসাধি করেও তাকে খাওয়াতে পারেননি। শেষে নিজেও না খেয়ে শুয়ে পড়েছেন। সুমিতাদের এই একখানাই ঘর। বাবা-মা আর তারা পাঁচ ভাই-বোন এক ঘরেই শোয়। সুমিতা আর নমিতা খাটের ওপর তিন ভাই আর বাবা-মা ঘরের মেঝেয়। আর একখানা ঘর ভাড়া দেওয়ার মতো টাকাই বা হরিবাবু পাবেন কোথায়। বারান্দারই খানিকটা ঘিরে রান্নাঘর, আর বাকি অংশটায় খাওয়া-দাওয়া হয়।

সুমিতা পাশ ফিরে শুল। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো ঘরের মেঝেতে এসে পড়েছে চান্টু, বাবু, খোকনদের গায়ে। আরো একটু পাশে নজরটা পড়তেই চম্‌কে চোখ ফিরিয়ে নিল সুমিতা। আবার ও-পাশ ফিরে শুল। প্রচণ্ড ঘৃণায় আত্মহত্যার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠল এত কাণ্ডের পর এ দৃশ্যের অবতারণা যে মানুষের পক্ষে সম্ভব ভাবতেই পারে না সে। যন্ত্রণায় মাথার শিরাগুলো যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছে তার।

চাঁদের আলোটা ধীরে ধীরে সরে এসে তার মুখের ওপর পড়ল। আঃ কী ঠাণ্ডা চাঁদের আলোটা। মাথার যন্ত্রণা তার একটু কমলো। মা-বাবার কথাটাও নতুন করে চিন্তা করতে পারল সুমিতা। জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে আসছে দারিদ্র্যের সঙ্গে কি সংগ্রাম করছে ওরা। নিজেরা একখানা ভাল কাপড় পরেন না। কিন্তু প্রতি বছর পুজোর সময় সাধ্যমত ভাল কাপড় কিনে দিয়েছেন তাদের। নিজেরা সিনেমা না দেখলেও সুমিতা আর নমিতাকে মাসে একখানা করে সিনেমা দেখতে পাঠান। সমস্ত কিছু থেকে নিজেদের বঞ্চিত রেখেছেন। পরস্পর ঘন সান্নিধ্যে কিছুটা তৃপ্তি তারা পান। অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য ভুলে যেতে পারেন দুঃখ দারিদ্র্যের কথা। দেশের অগণিত নরনারীই সামান্য তৃপ্তির মূলধন নিয়ে বৃহত্তর সুখ-ভোগের আশায় অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছে। সুমিতাই বা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে কেন? তাকেও সংগ্রাম করতে হবে। ধীরে ধীরে সুমিতার চোখে ঘুম নেমে আসে।

———

শুধু চোখ দিয়ে

সুনীলকুমার চৌধুরী

বিয়েতে সলিলের সায় ছিল না বললে ভুল বলা হবে। বরঞ্চ ওযে অনেকাংশে বিয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল একথাটাই ঠিক।

জীবনে মেয়েদের সংগে ও খুব একটা মেশেনি। বলতে কি, 'লভ-টভ' ওর মনে বড় একটা আসতো না। কিংবা, এলেও ও হয়তো সোৎসাহে মেনে নিতে পারেনি জিনিষটাকে। এসবক্ষেত্রে, ওর ভূমিকা ছিল অনেকটা পীচের বাইরে পড়া ক্রিকেটবলের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে ব্যাট না তোলা ব্যাটস্‌ম্যানের মত।

ওর মনে কি রকম একটা আশংকা ছিল। কি জানি, যে মেয়ের সাথে ওর প্রেম হবে সে যদি ওকে শ্রদ্ধা করতে না পারে! একেইতো বন্ধুবান্ধবদের কেউই ওকে সিরিয়াস্ আলোচনায় নিতো না। ও যদিও বা কোন সিরিয়াস আলোচনায় নাক গলাতে যেত তা কেউ-না-কেউ ওকে সরাসরি বলেই দিত,—"থাক লেটবাবু, আপনাকে আর শুনতে হবে না।" বন্ধুদের মুখে লেটবাবু নামটা শুনতে শুনতে নিজেই নিজের নামটা ভুলতে বসেছিল সলিল। অথচ, ফুটবল গ্রাউণ্ড যাওয়া, ম্যাটিনী, শো-র সিনেমা, কলেজে এ্যাটেনড্যান্স সমস্ত বিষয়েই ও ছিল রীতিমত পাংচুয়াল। শুধু কোনও শক্ত কথা বুঝতেই ওর একটু লেট হয়ে যেত—এই যা।

এমত সলিলচরণও যে বিয়ের আগে কোনও এক মেয়ের সাথে একটু লটঘট করেছিল এরকম কথা অবশ্য নিন্দুকেরা প্রায় বলে থাকে। কিন্তু আমরা, যারা নিতান্ত ভিতর থেকে ব্যাপারটা দেখেছিলাম, তাদের কাছে কাজটা খুব একটা গর্হিত মনে হয়নি। অমিতা তখন দিন পাঁচেকের জন্য মামাবাড়ী বেড়াতে এসেছিল। শহুরে মেয়ে। এমনিতেই একটু বেশী ছটফট করে। বন্ধুবান্ধব তো বটেই, স্বল্পপরিচিতদেরও দেখা হ'লেই শাড়ী আর ব্লাউজটা ম্যাচিং হয়েছে

কিনা জিজ্ঞেস করে নেয়। সলিলকেও ওই রকম কিছু জিজ্ঞেস করেছিল। এবং বলাই বাহুল্য, সলিল প্যানপেনে গলায় ঘাড় নীচু করে যে উত্তরটা দিয়েছিল তা' অমিতাকে শুধু প্রলুব্ধই করেছিল ওকে জ্বালাতন করতে। অমিতা ওকে সামনাসামনি পেলে আজেবাজে কথা-বলে ঘামাত। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কাছে ডেকে ঢোঁক গেলাত। এবং কোলকাতায় গিয়ে কি সব হিজিবিজি লিখে একটা চিঠি যেন পাঠিয়েছিল সলিলের ঠিকানায়। চিঠিটা পড়েছিল সলিলের বাবার হাতে। তিনি যথারীতি সেটা খুলেছিলেন। তারপর সেই চিঠিটা এবং আরো পাঁচজন সমবয়সীকে নিয়ে বুড়োশিবতলাটা গরম করে তুলেছিলেন।

তা' বলে, সলিলের বাবার দোষ দেবো না। তিনি কর্ত্তব্যের কোনও ত্রুটি করেন নি। সলিল কোনও রকমে গ্রাজুয়েট হয়ে আমাদের এই কালনারই একটা ব্যাংকে লোয়ার ডিভিসন ক্লার্কের কাজ যোগাড় করে নিতেই তিনি ধুতি-পাঞ্জাবীর ওপর চাদর চড়িয়ে নিয়েছিলেন। দিন তিনেক খুঁজে পেতে একটা ফটো যোগাড় করে এনে সলিলের মতামত চেয়েছিলেন। এবং যদিও ব্যাপারটা 'মেধো ভাত খাবি ? —হাত ধুয়েই তো বসে আছি। গোছের হয়েছিল তবু সলিল প্রথমে বাবাকে 'দেখি চিন্তা করে বিয়ে করব কিনা!' ভিন্ন কোনও উত্তর দেয়নি।

কিন্তু মুস্কিলটা বাধলো বিয়ে হবার পরই। মেয়েদের সঙ্গে সলিল কোনও দিনই ভালো করে কথা বলে নি। বাসররাত্রে অতগুলো মেয়ের মাঝে পড়ে ও যেন অকুল পাথারে হাবুডুবু খেতে লাগলো। আমরা, বন্ধুবান্ধবরা ওকে যদিও যথেষ্ট সাহস দিতে লাগলাম তবু ও কিরকম যেন সেই চিরকালের লেট মার্কা বনে যেতে লাগল। এবং বাসরঘরের একপাশে ও মাছের চোখের অনুকরনে নিজের চোখ দুটো আধখোলা করে পড়ে রইলো। মেয়েগুলো জিজ্ঞেস করে জানলো, জামাইয়ের শরীর ভালো নেই।

কোলাহল স্তিমিত হ'লো। বাসরঘর শূন্য হলো। আশেপাশে একজন ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু সলিলের শরীর যেন আরো খারাপ করতে লাগলো। ঘর ভর্তি লোক থাকলে যেমন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে তারও সেই রকম দশা ঘনিয়ে আসতে লাগলো। প্রচণ্ড গরমে যেমন কলকলিয়ে ঘামে ও সেইরকম ঘামতে লাগলো।

বৌ এগিয়ে এলো। কিরকম আদুল-আদুল ঠোঁট দুটো নাড়িয়ে বাধো-বাধোভাবে জিজ্ঞেস করলো,—"সত্যি তোমার শরীর খারাপ?"

সলিলের রক্ত গরম হয়ে এলো। ওর মনে হলো, ও যেন মারা যাবে। এক অদ্ভুত অনুভূতি ওর ওপর ভর করেছে। তাই অনুভূতির প্রচণ্ড চাপে ওর নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে, হৃদপিণ্ডে দ্রুত স্পন্দন জাগছে—সারা শরীর ঝিমঝিমিয়ে উঠছে। বৌ বললে- "মাথাটা টিপে দেবো?"

সলিল কথা বলতে পারলো না। ওর মুখে একমুখ লালা জমা হয়েছে। কথা বলবার সাধ্য নেই ওর। ও আচম্বিতে একপাশে সরে গেলো। কোনও রকমে শুধুমাত্র ঘাড়টা দুলিয়ে 'না' জানালো। বৌ স্নেহভরেই ওর দিকে তাকালো। মুচকি হেসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লো।

রাতটা কাটলো কোনওরকমে। কোনও মেয়ের পাশাপাশি শোওয়ার অভিজ্ঞতা নেই সলিলের। পাশাপাশি শুয়ে ওর যেন দারুণ কষ্ট হতে লাগলো। একটু নড়তে গেলেই গায়ে গা ঠেকে যায় আর সলিলের মনে হয় ও যেন একটা সৌন্দর্য্যকে নষ্ট করে ফেলছে। আঘাত করে করে একটা গোলাপকে নষ্ট করে দেবার মত। ও নড়লো না। চোখ না খুলেই, ও বুঝতে পারছে, ওর বৌয়ের দেহটা বড় নরম, পলকা কেমন তুতু-তুতু। ও হাত না দিয়েই বুঝলো, ওর দেহে হাত দিলেই দেহটা ভেঙে যাবে।

ও রাত্রে ঘুমলো না। কোনওরকমে সকাল পর্যন্ত জেগে কাটিয়ে দিলো। সকালের আলো পৃথিবীতে চিক্‌চিক্ করতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। উঠতে গিয়েই আবার চোখ পড়লো বৌয়ের ওপর। সেই আদুল-আদুল ঠোঁট, তুতু-তুতু চেহারা, প্রতিমে প্রতিমে চোখ. ঘুমন্ত রূপ। কাজেই, ওর মনে হলো আধফোটা কিংবা ফুটে শুকিয়ে আসা একটা গোলাপ।

মন খারাপ হয়ে গেলো। ঘর থেকে বেরিয়ে একটু পায়চারী করলো সামনের বারান্দায়। মনে হলো বৌয়ের কি যেন একটা অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ আছে।

সারাটা দিন ও ভাবলো, বৌকে নিয়ে কি করা যায়! এমন একটা কষ্টে, অত বড় সমস্যায় সে কখনো পড়ে নি। এর আগে কোনও দিন কোনও শিল্পী তার শিল্পের বিচারের দায়িত্ব একমাত্র সলিলের ওপর ছেড়ে দেয়নি। আজ প্রথম এ গুরুদায়িত্ব। দিন কাটলো—রাত্তির এলো। কালরাত্তির। বৌ

এক ঘরে ও আরেক ঘরে। আকাশে জ্যোৎস্না উঠেছে। তার দুধমাখা রং সারা পৃথিবীতে। চাঁদ থেকে, যেন তার বৌয়ের হাসি থেকেই, নেমে আসা এক অলৌকিক আভা পাশের চৌধুরীদের ঠাকুর বাড়ীর ডাব গাছের ওপর, ও পাশে মহানিমের ঝাকুমাকু ডালে ছড়িয়ে পড়েছে। বারান্দায় একা একা বসে সলিল ভাবলো, এ রাতটা যেন তার বৌ।

সে রাত কাটলো। পরের রাত এলো। সলিল চুপ করে থাকলো বসে। বৌ খেয়ে ঘরে অপেক্ষা করছিল। সলিল দরজা বন্ধ করে দেখলো, বৌ বিছানায় বসে। চটজলদি চলে গেল বৌয়ের পাশে। বসলো তার মুখোমুখি। কিন্তু আবার সেই আলোড়ন তার বুকে। আবার সেই লালা জমা তার মুখে। সলিল কথা বলতে পারলো না। ও বোবা হয়ে গেলো। শুধু চোখ দিয়ে দেখতে লাগলো নিজের বৌকে। যেন খেয়ে ফেলবে চোখ দিয়ে। অনেকক্ষণ কাটলো। চুপ চাপ। মুখোমুখি। রাত বাড়লো। রাতের স্তব্ধতা যেন অনেকখানি ধাতস্থ করে দিলো সলিলকে। অনেকক্ষণ বাদে ওর বুকে কথা যোগালো। ও ঢোঁক গিলে খেয়ে ফেললো মুখের লালাটা। বৌকে ভরাট গলায় ডাকলো,—"বৌ!"

অতি অশিক্ষিত, পুরানো ডাক। কোনও এক চাষীজীবন নিয়ে গড়া এক ফিল্মে নায়কের মুখে এই সম্বোধন শুনেছিল সলিল। আজ অবশ্য যে ফিল্মের কথা ওর মনেতেই এলো না। বৌ মুচকি হাসলো।

আবার সেই ব্যথাটা টের পেল সলিল। কি যেন একটা অতি সাধারণ জিনিষ বৌয়ের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে না ও। এই দুহু-দুহু শরীর, এই আদুল-আদুল ঠোঁট, এই প্রতিমে প্রতিমে চোখেই লুকিয়ে আছে। কিন্তু আবিষ্কার করা যাচ্ছে না। ওর ব্যথাটা ওর নিঃশ্বাসকে আরো দ্রুত করলো। ওর হৃদপিণ্ডে আরো কাঁপন জাগলো। ও আরেকটু সময় নিলো পরের কথা বলতে।

—"বৌ একটা কথা।"

—"বলো।"

ও বৌয়ের দিকে তাকালো না। তাকালে পরের কথা বলতে পারবে না। আগে কথাটা বলা দরকার। তারপর বৌকে দেখবে ও। আশ মিটিয়ে দেখবে।

—"আমি তোমার সব দেখবো বৌ। তোমার এই শরীরে কি একটা জিনিস আমি খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ আমি জানি তা' তোমার শরীরে আছে। জিনিষটা কি তা' আমি দেখতে পাচ্ছি না। সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাও নেই আমার। আমি আগে তা দেখি নি। সে জিনিষটা আমি খুঁজবো বৌ। দেবে তো খুঁজতে।"

—"ধ্যেৎ, অসভ্য কোথাকার!" বৌ মুচকি হেসে ঠমক ভরে ঘাড় ঘুরিয়ে নিলো। এই মুহূর্ত্তে বৌকে খারাপ লাগলো সলিলের। মনে হ'লো, সেই স্বর্গীয় জিনিসটা যেন হারিয়ে গেলো। কিন্তু পরের মুহূর্তে বৌয়ের আবার সেই হৃদয় জাগানো রূপ ফিরে এলো। সলিলের চোখে বৌ পড়ে নিয়েছে আলাদা ভাষা, বুঝেছে সলিল সত্যিই খুঁজবে। ছল কোরে খোঁজার কথা সে বলেনি। আর তাই আবার চুপ করে গেছে। সলিলের দিকে শুধু তাকিয়ে আছে ও। ওর চোখে হাসি আর নাই। সলিল দেখতে লাগলো বৌয়ের সেই প্রতিমে প্রতিমে চোখ, আলতোভাবে সলিলের মুখের দিকে তোলা। চড়াই পাখীর বুকের মত তার নরম বুক নিঃশ্বাসের তালে তালে উঠছে নামছে। তার কয়েকটি চুল কপালে নেমে এসেছে। বোধ হয়, সলিল শুতে আসার আগে ও একবার শুয়ে ছিল বালিশে মাথা দিয়ে। সলিল দেখতে লাগল ওর বৌয়ের সেই হুহু-হুহু চেহারা, আতুল আতুল ঠোঁট, প্রতিমে প্রতিমে চোখ।

রাত্রে ও ঘুমলো না বৌকেও ঘুমোতে দিলনা। সামানাসামনি বসে রইলো দুজনে। রাত গড়াতে লাগলো। সকাল হলো। বাড়ীতে তোড়জোড় লাগলো। বরকনে যাবে। বাড়ীশুদ্ধ সবাই ব্যস্ত। কিন্তু সলিল গালে হাত দিয়ে ভাবছে। পাচ্ছি না তো সেটা। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমার বৌয়ের শরীর থেকে কি যেন একটা হারিয়ে যাচ্ছে। কি যেন একটা ফুরিয়ে যাচ্ছে। আমার বৌ বোধ হয় নিঃশেষ হয়ে যাবে। অথচ আশ্চর্য্য! আমি সারারাত্রি ধরে দেখেও বুঝতে পারছি না কি ফুরিয়ে যাচ্ছে!

পরের রাত্রে সতর্ক চোখ মেললো সলিল। বৌ আগের রাতটা জেগেছিল। সে রাত্রে বিছানাতে আশ্রয় নিতেই ঘুমিয়ে পড়লো। বৌ ঘুমিয়ে পড়ার অব্যবহিত পরেই সলিল এলো ঘরে। ও বৌকে দেখলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। আলোটা অফ্ করে দিলো। তারপর আঁধারে বসে বসে ও বৌকে ভোগ করতে লাগলো। বৌয়ের শাড়ীর গাঢ় রং ওর চোখে খুব আলতোভাবে ধরা

দিলো। নাক নীচে নিয়ে গিয়ে বৌয়ের নিঃশ্বাসের গন্ধ নিলো সলিল। হাত দিয়ে বৌয়ের সারাশরীর স্পর্শ করতে লাগলো। বুক-হাত পেট-মুখ—মুখের প্রতিটি আদল। হঠাৎ মনে হলো যা খুঁজছে তা ও পেয়ে গেছে। তবু যেন কি খুঁজছে তা স্পষ্ট হচ্ছে না। সলিলের মনে হলো এই অন্ধকারটার জন্য। ও উঠে গিয়ে আবার সুইচটা অন্ করে দিলো। আবার নিলো নিঃশ্বাসের গন্ধ আবার বোলাতে লাগলো সারা শরীরে হাত। বৌ জেগে উঠলো। ওকে হাত বোলাতে দেখে যেন একটু লজ্জিত হলো। অথচ হাসলো। সলিলের এটা খুব খারাপ লাগলো। ওর মনে হলো যা সে পেতে যাচ্ছিল তা যেন হারিয়ে গেল। বৌয়ের ওপর খুব বিরক্তি এলো ওর। ও উঠে পড়লো। সুইচটা অফ করে দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো ও। ওর মনে হলো, জোৎস্না রাত্রির এই রূপের সঙ্গে তার বৌয়ের সাদৃশ্য একটু আগে তার বৌয়ের হাসিমাখা মুখের থেকে অনেক বেশী। সে বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে থাকল সে রাত।

সলিলের চেহারা খারাপ হয়ে যেতে লাগলো। দিন দিন ওর চোখ বসে যেতে লাগলো। ওর কোঁকড়ানো চুল বিপযস্ত হয়ে মাথায় এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে থাকতে লাগলো, চোখের নীচে কালি বসতে লাগলো। আমরা উদ্বেগ জানাতে লাগলাম। জনদুয়েক বৌকে ছেড়ে দিনকয়েকের জন্য বাইরে বেড়াতে যেতে বললো। তাদের কথাটা মনে ধরলো সলিলের। মনে মনে ঠিক করে ফেললে, বাইরে বেড়াতে যাবে। অফিস থেকে ছুটী নিলো। বাবার মত করালো। তারপর বন্ধুবান্ধদের চমকে দিয়ে বৌকে নিয়ে বেড়াতে চলে গেলো ও।

খুঁজে পেতে একটা মফঃস্বল শহরেই নিয়ে এসে বৌকে তুললো ও। ওদের কালনার মতই শহরটা। নূতনত্ব কিছু নেই। শুধু একটা জিনিষ নূতন। ও আর বৌ ছাড়া এখানে পরিচিত কেউ নেই।

নূতন ভাড়া করা ঘরে বউয়ের মুখোমুখি বসলো সলিল। বৌকে রাঁধতে দিলো না। সারাটা দিন ও বৌকে দেখলো। একটা কথা না। কিছুই না। শুধু দেখলো। মাঝে শুধু একবার হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে নিলো।

সন্ধ্যাতেও রান্না হলো না। হোটেল থেকে খাবার আনলো সলিল। তাগাদা দিয়ে সকাল সকাল খাইয়ে দিলো বৌকে। নিজেও খেয়ে নিলো।

বিছানায় গিয়েই শুয়ে পড়লো বৌ। সলিল মিনতি করলো বৌয়ের হাত

ধরে—"একটু ওঠো"। বৌ কথা শুনলো না। সলিল আবার মিনতি করতে গেলো। বৌ ঝাঁঝিয়ে উঠলো,—"কি চাও তুমি ?"

থতমত খেয়ে গেলো সলিল। কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো—"তোমাকে খুঁজতে।"

—"আদিখ্যেতা করো না দেখি!" বৌ মুখঝামটা দিতে গিয়ে থেমে গেলো। ঘর অন্ধকার, সলিল একটু আগে আলো অফ্ করে দিয়েছে। শুধুমাত্র পাশের বাড়ির একপাটি খোলা জানলা গলে বেরিয়ে আসা একফালি আলো দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে নিজের সমস্ত কিছু হারিয়ে শুধুমাত্র আভাটুকু নিয়ে পড়ছে সলিলের মুখে। সে আভায় সলিলের মুখটা খুব ম্লান দেখালো। মনে হলো, এ খোঁজা শেষ না হলে যেন সলিল মরে যাবে। এটা জানা যেন সলিলের খুব দরকার।

বৌ আস্তে আস্তে উঠলো। চাপা গলায় শুধালো—"কি চাও ?" সলিল বললো,—"দাঁড়াও খুঁজি।"

কাজেই, ও খুঁজতে আরম্ভ করলো। সেই আরেক রাত্রের মত ওর নিঃশ্বাসের গন্ধ দিয়ে, ওর শাড়ীর আলতো রং ধরে, ওর চড়াই পাখীর বুকের মত দ্রুত ওঠানামা বুক, ওর থিরথিরে দুদু-দুদু শরীর নিয়ে।

খুঁজতে খুঁজতে সলিলের মনে হলো ও যেন পথ হারিয়ে ফেলছে। পথ হারিয়ে ফেলেছে আবার পথ খুঁজে পাচ্ছেও। আলাদা পথ—ভিন্ন পথ। ওর একবার মনে হলো ও যেন দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। নিজের সমস্ত সত্তাকে সে হারিয়েও আলাদা কিছু হ'চ্ছে।

ওর মনে হলো, ও এখন একটা অতি বেগবান অশ্ব হয়ে গেছে। বেগবান, কিন্তু পরাধীন। ও দৌড়াচ্ছে কিন্তু একটা লাগামের টানে। সে লাগাম কোথায় কার হাতে সে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু ও দৌড়াচ্ছে। ওর ভালও লাগছে। ওর মনে হচ্ছে, এই দৌড়ানোর পিছনেও নিজেও একটা কিছু পাবে। কি পাবে তা ও জানে কি জানে না তার ঠিক নেই। হয়তো ও একটু পরে আস্তাবলে যে খাবার পাবে তার স্বপ্ন দেখছে। কিংবা, মনিবের হাতে একটা আলতো আদুরে চাপড়। মনে পড়তেই ওর দৌড় যেন আরো বেড়ে যাচ্ছে। ও নদী, নালা কিছু মানছে না। মনে হচ্ছে এ দৌড়টাই ওর জীবনের আসল দৌড়। মনে হচ্ছে, এ দৌড়ের প্রস্তুতি সে বহুদিন থেকে

নিচ্ছে। এই দৌড়ই ওকে বাঁচাবে। এই দৌড়ই ওকে একটা ইতিহাস দেবে, পাঁচজনে তা থেকে ওকে খুঁজে নিতে পারবে। দৌড়তে দৌড়তে ও ক্লান্ত হয়ে আসতে লাগলো। ওর শরীরে একটা বিরতি নেমে আসতে লাগলো। ওর মনে হ'লো এটা বিরতি নয়, এটা মৃত্যু। ও ক্লান্ত হলো। ও ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের দিন সকাল। ওর বৌ উঠলো ঘুম থেকে। দেখলো, সলিল ঘুমিয়ে আছে। ওর বৌ তুললো না ওকে। শুধু মুখ টিপে হাসলো। তারপর ঢুকে গেলো বাথরুমে। বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখলো, সলিল বিছানায় নেই। অস্বাভাবিক ভাবলো না ওর বৌ। জলখাবারের প্রস্তুতি করলো। রান্নাবান্নার সরঞ্জাম সবই এনেছে। কিন্তু এখনো ব্যবহার করা হয়নি। কাজেই দেরী হলো একটু। ফিরে এসে দেখলো সলিল টেবিলে হাত রেখে হাতে মাথা দিয়ে বসে আছে। বৌয়ের পায়ের শব্দে সলিল মুখ তুলে তাকালো। বৌ একটু মুখ টিপে হাসলো। সলিল মুখ ফিরিয়ে নিলো। বৌয়ের মুখে আবার একটু হাসির আভা দেখা দিল। টেবিলে রাখলো জলখাবারের প্লেটটা। তারপর পায়ে পায়ে ওর পাশে চলে গিয়ে ওর মাথার ওপর রাখলো একটা হাত। আর আশ্চর্য্য! সেই মুহূর্তে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো সলিল। বৌ অবাক হয়ে বললো, —"কি হলো ?"

—"আমায় খুন করেছ বৌ!"

—"খুন করেছ!" ওর বৌ আশ্চর্য্য হয়ে চীৎকার করতে গিয়ে থেমে গেলো। সলিলের মুখের ভাষা পড়ে ঠিক করবার চেষ্টা করলো, এই সকালে ও আরেক পাগলামী করছে—না, সত্যসত্যই খুন করছে!

—"হ্যাঁ তোমাব আমার ভালোবাসাকে আমি খুন করেছি। তোমার আমার চোখদুটোকে আমি হত্যা করেছি। আগে তোমার চোখে আমি আলাদা কি একটা খুঁজে পেতাম। এখন তোমার চোখে তার বদলে একটা হাসি দেখছি। একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ও একটা বিদ্রুপের হাসি। আগে তোমার চোখ যেন আমার মধ্যে কি খুঁজতো। এখন তোমার চোখ পরিতৃপ্ত

কি একটা যেন পেয়েছে তারই ইংগিত করতে চাইছে আমায়। কিন্তু আমি যা দিয়েছি তা তো ভুয়ো, বৌ, তা' তো মিথ্যে !"

আরো বেগে কেঁদে উঠলো সলিল নিষ্প্রাণ টেবিলটা ধরে। ওর বৌ নির্বাক। যেন কিছু ভাববার চেষ্টা করছে। তার হাত দুটোও তখন নিষ্প্রাণ টেবিলটার ওপরেই। হঠাৎ তাদের দুজনেরই মনে হলো, এই নিষ্প্রাণ টেবিলটাই এখন তাদের একমাত্র সম্বল। ওটা সরে গেলে তারা পা হড়কে মেঝেতে পড়ে যাবে।

কসাই

শিশির বিশ্বাস

ঘুম পাচ্ছিল রতনার। এত ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল, যে খানিক আগের ক্ষিধের প্রচণ্ড জ্বলুনিটাও সে আর তেমন অনুভব করতে পারছিল না। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার ব্যস্ত সমস্ত মহানগরীর এত হৈ হট্টগোল, সব কেমন বুঁজে আসছিল সাড়ে পাঁচ বছরের কৃষ অর্ধউলঙ্গ ছেলেটার চোখে। কদিন ধরে এই এক ব্যাপার হয়েছে। প্রায়ই সন্ধ্যের দিকে ঘুমটা আসে। সেদিন তো ঝিমুতে ঝিমুতে ফাঁকা মত একটা গাড়ীবারান্দার নিচে খালি একটা সিঁড়ির ধাপে ঘুমিয়েই পড়েছিল। কথাটা মনে আসতেই কোমরের ব্যথাটা ফের টন্ টন্ করে ওঠে রতনার। তবু ভাগ্য যে বুট পরা সেই বাবুটি রতনার ঘুমন্ত দেহটা পা দিয়ে তুলে ফুটপাথে ছুঁড়ে দিয়েই উঠে গিয়েছিল সিঁড়ি বেয়ে। চোটটা তাই কোমরের উপর দিয়েই গেছে। পুলিশের খপ্পরে পড়লে ঐ সঙ্গে পিঠেও ক'ঘা পড়ত নিশ্চই !

ঘটাং ঘটাং শব্দে ট্রাম আসছে একটা। নাম্বার পড়তে না পারলেও রতনা তার সাড়ে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝে নেয় ট্রামটা ধর্মতলার দিকেই চলেছে। পাছার উপর থেকে ঢল্ ঢলে ছেঁড়া নোংরা ইজেরটা টেনে কোমরে তুলে এক মুহূর্তে প্রস্তুত হয়ে নেয় রতনা। তারপর কাছে আসতেই ছুটে গিয়ে রানিং ট্রামটার হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে পড়ে।

হৈ হৈ করে ওঠে কয়েকজন। ময়লা কালিঝুলি মাখা দুর্গন্ধ দেহটার স্পর্শ বাঁচাতে জনাকয়েক গেট ছেড়ে ছিটকে ভেতরে ঢুকে পড়ে। কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে,—নামিয়ে দিন—নামিয়ে দিন।

সর্দিমাখা ঠোঁটদুটোর ভেতর থেকে দু'সারি হলদে ছোপ ধরা দাঁত বার করে হাসে রতনা। বেপরোয়াভাবে পাদানিতে আর একটু ছড়িয়ে দাঁড়ায়। ভাবটা এই রকম—কৈ? কে নামাবে, নামাও তো দেখি! কিন্তু কারুকেই এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। জানলার পাশে বুড়ো মত এক ভদ্রলোককে তার পাশের সহযাত্রীকে লক্ষ্য করে বলতে শোনা যায়,—দেখেছেন, এই বয়েসে কেমন দিব্বি রানিং গাড়ীতে নামতে উঠতে শুরু করেছে।

বুড়োর পাশের ভদ্রলোক বিজ্ঞের মত বুঝিয়ে দেয় ব্যাপারটা,—আরে মশাই, বুঝতে পারছেন না এরাই তো কদিন পর পকেট কাটা শুরু করবে। রানিং গাড়ীতে নামতে উঠতে হবে না তখন।

পাশের বেঞ্চে এক ভদ্রমহিলার পাশে রতনারই সমবয়েসী একটি ছেলে বড় বড় চোখ করে চুপচাপ সব দেখছিল এতক্ষণ। এবার পাশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—মা-মনি, ঐ নোংরা ছেলেটা বুঝি পকেট কাটবে আমাদের?

ভদ্রমহিলা একটু গম্ভীর হয়ে যান ছেলের কথায়। তারপর তেমন গম্ভীর-ভাবেই তাঁকে বলতে শোনা যায়,—এখন নয় সোনা, আরও কদিন পর যখন বড় হবে গায়ে শক্তি হবে তখন। পকেট কাটবে, ছুরি চালাবে...। তুমি বাবু হয়ে বোস দেখি তাকিও না ওদিকে।

কান খাড়া করে সব শুনতে শুনতে চলে রতনা। বেশ মজাই লাগে ওর। ইতিমধ্যে দু'তিনটে স্টপেজ পার হয়ে যায়। আরও কয়েকটা স্টপেজ যেতে পারলে সুবিধা হত। কিন্তু শেয়ালদার মোড়ের কাছে আসতেই দশাসই চেহারার হিন্দুস্থানী কণ্ডাক্টর গেটের কাছে এসে পড়েছে। গেটে রতনাকে

দেখতে পেয়েই হুঁঙ্কার ছাড়ে সে। একটা অত্যন্ত অশ্লীল ইঙ্গিত করে চলন্ত ট্রাম থেকে নিপুনভাবে লাফিয়ে নেমে পড়ে রতনা।

গন্তব্যস্থলের অনেক আগে নেমে পড়তে হলেও মেজাজটা খারাপ হয় না রতনার। ফুটপাথে ছোট ছোট তোলা উনুনে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে ডিম ভাজা হচ্ছে। অফিস ফেরত বাবুরা সব ভীড় করছে চারপাশে। ডিম ভাজা খাচ্ছে সবাই। কেউ শুধু ডিম ভাজা কেউ, বা রুটিতে মাখিয়ে। ওরই মত কতকগুলো ছেলে হাঁ করে বাবুদের খাওয়া দেখছে, আর ফাঁক পেলেই কাছে গিয়ে একটুখানি ভিক্ষে চাইছে। ডিম ভাজার গন্ধে পেটের নাড়ীগুলো ফের মোচড় দিতে শুরু করেছে। পেটের ঝিমিয়ে পড়া ক্ষিধেটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে রতনার। অচিরেই সে ভিড়ে পড়ে ওদের সঙ্গে। কাজটা সহজ নয়। এ কাজে মুখের সঙ্গে চোখ কান খোলা রাখা দরকার বিশেষভাবে। খাবার সময় চারপাশে ছুঁক ছুঁক করার জন্য বিরক্ত বোধ করেন বাবুরা। ডিম ওয়ালা তাই হাতের কাছে মজুত রেখেছে এক লম্বা লাঠি। মধ্যে মধ্যেই সে ওদের বাপান্ত করে লাঠি ঘোরাচ্ছে। আজ রতনার কপালেই জুটে গেল এক ঘা। ঘুম ঘুম ভাব থাকার দরুণ একটু অসাবধান হতেই বোঁ করে লাঠি এসে পড়ল পিঠে। কালসিটে ফেলে দিয়ে গেল। পিঠ বাঁকাতে বাঁকাতে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। ওর এই হেনস্তা দেখে এক গুঁফো বাবুর দয়া হল কিনা কে জানে, খেতে খেতে একটুকরো ডিম মাখা রুটি তিনি ছুঁড়ে দিলেন রতনার দিকে। মুহূর্তে রতনার সঙ্গে আরো চার পাঁচটি ছেলে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল রুটির টুকরোটার উপর। ভুলকাহাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল সেখানে। শেষ পর্য্যন্ত রতনাকেই জয়লাভ করতে দেখা গেল সেই যুদ্ধে। কোনগতিকে ধুলো-মাখা সেই কিম্ভুত বস্তুটি উদ্ধার করে নিমেষে কোঁৎ করে গিলে ফেলল সে। বাকি ছোকরাগুলো লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল রতনার দিকে। পিঠটা চড় চড় করে জ্বললেও সেদিক পানে তাকিয়ে এক বিশেষ আত্মতৃপ্তি লাভ করে রতনা।

ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিলে আরও কয়েকটুকরো হয়ত জুটলেও জুটতে পারত। কিন্তু একটু পরেই দল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে রতনা। ধর্ম্মতলাগামী একটা ট্রামের জানলার শিক ধরে ঝুলে পড়ে। ঘুমের আমেজটা আবার জড়িয়ে আসছিল ওর চোখে। রাতের মতো শোবার একটা স্থায়ী আস্তানা রতনার

আছে। কিন্তু গভীর রাতের আগে জায়গাটা নিরাপদ নয়। তাই ট্রামটা কার্জনপার্কের কাছে আসতেই নেমে পড়ে রতনা। তারপর পার্কের এক কোনে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

রতনার ঘুম ভাঙে, তখন আলোকজ্জ্বল চৌরঙ্গী পাড়ার অধিকাংশ দোকানপাটই বন্ধ হয়ে গেছে। ঘুমন্ত শহরের বুকে নিওন আলোর বিজ্ঞাপনগুলো কেবল ক্লান্তিহীন চোখের তারায় নিষ্ফল আবেদন জানিয়ে চলেছে। মাঝে মধ্যে দু'টো একটা রিক্সা কিংবা ট্যাক্সি শেষ সওয়ারী নিয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে। এছাড়া কয়েকটা বার কিংবা নাইট ক্লাবের সামনে দাঁড়ান গাড়ীগুলো ছাড়া রাস্তা প্রায় ফাঁকা। সেদিকপানে তাকিয়ে সময়টা অনুমান করে নেয় রতনা। তারপর এক মুহূর্ত কি চিন্তা করে দ্রুতবেগে পা চালিয়ে দেয়। ক্ষুধায় পেটের নাড়ীগুলো তখন তার দাউ দাউ করে জ্বলছে।

মুখের রং-চংগুলো ধুয়ে ফেলে খোলার ঘরের নিচে গোলাপী তখন সবে খেতে বসেছে। লালার দোকান থেকে আনা দু'টুকরো রুটি আর একটু তরকারি। রান্না-বান্নার পাট অনেকদিনই চুকে গেছে। রোজগারপাতি নেই। রোজ সন্ধ্যায় গলির মোড়ে রং চং মেখে দাঁড়িয়ে থাকাই সার হয়, খদ্দের জোটে না।

সে সব দিনের কথা স্বপ্নের মত মনে হয় গোলাপীর। দক্ষিণ বাংলারই কোন এক অখ্যাত গ্রামের কথা—গোটা দুই গোলপাতায় ছাওয়া ঘর, এক ফালি উঠোন। দুপুর বেলা একসারি নারকেল গাছের মাথা ডিঙ্গিয়ে রোদ্দুর এসে পড়ত উঠোনটাতে। বাবার গাব লাগান চকচকে জালটা মেলা থাকত উঠোনের এক কোনে। ওরা ক'ভাইবোন তাড়াহুড়ো করে শুঁটকি মাছগুলো উল্টে দিত। ফেলে আসা সেই দিনগুলোর কথা গোলাপীর চোখে ভাসে আজও। তারপর বিয়ে হলো গোলাপীর—কোথায় যেন যুদ্ধ বাঁধল। নৌকা, জাল সব কেড়ে নিতে লাগল পুলিসে। দুর্ভিক্ষ দেখা দিল গ্রামে। স্বামীর হাত ধরে গোলাপী একদিন শহরে এলো। তারপর কতজল গড়িয়ে গেছে গোলাপীর জীবনে! স্বামী হারিয়ে গেল একদিন—গোলাপীও হারিয়ে গেল।

সে সব কতদিন আগের কথা। দিনকালের রূপ অনেক পাল্টেছে তারপর। এখন পারুল, সোনা, মল্লিনাদের যুগ। গোলাপীর ক্ষীণ, শীর্ণ, কালিঢালা

সেহটার দিকে চেয়ে আজকাল আর আকর্ষণ বোধ করে না কেউ। তাহলেও রোজকার মত আজ সন্ধ্যায় বেরিয়েছিল গোলাপী। নইলে পেট যে মানে না! যদি দু'একজন রিক্সাওয়ালা কিংবা কুলিমজুরকেও আকর্ষণ করা যায়। আজও নিরাশ হতে হয়েছে গোলাপীকে। শেষে লালার দোকানের বরাদ্দ দু' টুকরো রুটি চেয়ে নিয়ে খুপরিতে ফিরেছে। লালা ধার দিচ্ছে এখনো। কদিন পরে এটুকুও জুটবে না হয়ত। একটুকরো রুটি ছিঁড়ে গোগ্রাসে চিবুচ্ছিল গোলাপী। এমন সময় ভগ্নদূতের মত সেখানে হাজির হয় রতনা।

ক্ষিধে পেয়েছে মা—খেতে দে।

আচমকা চোয়াল দুটো থেমে যায় গোলাপীর। সামনে রতনাকে দেখতে পেয়ে চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। খালি বলে,—ইদিকে আয়।

মায়ের গলার স্বরটা কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয় রতনার। তা হলেও মরিয়া হয়েই এগিয়ে যায় সে। আওতার মধ্যে আসতেই ধাঁ করে রতনার চুলের মুঠি ধরে উঠে দাঁড়ায় গোলাপী।

হারামী, তোকে কতবার না এখেনে আসতি মানা করিছি। বলতে বলতে কোন থেকে একটা চেলা কাঠ তুলে নিয়ে সশব্দে রতনার পিঠে বসিয়ে দেয় গোলাপী। প্রাণ আগেই শুকিয়ে গিয়েছিল রতনার। এবার আর্ত চিৎকারে পাড়া মাথায় করে সে।

অঁা—অঁা—অঁা—ছেড়ে দে মা, আর কখনো আসবু নি—

রতনার গলাকে ছাপিয়েও গোলাপীর গলা—ছেড়ে দে মা! আয় ছেড়ে দিচ্ছি তোকে--মাগো এমন হাবামীর বাচ্চাকে নিয়ে কোথায় যাব গা আমি! এতবার আসতি মানা করিচি, ফের তবু আসে! সারাদিন গণ্ডে পিণ্ডে গিলে রাতদুপুরে এখন মায়ের কাছে খেতি এসেচে দেখো! তোকে শেষই করে ফেলব আজ। বলার তালে তালে নির্মমভাবে প্রহার চলতে থাকে। চিৎকারে পাড়া মাথায় করে দু'জন। আসপাশের খুপরি থেকে পারুল, সোনা ওরা সব ছুটে আসে।

—একি করছিস দিদি! ছেলেটাকে মেরে ফেলবি যে।

—মরুক মরে নিষ্কিতি দিক। এমন হারামীর বাচ্চাকে আগেই বিষ দিয়ে মারিনি কেন গা আমি! লাঠির জোর আরও বাড়ে গোলাপীর।

শেষটা পারুল, সোনা এবং আরও কয়েকজনের চেষ্টায় ছাড়া পায় রতনা।

ছাড়া পেয়েই ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ছুটে পালায়। পেছনে গোলাপী তখন সমানে গর্জাচ্ছে।

গভীর রাত। গীর্জার পেটা ঘড়ীতে দু'টোর বেল পড়ে গেল একটু আগে। পেটের নাড়ীগুলো জ্বলে জ্বলে নিভে গিয়েছে অনেকক্ষণ। সারাগায়ে অসহ্য যন্ত্রনা নিয়ে উঠে দাঁড়ায় রতনা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চলে ওর রাতের আস্তানার দিকে। আস্তানা বলতে একটা পুরোনো বাড়ীর জীর্ণ সিঁড়ির নিচে খুপরি মত একটা জায়গা। অনেক খুঁজে পেতে নিরাপদ এই আস্তানাটা আবিষ্কার করেছে সে।

সিঁড়ির নীচের খুপরীটা পুরোনো ইট, কাঠ, কয়লার স্তুপে পরিপূর্ণ। তারই ওপাশে ছোট্ট একটুখানি পরিষ্কার জায়গা। রীতিমত কসরৎ করেই ঢুকতে হয় সেখানে। রোজকার মত আজও হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকবার আয়োজন করছিল রতনা। হঠাৎ কি একটা দেখে থমকে থেমে যায় সে। ভুষো কালো মত কি একটা বস্তু যেন সেই চিলতে যায়গাটুকুতে পড়ে আছে মনে হয় রতনার। তারপর আবছা আলোতে ভাল করে নজর করে দেখে, একটা ছোট মত কুকুর-ছানা গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে সেখানে।

মুহূর্তে চোখদুটো হিংস্র হয়ে জ্বলে ওঠে রতনার। কি স্পর্দ্ধা! ওর এতদিনের শোবার আস্তানা বেদখল করতে সাহস পায় ঐটুকু এক কুকুরছানা! প্রতিহিংসা পরিতৃপ্তির এক দুর্দমনীয় জিঘাংসায় ক্রুর হয়ে ওঠে ওর মুখ। সন্তর্পণে পাশ থেকে একটা থান ইঁট তুলে নিয়ে দু'হাতের প্রচণ্ড এক আঘাতে ঘুমন্ত প্রাণীটার মাথাটা সজোরে থেঁতলে দেয় রতনা। বারকয়েক শরীরটা দুলিয়ে প্রাণীটা স্থির হয়ে যায়। প্রচণ্ড আক্রোশে উপর্যুপরি আরও কয়েকটা আঘাতে প্রাণীটার মাথাটা একেবারেই গুঁড়িয়ে দেয় সে। তারপর মরা কুকুরছানাটাকে রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়ে নিজের রক্তমাখা হাতদুটো চোখের সামনে মেলে ধরে রতনা। এক পৈশাচিক আত্মতৃপ্তিতে ভরে যায় ওর মুখ। তারপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে শান্তিতে।

নবারুণ

হেলেন নূর আজাদ

বিদিশা—এই বিদিশা—

কে! চমকে ওঠে বিদিশা। পেছন ফিরে তাকায়। নাঃ, কেউ তো নয়! অথচ মনে হলো শোভন যেন ডাকছে। চেঁচিয়ে নয়, কানের কাছে ফিস ফিস করে। যে ডাক শুধু অন্তরই শুনতে পায়।

কেউ ডাকেনি—মনের ভুল। নিজেকে সান্ত্বনা দেয় সে। কোন দিকেই শব্দ নেই। তিস্তা নীরবে বয়ে চলেছে তিরতির করে। বারেকের জন্যেও থমকে দাঁড়ায় না। কিম্বা মুখ তুলে প্রশ্ন করেনা—তুমি কে? কেন বসে? কারই বা প্রতীক্ষায়?

নিজের মনেই হেসে উঠে বিদিশা। প্রতীক্ষা? না, আর কারুর প্রতীক্ষা করিনা। ভয় হয় আশা করতে, স্বপ্ন দেখতে ভয় হয় জীবনের। স্বপ্ন দেখেছিলাম একদিন। সে স্বপ্নের শেষ বিন্দুটুকু মুছে নিয়ে গেছে পলাশ তার পাশবিক উল্লাস দিয়ে। অথচ—

ছলাৎ করে আছড়ে পড়ে ছোট একটা ঢেউ পায়ের পাতা দুটো ভিজিয়ে দিয়ে যায়। কাপড়টা একটু গুটিয়ে নিয়ে পাদুটো নামিয়ে দেয় তিস্তার জলে। একটা ঠাণ্ডা স্রোত শির্ শির্ করে বয়ে যায় সমস্ত শরীরে। আবেশে চোখ বন্ধ করে সে।

বিদিশা দেবী—

এ ডাক ভুল শোনার নয়। পেছন ফিরে তাকায় সে। তীরে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে শোভন। কি করছেন একা একা বসে?

মুখ টিপে হাসে বিদিশা। এমনি বসে আছি। সঙ্গী আর কোথায় পাই বলুন?

সবার সঙ্গ এড়িয়ে চললে সঙ্গী পাবেন কি করে?

নিঃশব্দ হাসি হাসে বিদিশা। কি খবর বলুন?

কি আর খবর? একা বসে আছেন দেখে এমনি এলাম। কিন্তু এমন এক জায়গায় গিয়ে বসেছেন যে ওখানে যাওয়ার উপায় নেই।

কেন! আমি তো এসেছি! আমার মতো চলে আসুন।

পায়ে যে জুতো রয়েছে।

সে তো আমারও ছিলো। খুলে আসুন না।

হাসতে হাসতে জুতো খুলে পা ডুবিয়ে পাথরের ওপর এসে বসে শোভন। আচ্ছা, প্রায়ই দেখি এখানে বসে আছেন। কেন? ঠিক এইখানেই আসেন কেন?

ভালো লাগে বলে। সারাদিন কাজ কর্ম্মের পর তিস্তার এই পাশটিতে বসে বসে আমাদের গ্রামের কথাই ভাবি। বাংলা দেশের স্বপ্ন দেখি আর ভাবি—আবার কবে যাবো।

সেখানে তো আর কেউই নেই!

স্মৃতিটুকু তো আছে? তাই তো ভাবি মাঝে মাঝে—আবার চলে যাই ছোটবেলার স্বপ্ন ঘেরা ঘরটিতে।

একা?

এখানেও তো আমি একা শোভন বাবু!

সে তো ইচ্ছাকৃত।

হ্যাঁ। মানুষকে আমার ভীষণ ভয়, তাই মনের সঙ্গী হিসেবে কাউকেই ঠিক আপন করে নিতে পারিনা।

কিন্তু, কেউ যদি আজীবন সঙ্গী হয়ে থাকারই প্রতিশ্রুতি দেয়? যদি বলে—আমি তোমাকে—

না না না—ওকথা বলবেন না শোভনবাবু। আর্তনাদ করে ওঠে বিদিশা।

* * * *

কেন? কেন বলবো না বিদিশা?

না।

কিন্তু আমি তো সত্যিই তোমায় ভালোবাসি।

জানি পলাশ।

তাহলে কেন আপত্তি করছো?

ভালোবাসো বলেই তো আপত্তি। মৃদুহাসে।

কিন্তু বিয়ে যেদিন হবে, সেদিন তো সেই অধিকারের জোরেই—

সে অধিকার তো আজ নেই পলাশ, হবে বিয়ের পর। তখন আপত্তি করবোনা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পলাশ বলে—সাত আট মাস পরেই আমি ফিরবো লণ্ডন থেকে, তারপরই বিয়ে করবো। তার আগে যদি একবার—

বিয়ের রোমান্সটুকু এভাবে নষ্ট করতে চাও কেন? তোমার আমার ভালোবাসা কি দেহের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে পলাশ? তার চেয়ে উঁচুতে—

ওসব কাব্যের কথা বিদিশা, জীবনটা কাব্য নয়।

নয়? কি যেন ভাবে, তারপর আস্তে আস্তে বলে—পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক কি শুধু দেহেরই!

কামনাটাকে তো জোর করে অস্বীকার করতে পারোনা?

পারিনা বলেই কি যে কোন পুরুষ এগিয়ে এলে নারী তার সমস্ত ঐশ্বর্যটুকু তুলে দেবে তার হাতে?

যে কোন পুরুষের কথা বলছিনা বিদিশা, আমার সংগে বিয়ে হবে বলেই বলছি।

ভালোই যদি বাসো—তাহলে কেন ইচ্ছের বিরুদ্ধে—গম্ভীর হয় বিদিশা। না, এ অন্যায় আমি সমর্থন করিনা।

কয়েক মুহূর্ত লোভের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে পায়ে পায়ে তার দিকে এগিয়ে আসে পলাশ।

না-না-না—। ভীত চাউনি বিদিশার।

এই বুভুক্ষু মন নিয়ে সাত আট মাস সেই দূর দেশে থাকতে পারবোনা বিদিশা। তাই আমার ভালোবাসার স্বীকৃতি চাইছি। একবার—শুধু একটি বারের জন্যে—

না-না-পলাশ—প্লিজ—

কথাটা শেষ হয়না, তার আগেই ঠোঁট দুটো চেপে ধরে পলাশ। তবুও করুণ একটা আর্তনাদ বিদিশার সমস্ত অন্তরে অনুরণিত হতে থাকে। অবশেষে মুক্তি যখন পায়, তখন মনে হয়—বুঝি এক যুগ কেটে গেছে। ছুটে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে বিপর্যস্ত মন নিয়ে। দুচোখে ধারা।

একটি একটি করে দুটি বছর কেটে গেছে তারপর। ইতিহাসের রং পাল্টেছে। জন্ম নিয়েছে নতুন বাংলাদেশ। লক্ষ লক্ষ নরনারী লুটিয়ে পড়েছে তার বুকে। কেউ প্রাণ হারিয়ে আর কেউ ইজ্জৎ হারিয়ে। রাতের অন্ধকারে যখন কানে ভেসে এসেছে কোন অসহায় নারীর আর্তনাদ আর বুভুক্ষু সৈনিকের পাশব উল্লাস, তখন কেবলই মনে পড়েছে পলাশের কথা। তফাৎ কিছু নেই শুধু একজন শত্রু আর অপরজন বন্ধুর ছদ্মবেশে। আতঙ্কে দরজার দিকে বারবার তাকিয়েছে বিদিশা। মনে হয়েছে এই বুঝি পলাশ এলো সৈনিকের পোষাক পরে।

যুদ্ধ শেষ। পাশব উল্লাসও থেমে গেছে। তবুও আতঙ্ক কাটেনি তার মন থেকে।

বিদিশা দেবী—

উঁ—

কি ভাবছেন?

না, কিছু না।

কথাটা আমি ঠিক ওভাবে বলতে চাইনি। লজ্জা প্রকাশ পায় তার গলায়। যদি কিছু মাত্রও দুঃখ পেয়ে থাকেন তার জন্যে আমি সত্যিই লজ্জিত।

আপনার লজ্জা পাওয়ার কারণ নেই শোভন বাবু। ঐ কথাটা একটা দুঃস্বপ্ন বয়ে এনেছিলো। মনে হয়েছিলো তেমনি আর একটা কাল বৈশাখী বুঝি আবার ছুটে আসছে আমার সমস্ত কিছু ওলটপালট করে দেবার জন্যে। কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হয় তাকে।

দুঃস্বপ্ন! কালবৈশাখী—

হ্যাঁ শোভনবাবু। বাংলাদেশের যুদ্ধ আমাদের ঘর ছাড়া করেছে সত্য, কিন্তু তার অনেক আগেই ঘরের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে সেই কাল বৈশাখীর ঝড়ে। বিপর্যস্ত হয়েছে আমার সতীত্ব—নারীত্ব।

আমি—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না বিদিশা দেবী। আপনার কথাগুলো কেমন যেন ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট।

শুধুই অস্পষ্ট? একটু হাসে বিদিশা। তারপর থেমে থেমে বলে—বর্ণহীন, স্বাদহীন নয়? হওয়াই তো স্বাভাবিক। যে নারীকে তার সতীত্বটুকু অবধি বিসর্জন দিতে হয়েছে আর একজনের ভালোবাসার জের মেটাতে—নিজের বলতে তার আছেই বা কি? কয়েক মুহূর্ত নীরবে বসে থেকে একটু ম্লান হেসে বলে—আমার স্বপ্নের ইমারৎ ভেঙ্গে গেছে শোভন বাবু ভালবাসার খেসারৎ দিতে গিয়ে।

ভালোবাসা! মিথ্যে কথা, সেটা ভালোবাসা নয়, অন্য কিছু। ভালোবাসা সৃষ্টি করে বিদিশা দেবী, ধ্বংস করেনা। ভালোবাসা স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্ন ভাঙেনা, আমি—আমি সেই স্বপ্নের কথাই বলতে চেয়েছিলাম।

চমকে মুখ তোলে বিদিশা। আপনি—

হ্যাঁ।

কিন্তু আমার যে কিছুই বলা হয়নি?

শুনতে চাইনি কিছু।

কিন্তু যা ভেঙে গেছে তা নিয়েই বা করবেন কি?

চোখে চোখে চেয়ে থাকে শোভন। বিদিশা দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। একটু হেসে শোভন বলে—আমাদের স্বপ্ন তার ঐশ্বর্য দিয়েই সমস্ত ভাঙাকে আবার গড়ে নেবে বিদিশা। তুমি ভয় পেয়োনা। আমি তো আছি। তোমার অতীত দুঃস্বপ্ন হয়েই থাক। নতুন প্রভাত যেমন রাতের দুঃস্বপ্ন মুছে দিয়ে আবার আশা জাগায়, আলো দেখায়, তেমনি তোমার জীবনও আবার গড়ে উঠুক নতুন আশা আর আনন্দ নিয়ে।

শোভন—চোখ তোলে বিদিশা।

হ্যাঁ। দিনের সূর্য রাতের অন্ধকারকে মুছে দেবে।

প্রতীক্ষা

দূর থেকে শব্দটা ভেসে আসছিল। শব্দটা গোঙানির। এত অন্ধকার যে খালি চোখে কিছুই দেখা যায় না। শুধু জোনাকীর আলোগুলো হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল দপ্ দপ্ করে। জায়গাটা নির্জন। সামনে ছোট একটা শাখানদী বয়ে গেছে। দু' একটি কারখানাও গড়ে উঠেছে এর আশে পাশে। এক মাঝি ভাটিয়ালি গান গেয়ে চলেছে আপন মনে। প্রাণের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাচ্ছে তার গানে। পশ্চিম বাংলা থেকে মাস তিনেক হল বদলী হয়ে এসেছে সুপ্রিয়। কারখানাব এক মোটা মাইনের চাকরী করে সে। বাইরে থেকে লক্ষ্য করলে মনে হবে ওর জীবনে কোন সমস্যা নেই।. কিন্তু ভিতরে একটানা জীবনযন্ত্রনায় ছট্ফট্ করছে ও। পরণে দামী পাঞ্জাবী, হাতে একটা চুরুট নিয়ে বেতের চেয়ারে বসে তাকিয়ে ছিল নদীর ওপারের দিকে। এক সময় মাঝির গান থেমে গেল। সুপ্রিয়ব চমক ভাঙ্গল। আবার সেই গোঙানির শব্দ। নাঃ, অসহ্য! চেয়ার থেকে উঠে বাঙলোর দিকে আস্তে আস্তে চলে যায় সুপ্রিয়।

রুগ্না শকুন্তলার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়। মাথায় হাত রাখে। মনে হল জ্বর আরো বেড়েছে।

—"তুমি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ো। বলেই শকুন্তলা পাশ ফিরে শোয়।

—"হ্যাঁ," চিন্তিত মনে সুপ্রিয় জানালো। তুমি কিছু খাবে না?"

—"আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। ডাক্তারবাবু কাল আসবেন তো?"

—হ্যাঁ বলে এসেছি।

সুপ্রিয়র বিয়ের পর ছ'মাস কেটে গেছে। কিন্তু বিরাট অঘটন ঘটে গেছে এর মধ্যে। শকুন্তলা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ডাক্তার চিন্তিত মুখে বলেছিল,

"অসুখটা সাধারণ নয়; সাংঘাতিক ঘাবড়ে গিয়েছিল সুপ্রিয়। এদিকে বাড়ীতেও একটা খবর পাঠানো দরকার। কিন্তু না। সে পথও বন্ধ। কেউ আসবে না, কারণ ওরা বাড়ীর অমতে বিয়ে করেছে। সুপ্রিয় চিন্তায় পড়ে গেল।

ডাঃ রজত চৌধুরী সুপ্রিয়র সমবয়সী। রজতের ডিস্পেনসারিতে সেদিন গিয়েছিল সে। স্ত্রীর হাতের তৈরী চা খাইয়ে দিলেন অথচ পরিচয় করাবার সময় হয় নি। হয়ত সাধারণ ভদ্রতার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন।

রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি সুপ্রিয়র। জানালার ধারে গিয়ে অন্ধকার ঘেরা প্রকৃতির রূপ ভালভাবে দেখার চেষ্টা করছিল; আর ভাবছিল বিদিশার কথা।

ওকে সে একদিন কথা দিয়েছিল বিয়ে করবে বলে। কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছিল সামান্য একটা সন্দেহের বশে। বিদিশার সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকে ওকে লক্ষ্য করে এসেছে। সব সময় 'বয় ফ্রেণ্ডদের' প্রশংসা করেছে বিদিশা প্রথম প্রথম অবশ্য গুরুত্ব দিয়েছিল অনেক। সুপ্রিয় রোমাণ্টিক নায়কের মতো বিদিশাকে নিয়ে বেড়িয়েছিল অনেকবার। অনেকের ঈর্ষার পাত্রও হয়েছিল। কিন্তু পুরুষ মানুষের সঙ্গে মেশাটা যেন বিদিশার নেশার মতো। মাঝে মাঝে রং বদলায়। সেইজন্য সুপ্রিয়র মূল্য কমে গেছে। যাকে সব সময় কাছে পাওয়া যায় তাঁর ভাগ্যে অবহেলা তো থাকবেই। তবুও সুপ্রিয় আশা ছাড়েনি। তাঁর জীবনের উত্থান-পতনে ওর ভূমিকার গুরুত্ব অনেক। ওকে হারালে তাঁর সব কিছুই হারিয়ে যাবে। নষ্ট হয়ে যাবে বড় হবার সব আশা। সুপ্রিয় ভাবল নিজেই ওর জীবন থেকে সরে যাবে। এ ধরণের মানসিক অশান্তি পড়াশুনার ভীষণ বিঘ্ন ঘটাবে। এত মেলামেশার মধ্যেও যদিও কোন মতের অমিল হয় তবে এ ভালোবাসার সার্থকতা কোথায়? সে যদি সত্যিই ভালোবাসতো তবে নিশ্চয়ই সব সময় তাঁর কথা চিন্তা করত এবং তার অনুপস্থিতি তাকে নিশ্চয়ই পীড়া দিত। কিন্তু না। সুপ্রিয় অনেকবার বিদিশার সঙ্গে কথা না বলেও দেখেছে যে সে তার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। যদিও বিয়ের প্রসঙ্গে কয়েকদিন আগেও নিজের মুখেই স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু তারপরেও পার্কে বসে অন্য ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারা বা সিনেমায় যেতে দেখেছে সে নিজের চোখেই।

তারপর একটি মাত্র চিঠি। সব সম্পর্ক নিজেই চুকিয়ে দিয়েছে। এরপর তার জীবনে এল শকুন্তলা। এই শকুন্তলা সেদিন শরিকী সংঘর্ষের মুখে পড়ে গিয়েছিল। বোমবাজি হচ্ছিল অনেকক্ষণ ধরে। সুপ্রিয় ওকে সাহায্য করেছিল। এরপর ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল। বিয়ে করল শুধু বিদিশার গর্ব ভাঙবার জন্যে। বিদিশার সঙ্গে দু'বার দেখা হয়েছিল। কিন্তু অল্প সময়ের জন্যে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সে। হয়তো কিছু বলবার ছিল না বিদিশার।

*　　　*　　　*　　　*

শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে সুপ্রিয় ভাবছিল, বোধ হয় বিদিশার অভিশাপ তার সুন্দর জীবনটা এভাবে নষ্ট করে দিল। পরদিন সকালে ডঃ রজত চৌধুরী এলেন। পরীক্ষা করলেন শকুন্তলাকে।

শকুন্তলার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—"আজ কেমন আছো? ওঃ, এক্সকিউজ মী কেমন আছেন?

সুপ্রিয়র কানে কথাটা গিয়েছিল। হঠাৎ চমকে উঠল ও। তবে কি শকুন্তলার সঙ্গে রজতের পরিচয় ছিল নাকি! রজত কোলকাতার ছেলে, হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। শকুন্তলা সত্যিই পরমা সুন্দরী। তবুও যেন মনে হচ্ছে মিথ্যা সন্দেহ তার। ওর চাহনিতে এখনও স্বাভাবিকতা বজায় রয়েছে।

রজত হাত ধোয়ার সময় সুপ্রিয়কে বলল—"কোনো ভয় নেই। সুপ্রিয়বাবু, 'ইনজেকসন'টায় কাজ হবে বলে মনে করি।

—ও, চলুন আমার বাড়ীতে, গিয়ে গল্প-গুজব করা যাবে।

সুপ্রিয় ডাক্তারের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। এ অঞ্চলে বাঙালীর সংখ্যা নেহাৎ কম। রজতবাবুরও হয়তো অস্বস্তি লাগে একা থাকতে। তাই সুপ্রিয়কে টেনে নিয়ে যায়।

রজতের "ড্রয়িং রুমটা" সুন্দরভাবে সাজানো। সোফায় গিয়ে বসল সুপ্রিয়। কিছুক্ষণ পর পরদা ঠেলে যিনি এলেন তাকে দেখে চমকে উঠল সুপ্রিয়। এ কি! রজতের স্ত্রী বিদিশা! বিদিশা হাত তুলে নমস্কার করল স্বাভাবিক ভাবেই। তারপরেই কফি কাটলেটের প্লেটটা নামিয়ে রেখে চলে যাবার সময় রজত উচ্চ কণ্ঠে বলল—এ কি তুমি চলে যাচ্ছ যে! এ ভদ্রলোক আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এঁর সঙ্গে কথা বল। অগত্যা বিদিশাকে বসতেই হল।

কিভাবে কথা আরম্ভ করা যায় এ নিয়ে দু'জনেই মনে মনে চিন্তা করছিল। রজত নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিল। খাওয়া শেষ হলেই উঠে পড়ল ও।

—সুপ্রিয় বাবু, কিছু মনে করবেন না, একটা রোগী দেখতে যেতে হবে। সাড়ে নটায় যাবার কথা, আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরবো। সাইকেলে চেপে রজত বেরিয়ে গেল। বিদিশা ও সুপ্রিয় তাকিয়ে রইল। একে অপরের দিকে।

বিদিশা প্রথম কথা বলল—সেদিন বাসস্ট্যাণ্ডে মুখ ঘুরিয়ে চলে গিয়েছিলে কেন তা বুঝতে পারছি। কিন্তু তুমি এখনও বুঝতে পারনি যে তোমার সঙ্গে ছলনা করিনি। তোমার মন পরীক্ষা করার জন্যে খেয়াল বশে এ সব করেছিলাম। তোমার সহনশীলতা পরীক্ষা করতে ইচ্ছে হয়েছিল খুব।

—ও, এভাবে অপমান করে তুমি সহনশীলতা যাচাই করছিলে? যাক্, রজতবাবুকে তো পেয়েছ। এখন সুখেই কাটছে কি বলো?

—ও আমার সম্বন্ধে সব জেনেছে। তারপর থেকেই আমার সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করছে যে আমি নাকি আগের প্রণয়ীকে আগের মতই ভালোবাসি।

—বিদিশা, তোমার সামান্য খেয়ালের জন্যে চারটি জীবন নষ্ট হল।

বিদিশার চোখে জল এসেছিল। সুপ্রিয়র হাত ধরে বলল—কিছু মনে কোরো না এ ব্যাপারে আমিই দায়ী।

সুপ্রিয় উঠে দাঁড়াল। কোনো জবাব দিল না। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল বিদিশার কাছ থেকে। সারাটা পথ চিন্তা করতে করতে বাঙ্লোয় ঢুকে যা দেখল তাতে সত্যিই ও বিচলিত হল। শকুন্তলা বলছে—শেষ পর্যন্ত বাবা মার কথাটাই ভাল মনে করলে! আমার ভালোবাসার মূল্য এভাবে দিলে! এ ধরণের অভিনয় করে মেয়েদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে তোমার একটুও সঙ্কোচ হয় না?

ডাক্তার রজত চৌধুরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—শকুন্তলা, আমি এর জন্য খুবই দুঃখিত। বাবা আত্মহত্যা করে মরবেন বলে সেদিন ভয় দেখিয়েছিলেন। আমি সে জন্যে সরে যেতে বাধ্য হয়েছি তোমার জীবন থেকে।

—আমি কী সেরে উঠব আবার?

—নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রজত উঠে দাঁড়াল।

সুপ্রিয় নিজেকে আড়াল করে চোরের মত ঘর ছেড়ে পালিয়ে এল। শকুন্তলা ভালো হয়ে উঠবে আবার আগের মত কথা বলবে, সুপ্রিয় ভাবতে থাকে সে প্রতীক্ষা করবে তার স্ত্রীর সুন্দর স্বাস্থ্য, আর —! আর তার স্ত্রী শকুন্তলা কিসের প্রতীক্ষা করবে? না না সে জানে না, অথবা জানলেও বলতে পারবে না।

স্বীকারোক্তি

দীপংকর সেন

অমর্ত আর আমি এক সঙ্গে মানুষ হয়েছিলাম একই গ্রামে। বাবাই অমর্তকে আমাদের বাড়ী নিয়ে আসেন। আমার যখন পাঁচ বছর বয়স ঠিক তখনই। এখনও সেদিনটা মনে আছে। কালো পাথরে কুঁদে তৈরী করা ছোট্ট ছেলে। মাথায় একরাশ কোকড়ান চুল। চোখ দুটি জীবন্ত। খুব খুসি হয়েছিলাম আমি। খেলার সঙ্গী পেলাম বলে।

শুনলাম বাবা মাকে বলছেন, ওকে না এনে পারলাম না। ওর বাবা আর মা এক রাত্রেই কলেরায় মারা গেল। আমি যখন পৌচেছি তখন ওরা কেউ নেই। তুমি রাগ করোনা। ওকে দেখে মায়া হোল। সঙ্গে করে নিয়ে এলাম।

বাবার ডাক্তার হিসেবে নাম যশ ছিল। পাঁচটা গাঁ থেকে ডাক আসতো। তাহেরপুর গ্রামে অমর্তরা থাকতো। ওরা জাতে বাগদী। বাবা ওকে নিয়ে আসায় মা প্রথমটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কারণ ছেলেটা আমাদের পরিবারের মধ্যে মিশে যাবে এটা তিনি ভাবতেই পারছিলেন না। ছেলে মানুষ করার দায়িত্বও তো কম নয়।

ছিল। কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও যেন বদলে গেল।

আমিও বদলাচ্ছিলাম। প্রকৃতি যেন আমাকে ভরিয়ে দিচ্ছিল। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি অমর্ত্তই বুঝিয়ে দিল। একদিন নদীতে স্নান করতে গিয়ে দেখি অমর্ত্ত আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বললাম, কি দেখছো ?

অমর্ত্ত বললে, রাধা তোর শরীরে জোয়ার এসেছে।

কথাটা বুঝতে না পেরে শরীরের দিকে তাকালাম। দেখলাম ভিজে শাড়ীটার মধ্যে দিয়ে আমি যেন ফুটে উঠেছি। আমার প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এক অপূর্ব শিহরণ খেলে গেল।

লজ্জা পেলাম। বললাম, আঃ কি হচ্ছে! তোমাকে না বাবা বিশ্বাস করেন।

বললে, অবিশ্বাসের কাজ কি করলাম? জীবনের ধর্ম্ম তো অস্বীকার করতে পারিনা।

ওর কথার ধরণই ছিল ঐ রকম।

চুপচাপ তুজনে বাড়ী ফিরলাম। অমর্ত অবিশ্যি কিছু পরে ফিরলো। এমন ভাব দেখাল আমার সঙ্গে নদীতে ও যেন স্নান করতে যায়নি।

অমর্ত্তই আমাকে নিজের সম্বন্ধে সচেতন করে দিল। তারপর প্রায়ই আমি আয়নায় নিজেকে দেখতাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এত ভাল লাগতো কি বলবো। আমাব মাথার একরাশ চুল, টানা টানা চোখ, ফর্সা রঙ, নববিকশিত যৌবনোদ্গম বুক, পাছা, কি না ভাল লাগতো। ভালবাসলাম অমর্ত্তকে। ওর সবল দেহটার একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করলাম। ওর সঙ্গে গল্প করতে কেন যে এত ভাল লাগতো বুঝতে পারলাম না। এটাই বুঝি যৌবনের ধর্ম! ওর সঙ্গে সারাদিন কথা না বলতে পারলে মনটা খুব খারাপ হয়ে যেত।

অমর্ত্তকে বাবা পছন্দ করতেন। কিন্তু ওর সঙ্গে আমার এই অন্তরঙ্গতার কথা জানলে বকুনি খাবে এটা আমি খুব জানতাম। বাবার মন যতই উদার হোক না কেন আমাদের এই সম্পর্ককে তিনি বরদাস্ত করতে পারবেন না এটা আমার মন বলতো। কিন্তু আমি পারতাম না নিজেকে আটকে রাখতে।

একদিন পেয়ারা বনে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। সবেমাত্র কলেজ থেকে ফিরছি। দেখি অমর্ত্ত পেয়ারা পাড়ছে।

বললে, এই নাও। কিন্তু দিলে না।

লুকোচুরি চললো। ও পেয়ারা নিয়ে ছুটতে লাগলো। আমার জেদ চেপে গেল। আমিও ওর পেছু পেছু ছুটতে লাগলাম।

এক সময়ে ও আমাকে জড়িয়ে ধরলে। সত্য কথা বলতে আমার খুব ভাল লাগছিল। তারপর ও যখন আমার ঠোঁট দুটো চেপে ধরলে ওর ঠোঁট দিয়ে কি আনন্দ হচ্ছিল কি বলবো! সারা শরীরে শিহরন বইছিল। অনেকক্ষণ আমরা দুজনকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল ও কেন আমাকে নিষ্পেষণ করেনা। আমার সারা দেহে একটা নিষ্পেষিত হবার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল।

তারপর ও বিদেশে চলে গেল চাকুরী নিয়ে। আমি ওর পথ চেয়ে থাকতাম। কবে ও আসবে? এক সময়ে ও এল।

বললে, বাধা মাত্র একদিনের ছুটি নিয়ে এসেছি। তোকে না পেলে আমি বাঁচবো না, চল আমরা পালাই।

বললাম তা হয়না, আমরা বিয়ে করবো।

বললে সেই ভাল, চল কলকাতা যাই। আমি যেখানে থাকি তার কাছেই একটা বিয়ের অফিস আছে। সেখানে রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ করবো আমবা।

আমি অমর্তর সঙ্গে কলকাতা পাড়ি দিলাম। আগেই ঠিক করেছিলাম ওর এক দুর সম্পর্কেব কাকার বাড়ীতে উঠবো। তাই উঠলাম। তবে যাবার দিন আমি বাবাকে একটা চিঠি দিয়ে গেলাম। সব জানিয়ে বললাম, আমাকে তুমি ক্ষমা কোবো।

বাবা কলকাতা থেকে আমাকে নিয়ে এলেন সেদিন রাত্রেই। অমর্তর সঙ্গে থাকা আব হয়ে ওঠেনি। বাবাকে দেখে অমর্ত কিছু বললে না। মাথা নীচু করে রইলো। বাবা বললেন, আমি তোমাব কাছে এটা আশা কবিনি। সেদিনই আমাদেব রেজেষ্ট্রি ম্যারেজ হয়ে গিয়েছিল। রাত্রে মাথায় সিঁদুর দিয়ে আমি বাসর ঘর সাজাবার ব্যবস্থা করছিলাম। করা হল না। শূন্য বাসর ফেলেই আমি বাবার সঙ্গে চলে এলাম।

বাড়ী এসে বাবা আমার মাথার সিঁদুর ধুয়ে ফেলতে বললেন। তাঁর কঠোর নির্দেশ আমি অমান্য করতে পারলাম না।

[illegible] পেলাম। আত্মহত্যা করার আগে এই চিঠি লিখেছে। বলেছে সে আমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না।

পাশের বাড়ীর রবীন কলকাতা থেকে এসেছে। সেও জানালে, অমর্ত্ত ট্রেনের তলায় নিজেকে সঁপে দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আজ আমার মাথার সিঁদুর মোছার কোন প্রয়োজন নেই। ওর রক্তের মধ্যেই যেন আমার সিঁদুর মুছে গেছে। আমি কি করবো বুঝতে পারছিনা। আমি কিছুই ভাবতে পারছিনা।

—•—

অনুশোচনা

শিপ্রা মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমাকাশে একমুঠো আবির ছড়িয়ে সূর্যদেব অস্ত গেলেন। অস্তগামী সূর্যের আলো পড়েছে সামনের গাছটায়। একঝাঁক পাখী উড়ে গেল— বোধহয় ফিরে গেল তাদের কুলায—একান্ত নিরাপদ আশ্রয়ে—তাদের শান্তির নীড়ে। আচ্ছা পাখীর নীড়ের মত আমার আশ্রয়টাও কি খুব সুখের—খুব শান্তির? আমার এই চল্লিশ বছরের জীবনে আমি কি কোনদিন সুখের মুখ দেখেছি? আমার চোদ্দ বছরের বিবাহিত জীবন—যা আপাত দৃষ্টিতে সুখের, যা বাইবে থেকে লোক দেখে বলবে সুখের তা কি সত্যিই সুখের? এই চোদ্দ বছরের বিবাহিত জীবনের একটা দিনও কি আমার শান্তিতে কেটেছে? না—শান্তি আমি পাইনি একদিনের জন্যও। সব সময় অশান্তির আগুন জ্বলেছে আমার বুকের মধ্যে। বাইরে থেকে দেখে কেউ বুঝতে পারেনি—আমি জেনেছি—অজস্র কথা বলেছি—বেড়িয়েছি। আমার স্ত্রী কোনদিন আমার মনের খবর পেয়েছে? না পায়নি। আমার বুকের মধ্যে সারাদিনরাত যে অশান্তির আগুন জ্বলছে তার খবর আর কেউ পায়নি।

ছাত্র—খেলাধূলায় খুব ভাল ছিলাম। কলেজের ফুটবল টিমের আমিই ছিলাম ক্যাপ্টেন। আমাদের যেদিন ফুটবল ম্যাচ থাকত সে আসত খেলা দেখতে। কোন কারণে আমি যদি ভাল না খেলতে পারতাম দেখতাম তার মুখটি বড় ম্লান হয়ে গেছে। খেলার শেষে আমার কাছে এসে অনুযোগ করত "কি হয়েছিল আজ। ভাল খেলতে পারলে না কেন?" আমি বলতাম, "রোজই কি শরীর ভাল থাকে—না মন ভাল থাকে?"

আমাদের কলেজেই সে পড়ত। যেদিন সে পরে আসত আসমানী রঙের শাড়ীটি সেদিন তাকে ভারি সুন্দর দেখাত। আমি দূর থেকে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখতাম। আমার চোখে চোখ পড়লে তার চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

একদিন আমি তাকে বললাম, "জীবনটা বড় একঘেঁয়ে হয়ে গেছে। একটু বৈচিত্র্য আনা যাক। রোজ আমরা যা করি না, আজ তাই করব। আজ আমরা অজস্র কথা বলব, অকারণে হাসব আর কোন বাধা না মেনে অনেক দূরে ঘুরে আসব। রাজী আছ?" ও মৃদু হেসে বলল "রাজী না হয়ে উপায় নেই। তুমি বলেছ। আমার মনে হোত সে যেন তার সব ভালবাসা উজাড় করে আমার পায়ে ঢেলে দিয়েছে। ওর মন প্রাণ জুড়ে আছি আমি। এক মুহূর্ত আমার কথা না ভেবে ও থাকতে পারে না। মনে মনে ভাবতাম আর আনন্দ পেতাম। আর নিজের মনকে প্রশ্ন করতাম, "আমিও কি ওকে ভালবাসি?" জবাব খুঁজে পেতাম না। কখনও মনে হোত ওর সব কিছু আমার এতো ভাল লাগে, তবে হয়তো আমি ওকে ভালবাসি। আবার কখনও মনে হোত—না আমি ওকে ভালবাসিনি। আমি মনে মনে ভাবতাম, "আচ্ছা আজ যদি ও মরে যায়। তবে কি আমি কাঁদব?" 'বোধ হয় না। তবে ভালবাসা বলছি কাকে? —এই রকম হাজারোরকম প্রশ্নে যখন আমি সংশয়ের দোলায় দোদুল্যমান তখন একদিন ওকে আবিষ্কার করলাম কফি হাউসে—হেসে হেসে কথা বলছে আমারই ক্লাসমেট আশিসের সঙ্গে।

যে মুহূর্তে ওকে দেখলাম আশিসের সংগে হেসে হেসে কথা বলতে সে মুহূর্তে আমার আত্মসম্মানে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। আমি এতোদিন ভেবে এসেছি ও আমাকে ভালবাসে—ওর সমস্ত মন প্রাণ জুড়ে আছি আমি—প্রতি

মুহূর্তে সে আমার কথা ভাবে। সেদিন আবিষ্কার করলাম আমার অনুমান সম্পূর্ণ ভুল। আমার কথা না ভেবেও সে থাকতে পারে—আমার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে ও হেসে হেসে অন্য একটি ছেলের সঙ্গে গল্প করতে পারে।

আমি বেরিয়ে আসলাম কফি হাউস থেকে। তারপর অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। কফি হাউসের দৃশ্যটি বার বার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। ওর ওপর প্রচণ্ড আক্রোশে আমি ভেতরে ভেতরে গুমরোতে লাগলাম। আমার মনে হোল ওর ভালবাসা আমারই একমাত্র প্রাপ্য। আমি মনে মনে চাইতাম ও আমাকে সারাজীবন ভালবেসে যাক। আমি ছাড়া ওর জীবনে যেন আর কোন পুরুষের আবির্ভাব না ঘটে।

তারপর এল সেই ভয়ংকর দিন—সেদিন আমি হাসতে হাসতে ওর কাছে গিয়ে বললাম, "এই বেড়াতে যাবে? চল একটু ঘুরে আসি।" ও রাজী হয়ে গেল। তারপর আমরা বেরিয়ে পড়লাম কলেজ থেকে। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে গেলাম। আমি ওকে বললাম "একটু কিছু খেলে হোত না? চল এই রেস্টুরেন্টে ঢোকা যাক।" তারপর আমরা একটা রেষ্টুরেন্টের কেবিনে গিয়ে বসলাম। ও আমাকে বলল, "ভীষণ জল তেষ্টা পেয়েছে।" আমি সুযোগ খুঁজছিলাম। একগ্লাস জল চেয়ে নিয়ে এসে তার মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিলাম—আমার পকেটেই ছিল। জলের গ্লাসটা ওকে দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম রেস্টুরেন্ট থেকে। তারপর মিশে গেলাম কলকাতার বিশাল জনসমুদ্রে।

না ধরা আমি পড়িনি। কেউ বুঝতে পারল না কি জঘন্যতম কাজ আমি করেছি। আজও আমি তাই অক্ষত দেহে বেঁচে আছি। আমার বাইরেটা দেখে কেউ বুঝতে পারে না আমার বুকের মধ্যে কি অশান্তির আগুন জ্বলছে সর্বক্ষণ। বিবেকের হাত থেকে আমি রেহাই পাইনি। সর্বক্ষণ বিবেকের তীব্র দংশন অনুভব করেছি। বিশ বছর ধরে আমি ঘুমুতে পারিনি—আকাশের তারার সঙ্গে জেগে থেকে রাতের প্রহর গুনেছি। একটি ফুলের মত সুন্দর প্রাণকে আমি হত্যা করেছি। আমি পাপী—আমি খুনী—এই একটি কথা সর্বক্ষণ আমাকে একটি বিষাক্ত কীটের মত দংশন করছে।

সুন্দর

মহঃ রফিক

বয়স্ক নাতির সঙ্গে দাদু বসে আছেন রোয়াকে। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। সুন্দর কাকজ্যোৎস্না। দাদুর অজান্তে দীর্ঘশ্বাস। মুখে অস্ফুট শব্দ, মরহুমদের প্রতি আশীর্বাদ বাণী। আল্লা-তায়ালার কাছে প্রার্থনা। সকলেই যেন জিন্নতবাসী হয়।

জিন্নতবাসী মানে কি দাদু ? নাতির প্রশ্ন। জিন্নতবাসী মানে বেহেস্ত্‌বাসী। পবিত্রস্থান যিনি লাভ করেন—এক কথায় সুন্দর জায়গায় বসবাস। দাদু উত্তর দেন।

কিন্তু যা কিছু সুন্দর তাই কি পবিত্র ? নাতি বললো।

ফুল,—সুন্দর।

শিশু,—তার সরলতা সুন্দর।

তার হাসি,—প্রাণের মিষ্টি ছোঁয়ার খোরাক।

পৃথিবীটা,—কবির ভাষায় সুন্দর।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।'

দাদুর চোখে মুখে হাসির ঝিলিক্। নাতির জিজ্ঞাসু মনে ব্যগ্র উৎকণ্ঠা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

নাতি বললো—তবে কি মোপাসাঁ ভুল করলেন ? কেন তিনি এই ভুবন প্রকৃতিকে নিষ্ঠুর বললেন ? কেন তাকে জঘন্য চরিত্রে রূপ দিলেন ? কেন তিনি বললেন পৃথিবীটা একটা আগ্নেয় গিরি—বিসুভিয়াস ?

পরক্ষণেই নাতির মনে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ছায়া। ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি—'লুসি' সুন্দর।

বিহারীলালের অন্তরলোকে এই প্রকৃতি, নারী মোহিনী নয়,—অপরূপা সুন্দরী। মোপাসাঁর প্রকৃতিতে এত বিরূপ কেন ?' চারিদিকে তাকিয়ে

দেখেছেন 'নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব।' যন্ত্রনার আর্ত্ত চীৎকার। গলিত শবাধার—প্রকৃতিতে দুর্গন্ধের ছাপ—আবর্জনার স্তূপ।

নাতির নিরন্তর জিজ্ঞাসা। দাদুর মুখে কথা বন্ধ। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

নাতি বলতে থাকে—লক্ষ লক্ষ মৃতদেহের মিছিল গোরস্থানে ফেস্টুন হাতে দাঁড়িয়ে কেন? কি চায় ওরা? কোরবানির উট বা দুম্বা বুঝি জোগাড় হয়নি? ওঃ ভুলেই গেছি কয়েকদিন পর বগরীদের নামাজ। কোরবানি হবে। নামাজ পড়ে উটের কিংবা দুম্বার গলায় ছুরি চালাবে। তার পুষ্ট শরীরের অংশীদার হতে চায়। কী সুন্দর ধর্মের ফিরিস্তি! কী নেকড়ে লোলুপ ক্ষুধা! শুধু সুন্দরের দোহাই। অস্থি-মজ্জায় উন্মত্ততার নেশা। প্রলোভন—নিজেকে সুন্দরভাবে বাঁচাবার কলাকৌশল।

আচ্ছা দাদু আমার বিবাহিতা জানাবেগম কোথায়? সে তো প্রকৃতি। সে তো একটা নারী। সে তো অপরূপা সুন্দরী—আমার কাছে নূরজাহান। সে আমার বিবাহিতা—পত্নী। হ্যাঁ, আমি তাকে মনে প্রাণে ভালোবেসে-ছিলাম। তবে সে চলে গেল কেন? অন্য কাউকে ভালোবেসে ছিল বলে?

মনে পড়েছে দাদু—সেদিন তাকে দেখেছি—আলোছায়ার অন্ধকারে। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছি। বারবণিতা পাড়ার একটা দরজায় দাঁড়িয়ে সে। মুখে লিপষ্টিক্ বুকের আঁচল আধখোলা—চোখে মুখে ইশারার সংকেত। অনেক মৌমাছির ভীড়—প্রতিযোগীদের সুন্দর পসরা বেছে নেবার পালা।

জানাবেগম তো একটা নারী—প্রকৃতি। তবে কি সে সুন্দর নয়? কিন্তু ওই কয়েক ঘণ্টা? জানাবেগম অপরিচিত সঙ্গীর কাছে বিশ্বের সেরা সুন্দরী। সুন্দর জিনিসের কাছে ভালোবাসা থাকাটাই সমীচীন। এও এক ধরণের ভালোবাসা।

ভালোবাসা মানেই তো সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ। তবে আদম্-ইভ্ স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিল কেন? তাঁরাও তো পরস্পর পরস্পরের কাছে সুন্দরের প্রতীক। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছিল বলে? সেটাও তো প্রকৃতির একটা অংশ। প্রকৃতি সুন্দর—সুন্দরের মূর্তিমতী বিগ্রহ। পুরুষের একান্ত ভোক্তা। কবিরা বলেন—'যা কিছু সত্য তাই সুন্দর।' পৃথিবীটা তো সত্য।

কিন্তু ওই যে ভিক্ষুকটা বসে আছে পথের ধারে!—ওর কাছে পৃথিবীটা

রুগ্ন, পচা শতছিন্ন নোংরা ন্যাকড়া। নিজে আক্ষেপ করে মাথা কুটে মরে। ওর কাছে সুন্দর বলে কিছু নেই। ওর দু'চোখে ক্ষুধার আগুন—সুন্দর পুড়ে ছাই। সমস্ত শিরায় শিরায় যন্ত্রনার সুর—দেহেলী পর্দায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ছায়াছবি।

তুমি বলবে সে ছবি আরও সুন্দর। একেবারে সুপার রিয়ালিষ্টিক্। তোমার চোখে ভিক্ষুক নায়কের ভূমিকায় অদ্বিতীয় অতীব সুন্দর। কিন্তু সে নিজে? মৃত পশু। কবির বা ঐতিহাসিকের ইতিহাসে মৃত ভিক্ষুকের কথা সোনার অক্ষরে সুন্দর ভাবে লেখা থাকবে। দর্শকের চোখে ছবিখানির মূল্য অমূল্য। বাজারে জুড়ি মেলা ভার। নিউজরিলে ভিয়েৎনাম—বাংলাদেশের লড়াই আরও ভয়ঙ্কর মনোমুগ্ধকর। আণবিক বোমার বিস্ফোরণ—নাপাম বোমার উত্তাপ সর্ব্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দেয় ভিয়েৎনামবাসীর। সেখানেও সুন্দর কারুণ্যের মূর্ত্তি। রক্তপিপাসু শকুনির লাল চোখ—জিহ্বায় তীব্র লালসা। সে ছবি তাদের কাছে ভেরী চারমিং। বাংলাদেশে রৌশেনাবার বুকে মাইন—অনেক আশা আকাঙ্ক্ষার সুন্দর জীবন ধূলিস্যাৎ। দেশের জনগণের কাছে সুপার হিটেড ছবি। হাজার হাজার দর্শকেব বাহবা—সকলেব দৃষ্টিতে মৃত্যুটাই সুন্দর।

কিন্তু দাদু? আমার বিবাহিতা বেগম জানা—? তার সেই কমনীয় কান্তি দেহ, ললিত-যৌবন আমাকে কেন আর আকর্ষণ করে না? 'The beauty is joy 'for ever'—তার অপমৃত্যু ঘটেছে আমার কাছে। তাই কি সবচেয়ে সুন্দর? না,—জানাবেগমের পরিত্যক্ত—যা আমার কাছে একান্ত সযত্নে রক্ষিত লালিত পালিত হাঁটি হাঁটি পা—পা শিশুপুত্রের মিষ্টি হাসি সুন্দর? দাদু নিরুত্তর। মনে সংশয়ের ছাপ।

এমন সময় সুন্দর জ্যোৎস্না ভেদ করে সাইরেনের শব্দ। পুলিশ ভ্যানের হট্টগোল। মাইকে অ্যানাউন্স—বিওয়ার অফ্ ইওর এনিমি, গো টু দি কোয়াইট প্লেস।

কার জন্যে

গোপা মুখোপাধ্যায়

ফোনটা ঝন্ ঝন্ শব্দে বেজে উঠতেই হাতের বইখানা টেবিলের ওপর উল্টে রেখে জ্যোৎস্না চট্ করে রিসিভারটা তুলে নিল।

'হ্যালো, কাকে চাই' ?

ওদিক থেকে একটি সুন্দর পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল, 'তোমাকেই'।

'বটে, আমি কে বলুন তো ?'

'তুমি মালা'। 'না আমার নাম মালা হতে যাবে কেন ?'

'অন্যের কাছে না হলেও আমার কাছে তাই।'

'আচ্ছা ঠিক আছে বুঝলাম, কিন্তু আপনার নামটা কি শুনি ?'

আমার নাম মানস, ইচ্ছে হলে তুমি এটা বদলে রাখতে পার।'

'না তার দরকার হবে না।' বলেই জ্যোৎস্না সশব্দে রিসিভারটা নাবিয়ে রেখে দিলে।

তার পরদিনও ঠিক ঐ সময় ফোনটা ঝন্ ঝন্ শব্দে বেজে উঠলো। জ্যোৎস্না ফোনটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে ভেসে এলো সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর।

'কাল অমন করে ফোনটা ছেড়ে দিলে কেন ? কোন মন্দ কথা তোমায় বলেছিলাম কি ? তাহলে ? কত লোকের সঙ্গে দিনরাত কত কথা বলছো, তাতে ক্ষতি হয়না, আর আমার সঙ্গে ফোনের মধ্যে দুটো কথা কইলেই কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে বলতে পার ?'

'দরকার থাকলে নিশ্চয়ই কথা বলতাম। কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনিনা। কথা বলার কোন দরকার নেই যখন, তখন শুধু শুধু আপনার সঙ্গে কথা বলতেই বা যাব কেন ?'

'থাম থাম রাগের চোটে কি সব যাতা বলছো? আমাকে তুমি চেননা? আমার নাম মানস, তুমি জাননা? তাহলে? আর প্রয়োজন? সেটা তোমার না থাকলেও আমার তো আছে? ব্যস্ এই যথেষ্ট।'

'তা আপনি কি আমায় দেখেছেন কোনদিন?'

'না এখনও দেখিনি, তোমার বাড়ীর ডিরেকশনটা আমায় দয়া করে দেবে কি। তাহলে দূর থেকেই একদিন এ পাপ চক্ষু দুটিকে সার্থক করে নেব। তোমার তো তাতে কোন ক্ষতি নেই।'

জ্যোৎস্না আবার ফোনটা নামিয়ে রাখলো। তার বুকের মধ্যেটা যেন কেমন ধড়ফড় করতে লাগল! তারপর বন্ধু শর্মিলার কাছে কদিনের এই আজগুবি ঘটনার কথাগুলো বলে, জানতে চাইল, 'কি করি বলতো?' শর্মিলা বন্ধুকে সাহস দিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বললো 'ধ্যাৎ তুইও যেমন, কোথাকার কে তার ঠিক নেই! তুই ঘাবড়ে গেছিস মনে করে তোকে ভয় দেখিয়ে মজা করছে। দূর অতো ভয় পাস কেন? ও প্রশ্ন করলেই যা মুখে আসবে উত্তর দিয়ে যাবি। তাহলে দেখবি আর তোকে অমন জ্বালাতন করবে না। না হলে তুই যত ভয় পাবি ও ততই তোকে ভয় দেখিয়ে মজা করবে। ঠিক আছে কাল ঐ সময় আমি না হয় তোর কাছেই থাকবো, কি বলে শুনবো।'

পরের দিন জ্যোৎস্না আর উর্মিলা বসে গল্প করছে এমন সময় টেবিলে রাখা ফোনটা ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠলো! সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নার বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডটাও যেন ভীষণ ভাবে কেঁপে উঠলো।

উর্মিলা বন্ধুকে ভরসা দিয়ে বলে উঠলো, 'ধরনা ফোনটা, অতো ভয়টা কিসের শুনি?'

'হ্যালো' বলতেই সেই অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো 'আবার তোমায় জ্বালাতে এলাম' আচ্ছা, কালতো কৈ তোমার বাড়ীর ডিরেকশনটা আমাকে দিলে না?

জ্যোৎস্না কোনও রকমভাবে উচ্চারণ করলো 'ডিরেকশানটা?' বলে, উর্মিলার দিকে চাইতেই সে মাথা নেড়ে অভয় দিল, 'ভয়কি, তারপর বলে যা।' আগেকার প্ল্যান অনুযায়ী জ্যোৎস্না বললো, 'এখানে আসতে হলে, 'উর্বশী' সিনেমার পাশ দিয়ে ডান দিকে যে গলিটা গেছে, সেটাতে ঢুকে, একটু গিয়েই বাঁ দিকের গলিটায় যেতে হবে। তারপর আবার একটু গিয়ে

ডানদিকে উত্তর মুখো যে বাড়ীটা পাবেন, সেটাই আমাদের বাড়ী। তাহলে কাল দেখা হচ্ছে ?'

'হুঁ, তা হচ্ছে বৈকী। কাল ঠিক বিকাল পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে গিয়ে দেখা করছি।'

'ঠিক তো ?'

'একদম ঠিক।'

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে দুই বন্ধুতে খুব খানিকক্ষণ ধরে হেসে লুটোপুটি খেলো।

পরের দিন কিন্তু নিজের অজান্তেই জ্যোৎস্নার মনটা খারাপ লাগতে লাগল ! কৈ লোকটাতো আজকে ফোন করলো না ? যাক বাঁচা গেছে, বলে নিজের মনকেই যেন বোঝাতে লাগলো।

পরের দিন কিন্তু ঠিক সময়েই আবার ফোন করলো মানস।

'কালকে কিন্তু খুউব সুন্দব লাগছিল।'

'আমাকে ?'

'হ্যাঁ, তোমাকে'।

'তা বাড়ির ঠিকানাটা খুঁজে পেয়েছিলেন ?'

'কেন পাবনা ? তুমিই তো অমন সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলে আমাকে !'

'মিথ্যা কথা, মোটেই আপনি আসেন নি।' 'আচ্ছা প্রমাণ দেব তার ? বেশ দিচ্ছি শোন, তুমি একটি সবুজ রংয়ের শাড়ী পরে দু তিন জন বান্ধবীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিসর্জন দেওয়া দেখছিলে তন্ময় হয়ে। তোমার খোঁপায় গোঁজা ছিল রজনীগন্ধা ফুল। 'কি ঠিক কিনা তুমিই বল ? আরো প্রমাণ চাও কি ?'

'না. আচ্ছা আপনার রোজ রোজ এভাবে সময় নষ্ট করে কি লাভ হয় বলুন তো ?'

'মাঝে মাঝে এমন সময় আসে মানুষের জীবনে, যখন বিশেষ কারো জন্যে কিছু নষ্ট করে বিরাট তৃপ্তি আর আনন্দ পাওয়া যায় ! ধর সেটাই আমার লাভ।'

'কিন্তু লোকে কি মনে করবে এভাবে যদি রোজ রোজ ফোন করেন আপনি !'

'হ্যাঁ, সেটা একটা সমস্যা বটে ! কিন্তু প্রতিদিন বাড়ীফেরার আগে তোমাকে

সঙ্গে একটু কথা বলতে না পারলে মনটা ভীষণ খারাপ লাগে, কোন কাজেই মন দিতে পারিনা। মাত্র পাঁচটা মিনিট সময়ও কি তুমি আমার জন্যে নষ্ট করতে পার না মালা ?'

বেশ কয়েক মাস ধরেই মানস এই ভাবে জ্যোৎস্নার সঙ্গে পাঁচ মিনিট করে গল্প করে। জ্যোৎস্নাও এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। স্বাভাবিক ভাবে বন্ধুর মতই গল্প করে দুজনে। কোন দিন কোন কারণে 'ঐ পাঁচ মিনিট কথা কওয়াটা' নাহলে কিসের যেন একটা অভাব অনুভব করে!

কয়েক মাস যাবার পর বাড়ীর সকলে এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেই সাবধানতা অবলম্বন করলেন। ওঁরা জ্যোৎস্নাকে বকাবকি না করে যতক্ষণ ওর বাবা বাইরে থাকেন ততক্ষণ ফোনটা ওর মায়ের ঘরেই রাখার ব্যবস্থা করলেন।

জ্যোৎস্নার প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগত, একবার মানসকে ব্যাপারটা জানাবার ইচ্ছাও হ'ত, কিন্তু ওর ঠিকানা ইত্যাদি কিছুই ও জানতো না, কখনও ওকে দেখেনি, এমন কি নামটাও ওর আসল কিনা তাও জ্যোৎস্না জানেনা!

ফোন এলেও ফোন ধরার পথ খোলা থাকল না।

প্রথমে অসহ্য মনে হলেও পরে সেটাও সয়ে গেল।

স্মৃতির পাতায় মানস তখন ফিকে নীল।

একদিন জ্যোৎস্না, উর্মিলা ও বেলা তিন বন্ধুতে মিলে গঙ্গার ঘাটের সিঁড়িতে বসে খুব গল্প জমিয়েছে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করে খেলছে, যাত্রীরা নৌকা থামিয়ে পারাপার হচ্ছেন। ভারি চমৎকার লাগে বিকালের এই গঙ্গার ঘাটের দৃশ্যটা ওদের! একটু মন দিয়ে শুনলে কত লোকের সুখ দুঃখের কত কথাই না কানে আসে! আবার কেউ কেউ একা একা এসেও চুপচাপ করে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেন মুগ্ধ হয়ে। অমন ওখানে এলে রোজই দেখা যায়।

সেদিন এমনি একজনকে দেখা গেল বহুক্ষণ ধরে দূরে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নাদের দলটির দিকে চেয়ে আছে। এ ঘটনা নতুন নয়, তবুও ওদের মধ্যে ঐ নিয়েই হাসি ঠাট্টা চলেছে জোর, বেলা বললে 'ভাই ভদ্রলোকটি দেখতে কিন্তু ভারি চমৎকার!' জ্যোৎস্না বললো ওর সঙ্গে তাহলে ঘটকালিটা সেরে ফেলি তোর কি বল! বেলা বললে, 'হায় বন্ধু তা হবার নয়! দেখনা সেই থেকে পলক—

দেখনা।' বলে ঐদিকে আঙুল দেখাতেই জ্যোৎস্না রেগে গিয়ে 'বেরও মুখপুড়ি দুর হ' বলে তাড়া করতেই বেলা উঠে,'বেশ-তাই যাচ্ছি' বলে সত্যি সত্যিই হাঁটতে শুরু করে দিল। বেগতিক দেখে জ্যোৎস্নাই বলে উঠলো 'এই শোন, শুনে যা বলছি এই...ই।'

এদিকে চক্ষের পলকে সেই ভদ্রলোকটি নেমে এলেন জ্যোৎস্নার গা ঘেঁসে, 'আমাকে ডাকছো ?'

জ্যোৎস্না ভয় পেয়ে বলে উঠলো 'না না আপনাকে ডাকবো কেন ? আমি বেলাকে ডাকছিলাম।'

'না না তা হতেই পারেনা, তুমি আমাকেই ডাকছিলে, আমাকে যে তোমায় ডাকতেই হবে।' বলে ভদ্রলোক জ্যোৎস্নার পাশটিতে বসে পড়েন।

কে আপনি ? কি চান ? আচ্ছা মানুষ তো ? বন্ধুদের কাছে অপ্রস্তুত হয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন জ্যোৎস্না করে বসল।

আমি মানস। আমায় চিনতে পারছ না মালা ? ভালো করে দেখো ? আমি তোমার সেই মানস।

জ্যোৎস্না কোন কথা বলতে পারল না, ঠোঁট দুটো কিছু বলার জন্য একবার শুধু কাঁপল।

'তা আমাকে না চেনারই কথা। কখনো তো দেখোনি। কতোদিন তোমাকে ধরবো বলে খুঁজেছি কিন্তু দেখা পাইনি। কথা বলার সময় মানুষটার চোখে মুখে এক আনন্দের শিহরণ জেগে উঠেছিল।

'দেখুন আপনাকে আমি সত্যিই চিনিনা, জানিনা। আমাদের এটা ভদ্র পাড়া, আপনি বাড়ী ফিরে যান।'

'মালা, বাড়ী ফিরবো বলে তো আসিনি। আমি যে তোমাকে নিতেই এসেছি। তুমি কি সত্যিই আমাকে চিনতে পারছো না ?

জ্যোৎস্না, রাগ করতে গিয়েও করতে পারল না। মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন যেন করুণা হলো। ফের বলছি আপনাকে আমি চিনিনা, জানিনা, আর আমার নাম মালা নয়।

'তাহলে আমি যাকে খুঁজছি সে তুমি নও ? আমার মালা। আমার সে

হঠাৎ ওদের সামনে সবুজ রঙের একটি মটর গাড়ি এসে থামল। গাড়ী হতে নামলেন ধুতি পাঞ্জাবী পরা এক ভদ্রলোক।

'যা ভেবেছি তাই, বাড়ী থেকে ছাড় পেয়ে এদিকটাতেই চলে এসেছে। আমার পাগল ভাইটা নিশ্চয় আপনাকে জ্বালাতন করেছে, ও পাগল। দোষ নেবেন না; আমাদের ক্ষমা কোরবেন।'

এবার ভাইকে বোললেন, 'মানস গাড়ীতে উঠে চল।'

বেলা জ্যোৎস্নার পাশেই এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ভাই কিভাবে পাগল হলো?'

আমার ভাই য়ুনিভার্সিটির নামকরা ছাত্র। আগে ও এমন ছিলনা, অথচ হঠাৎ যে কি করে এমন অবস্থা হলো তা আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। আচ্ছা নমস্কার।

মানস সেনের দাদা প্রশান্ত সেন ভাইকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে গেল।

লেখা তাকালো জ্যোৎস্নার দিকে। জ্যোৎস্না, লোকটা মনে হয় তোর জন্যেই।'

জ্যোৎস্না শাড়ীর আঁচলটা তুলে নিয়ে চোখের উপর রাখল।

'এই কি হলো তোর!'

'কৈ কিছু নাতো? কথা কটি বলার সময় জ্যোৎস্নার গলা কেঁপে উঠল।'

——

কৃষ্ণা-সমাচার

জয়ন্ত চক্রবর্তী

ঠিকানাটা দেশেই পেয়েছিল সঞ্জয়। শুনেছিল কলেজের একদম পাশে। ভবানীপুরের কলেজে আই. এস্-সি.-তে ভর্তি হয়েছে সে। তখনও হাফপ্যাণ্ট পরে। দু একদিন কলেজে ক্লাশ করে লজ্জায় ফুলপ্যাণ্ট পরতে শুরু করে। ল্যাবরেটরীর পার্টনার স্থনীল সাণ্যালকে সে একদিন বলেছিল "তোর তো এ পাড়াতেই বাড়ি। আমার দিদির বাড়ির ঠিকানাটা দেখিয়ে দিস্ তো।" দিনটা স্পষ্ট মনে আছে। শুক্রবার। প্রথম দুটো ক্লাশের পর তিনটে ক্লাশ অফ্। তারপর সেই বিকেলে ভূগোলের ক্লাশ। সেই সময়ের ফাঁকে স্থনীলের সঙ্গে গিয়েছিল সঞ্জয়। দূর থেকে এক বিরাট মহল দেখিয়ে স্থনীল কেটে পড়ল। গ্রামের ছেলে সঞ্জয়, অপার বিস্ময় নিয়ে বাড়িতে ঢোকে। বাড়ী না বলে প্রাসাদ বলাই ভাল। গেটে মিলিয়ে নেয়—৺মোহনলাল চক্রবর্তী, উকিল। ঠিক মিলে গেছে। বাড়িতে ঢুকে কা'কে কি জিজ্ঞাসা করবে ভেবে পায়না। এমন সময় এক বিশাল দেহ দারোয়ান তাকে দেখে তেড়ে এল। কিন্তু কি আশ্চর্য। মায়াদির নামটা বলতেই সে সংকুচিত হযে পরম সমাদরে ভেতরে নিয়ে গেল। ঘরের ভেতরে তখন দিদি মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আরও দুটি মেয়ে সঙ্গে বসে। সঞ্জয যথেষ্ট লজ্জা বোধ করে দিদির আন্তরিক আহ্বান সত্ত্বেও। তারপর দিদি উঠে এসে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যায়। চেয়ারে বসিয়ে, মেযে দুটোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয। পরে বলে "ভর্তি তো অনেকদিন হয়েছ, এতদিন আসনি কেন?"

সেই শুরু। ঠিক শুরু বললে ভুল হবে, যাতায়াত শুরু হল আর কি? ক্রমে দিদির সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনেছে। কিন্তু এ গল্প দিদিকে নিয়ে নয়, দিদির সঙ্গে বসে থাকা সেই মেয়ে দুটিকে নিয়ে। কৃষ্ণা আর তৃষ্ণা। প্রথমে কৃষ্ণার কথাই বলি। কেননা সেই মুখ্য। প্রথম পরিচয়ের বেড়াজাল কেটে

দাঁড়িয়েছে। তাই কালো হলেও স্বাস্থ্য আর প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা এই মেয়েটাকে ভালই লাগত সঞ্জয়ের। মেয়েটা তখন স্কুলে হায়ার সেকেণ্ডারী ক্লাসে পড়ত। ইতিমধ্যে কৃষ্ণা সঞ্জয়কে নিয়ে তার মা'র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। গাড়ি ফোন, মূল্যবান আসবাব পত্রের প্রাচুর্য দেখে নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলে সঞ্জয় একদিকে অবাক অন্যদিকে বোধ করি আহত হয়। কৃষ্ণা কিন্তু সঞ্জয়কে নিয়ে নিঃসংকোচে তার ঘরের প্রতিটা অংশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সঞ্জয়ের সঙ্গে কৃষ্ণার ঘনিষ্ঠতা বেশ জমে ওঠে। টুকিটাকি কত ঘটনা সঞ্জয়ের। মনে পড়ে। কৃষ্ণার সেই আপনি ছেড়ে তুমিতে নামানোর কি প্রাণপণ প্রয়াস। রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে শোনায় কৃষ্ণা। ভারি সুন্দর গলা। বলতে গেলে রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয় সে কৃষ্ণারই অনুপ্রেরণায়।

হঠাৎ আঘাত এল ইণ্টারমিডিয়েটের রেজাল্টে। কোনরকমে পাশ। সেই সরল ছেলে এখন বুঝতে পারল পরীক্ষায় ভাল করে পাশ করার গুরুত্ব। নিজের কলেজে ঠাঁই হল না বি. এস. সি. পড়ার। অথচ কলেজের একজন উচ্চপদস্থ তাকে কথা দিয়েছিল ভর্তি করা সম্বন্ধে। যাই হোক ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত এসে ঠেকে ছিল নারকেল ডাঙ্গার গুরুদাস কলেজে। এই কলেজের পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সঞ্জয়। অধ্যাপকদের কী আন্তরিকতা। সামনেই সুন্দর পার্ক। ওই পার্কে অফ্ পিরীয়ডে আসত কৃষ্ণা। কলেজটা কো-এডুকেশনের। কাজেই কৃষ্ণার সাথে কলেজ চত্বরে ঢুকতেও অসুবিধে হ'ত না। সে এক সুন্দর জীবন।

সঞ্জয়ের হঠাৎ জেদ চেপে গেল ভালো রেজাল্ট করার। কৃষ্ণার সঙ্গে যোগাযোগ কিছু কমিয়ে তাই পড়াশোনায় মনোনিবেশ করেছিল। কৃষ্ণা বেশ অভিমানী। সে এরপর থেকে সঞ্জয়ের কাছে যাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়ে ছিল। পড়াশোনার চাপে সঞ্জয় প্রথমটা অত খেয়াল করেনি। সাধারণ পাশ কোর্সে ভর্তি হয়েছিল, তাই রেজাল্ট করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। খেয়াল হলো পরে। কলেজ থেকে ফিরে সঞ্জয় হঠাৎ একটা চিঠি পেল। না, কৃষ্ণার নয় তৃষ্ণার। সকলের অলক্ষ্যে তৃষ্ণাও কখন বড় হয়ে গেছে। কেউ খেয়াল করেনি। চিঠি পেয়ে সেটা বুঝতে পারে সঞ্জয়। আকুল আহ্বানের

চিঠি। কিন্তু সে কি করে হয়! ভাই কলেজ ফেরতা একদিন সোজা ভবানী-পুরের বাড়ি গিয়ে তৃষ্ণাকে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে শেষকালে উপদেশ দেয়। মেয়েটা কোন কথা বলে না। দুচোখ ভরা জল নিয়ে উঠে যায়। তাকে নিয়ে প্রেমের ত্রিভুজ সৃষ্টি হতে দেখে সঞ্জয় সচেতন হয়ে যায়। ফলে কৃষ্ণার সঙ্গে যোগাযোগ আরও কমে যায়।

এর পরের ইতিহাস, সঞ্জয়ের সাফল্যের ইতিহাস। বি. এস সি. খুব ভাল ভাবে পাশ করে। দুর্গাপুরে একটা ভাল চাকরিও পেয়ে যায়। দুর্গাপুরে গিয়ে সঞ্জয় একটু গুছিয়ে বসবার চেষ্টা করে। এমন সময় হঠাৎ শুভ বিবাহের চিঠি আসে। কৃষ্ণা নিজে পাঠিয়েছে। তার বিয়েতে সঞ্জয়কে যাবার জন্যে বারবার অনুরোধ করেছে। পরিশেষে তার বোন তৃষ্ণার ভালবাসার কথা জানিয়ে সঞ্জয়কে অনুরোধ করেছে তৃষ্ণার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। মনে মনে হাসে সঞ্জয়। সে যে আর সম্ভব নয়, একথা সঞ্জয় ছাড়া আর কে বুঝবে!

দিন কিন্তু কেটে যায়। এ দুনিয়ায় কেউ কারো জন্যে অপেক্ষা করে না। প্রায় তিন-চার বছর কেটে গেছে। কৃষ্ণাদের সঙ্গে খবরাখবর প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। কৃষ্ণাদের বিয়েতেও যায়নি। হঠাৎ মায়াদির কাছ থেকে চিঠি পেল সঞ্জয়। অল্প কয়েকটি কথা। "যদি কৃষ্ণাকে শেষ দেখা দেখতে চাও তবে আগামী রবিবারের মধ্যে এসো। ঐদিন আমি ওদের নাকতলার বাড়িতে কৃষ্ণাকে দেখতে যাবো। আশা করি কুশলে আছো। ইতি—মায়াদি।" শেষ দেখা! চমকে ওঠে সঞ্জয়। সেদিন ছিল শনিবার। রাতের গাড়িতে কলকাতা যাত্রা করে। ভোরে হাওড়া পৌঁছে দিদির কাছে ছুটে যায়। ভবানীপুরে গিয়ে দিদিকে খুবই বিষণ্ণ দেখে। দিদি বলে—"এসেছিস্‌, ভাল হল। মেয়েটা মরবার আগে তোর কথা কয়েকবার বলেছে।" কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরী হয়ে দুজনে ছোটে নাকতলার বাগানবাড়িতে। তার আগে ঘটনাটা শুনে নেয় সঞ্জয়। কৃষ্ণার মারাত্মক ক্যানসার। লিভারে অ্যাটাক। প্রথম যখন ধরা পড়ল তখনই সিরিয়স ষ্টেজ। এমনিতে মেয়েটা সদা হাসিখুশী শ্বশুরবাড়িতে। বরও ভারী সুন্দর। দিদিকে দেখলো জামাইএর খুব প্রশংসা করতে। সেই মেয়ে আজ মুমূর্ষু। লিভারের কিছু অংশ বাইরে এনে পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হয়েছে কলকাতার সেরা ডাক্তার। মারাত্মক ক্যান্সার। শেষ চেষ্টা হিসেবে একবার অপারেশন করে দেখা যেতে পারে। দিদির সঙ্গে রুগীর ঘরে যায়।

বিছানায় শুয়ে কৃষ্ণা। তার মাথার কাছে মর্মর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে তৃষ্ণা। তখন কৃষ্ণার জ্ঞান ছিল। সঞ্জয়কে দেখে চিনতে পেরে মৃদু হাসে কৃষ্ণা। সঞ্জয়ের হাতদুটো ধরে মৃদু কণ্ঠে বলল—"আমার যদি কোন দোষ থাকে ক্ষমা কোরো। কিন্তু এই নির্দোষ মেয়ে তৃষ্ণাকে দেখো।" তারপর দিদির দিকে হাত বাড়ালো। দিদি তখন অঝোরধারে কাঁদছে। তৃষ্ণাও তাই। দিদির সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কৃষ্ণা যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল। পেটের ওপর ডান হাত রেখে কুঁকড়ে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। সঞ্জয়কে দেখে তৃষ্ণা বলল—"আপনারা এখন এঘর থেকে যান। এই শুরু হল, আপনারা সহ্য করতে পারবেন না।" তবু কি যাওয়া যায়। চোখের সামনে দেখতে লাগল যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে কৃষ্ণা ক্রমে অজ্ঞান হয়ে গেল। তখনও একটা হাত তার দিকে বাড়িয়ে আছে।

বিধবা

আরণ্যক

চারিদিকে ফুলের সমারোহ, আনন্দের বন্যা—ভ্রমর, প্রজাপতি ভীড় করে আসছে। মরশুমী ফুলের ওপর বসছে তারা।

যা যা—তোদের কে আসতে বলেছে? দুদিন পরে তোরা তো কেউ থাকবি না, আসবি না বাগানে! হাসি ও বিদ্রুপের সুর মেশান কথাগুলো মনীষার কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়লো।

কার সংগে কথা বলছো দিদিমণি? কাবেরী দাসী না বলে পারলো না। মনীষার একক জীবনে কাবেরীই বলতে গেলে সব। বাড়ীর রান্না আর বাগানের ফুল গাছগুলোর পরিচর্যা করলেই তার কাজ শেষ হয়ে যায় না, দিদিমণির সংগে গল্প করতে হয় মাঝে মাঝে, আনন্দ দিতে হাসতেও হয় তাকে।

মনীষা চিরকাল নিঃসঙ্গ ছিলোনা। তার বাবা ময়ূরাক্ষী বিশ্বাস ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তার হলেও তিনি ছিলেন সুরসিক। মেয়ের সংগে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। বছরখানেক হলো তিনি পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন। আর তারপর থেকেই মনীষা একা—সম্পূর্ণ একা।

কাবেরী চুপ করে থাকতে পারলো না। রসিকতা করে বললো—একটা মনের মত মানুষকে ঘরে আনো—তাহলে দেখতে হবে না।

তার মানে ?

মানে বিয়ে করো, তাহলে তোমাকে ছেড়ে ওদের মতো চলে যাবেনা।

বিয়ে ? পুরুষ মানুষকে ?

কেন গো! তুমি কি মেয়ে মানুষকে বিয়ে করতে চাও নাকি ?

যাঃ, ফাজলামী করতে হবে না। মনীষা কাবেরীর দিকে পেছন ফিরে বসলো। অগত্যা কাবেরীকে চলে যেতে হলো বাড়ীর মধ্যে। যাবার আগে কাবেরী বললো—বেলা পড়ে এলো, চলো, ভেতরে গিয়ে বসা যাক।

তুই যা, আমি পরে যাচ্ছি।

শীত পড়েছে। অন্যান্য বছরের থেকে হয়তো কিছু বেশী। গিরিডি নামটা শুনতে ভালো লাগলেও শীতের সময় হাড়ে কাঁপুনি লাগিয়ে দেয়। কলকাতায় এর চেয়ে শীত অনেক কম। মনীষার মনে পড়ে কয়েক বছর আগে কলকাতায় থাকার দিনগুলোর কথা। মনীষা তাকিয়ে ছিলো রাস্তার দিকে। বেশ কিছু ভীড় জমেছে রাস্তায়। কি ব্যাপার! কৌতুহলী হয়ে মনীষা একটু এগিয়ে গেলো। একটি প্রাইভেট গাড়ীর সংগে রিক্সার এ্যাক্সিডেণ্ট। ক্রমশঃ ভীড়টা পাতলা হয়ে আসছে, রিক্সার যাত্রী দুজন তেমন একটা জখম হয়নি। প্রায় সকলেই চলে গেলো। নাঃ, শীত পড়েছে, এবার ফেরা যাক—মনে মনে ভাবল। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে মনীষার মনে হলো বড় রাস্তার ওপর একটি লোক তাদের বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটিকে বারবার বাড়ীটির দিকে তাকাতে দেখে সে ভাবলো—মানুষটি কি তাদের জানা শোনা কেউ ? হয়তো, পথ চলতি মানুষ এমনিই তাকিয়ে দেখছে বাড়ীটা। তাদের বাড়ীটা নেহাৎ হেলাফেলার নয়। পাশ দিয়ে চলতে গেলে তাকিয়ে দেখার লোভ হবে। মানুষ তো সুন্দরের পূজারী, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু ভাল তাকেই তো মানুষ তাকিয়ে দেখে। সাগরও কি তাই তাকে দেখতে চেয়েছিল!

সাগর নামটা মনে পড়তেই বিরক্ত হলো। আর কি আশ্চর্য! লোকটাকে সাগরের মতোই মনে হচ্ছে না? ভালো দেখা যাচ্ছে না, অন্ধকার নেমে এসেছে। অত ভেবেই বা লাভ কি আজ। সে সাগরকে চেনেনা, জানেনা, তাছাড়া কলকাতার সাগর এখানে আসতে যাবেই বা কোন দুঃখে?

মনীষা ঘরে ফিরে আসে। রেডিওর চাবিটা ঘুরিয়ে দিয়ে বিছানার ওপর বসে। কিছু পরেই কাবেরী ঘরে ঢোকে ব্যস্ত হয়ে। কি হলো? বিস্মিত হয় মনীষা। কিছু বলবি?

তোমার সংগে একটা লোক দেখা করতে চাইচে। ভেতরে আনবো?

আমার সংগে! বিস্ময় বাড়ে মনীষার। নাম জিজ্ঞেস করেছিস?

তা আর না করেছি? নাম বললে—সাগর।

সাগর!

হ্যাঁ, সাগরই তো বললো গো! নদী নয়, সাগর, হেসে ওঠে কাবেরী।

সাগর! মনীষার মনে হলো সে ভুল শুনেছে। এতো দিন পর সে আবার তার সংগে দেখা করতে এসেছে? ধাপ্পাবাজ লোকটার কি লজ্জাসরমের বালাই নেই? নিশ্চয়ই নেই। থাকলে এতোখানি আসার সাহস হতো না। তার মনের পটে ভেসে ওঠে অতীতের কয়েকটা দিন।

তখন সে কলকাতায়। কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী। সাগরের সঙ্গে তার পরিচয়টা শুধু চোখের ব্যাপার নয়, মনের ব্যাপারও। আঠারোই জ্যৈষ্ঠ তার জন্মদিন ছিলো। কিন্তু ছিলোনা আনন্দ উৎসব। তার জন্মদিন পালন করতো সে নিজেই। নিমন্ত্রণ করতো না কাউকে। কাউকে কিছু না জানালেও সাগরকে আসতে বলেছিলো। কিন্তু, তাকেও জানায় নি জন্মদিনের কথাটা। ঘরে ঢুকেই সাগর খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলো। মনীষা এমনিতেই একটু সাজগোজ করতে ভালোবাসে, কিন্তু সেদিন ছিলো বেশী। সবচেয়ে প্রথম চোখে পড়ে খোঁপায় টকটকে লাল গোলাপ গুচ্ছ।

কি ব্যাপার, আজ যে তোমায় ভীষণ খুশি খুশি লাগছে?

আমার জন্মদিনে কি দেবে আগে বলো, তারপর জানাবো আনন্দের কারণ।

তোমার জন্মদিন? কবে?

যদি বলি আজ—

সত্যি ? তুমি আগে জানালেনাকেন বলতো ?

জানালে কি করতে ?

তোমার জন্যে খুব ভালো একটা উপহার নিয়ে আসতাম।

সাগর, তোমায় যে পেয়েছি, এটাই তো আমার শ্রেষ্ঠ উপহার। এর চেয়ে বড় আর কিছুতেই প্রয়োজন নেই। বলো কথা দাও তুমি আমার হবে ?

মনীষা, তোমাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। তোমাকে অদেয় তো কিছু নেই। তোমায়—তোমায় আমি পুরোপুরিই পেয়েছি।

তাহলে কথা দিলে তো ? মনীষা আবেগে সাগরের হাত টেনে ধরেছিলো, ওঃ সাগর তুমি বাঁচালে। কদিন ধরেই ভাবছি তোমার শেষ কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলাম।

মনীষা জানতো না সে বালির প্রাসাদ গড়েছে। তার সব আশা সব স্বপ্নই ভেঙ্গে গেলো—যখন সাগর বললো—আমায় ক্ষমা করো মনীষা। হয়তো তোমায় হারাবো, তবু ঠকাতে চাইনা। আমি বিবাহিত। আমার স্ত্রী বর্তমান। আমায় তুমি ভুল বুঝো না মনীষা। স্ত্রী থাকলেও মন প্রাণ দিয়ে তোমাকেই ভালোবাসি।

ঠকাতে চাইনা! কি সুন্দর কথা। তবে—তবে আগে বলোনি কেন ? মধুপান করে উড়ে যাওয়ার অসুবিধে হতো, তাই না ?

না ক্ষমা নয়। মনীষা ক্ষমা করতে পারতো না। ক্ষমা সে করেনি। সাগরকে চলে যেতে হয়েছিলো চিরদিনের জন্যে। তারপরেও অনুনয় বিনয় করে সাগর চার পাঁচটি চিঠি লিখেছিলো, মনীষা তার একটিরও জবাব দেয়নি। সেই সাগরই আজ এসেছে তার সংগে দেখা করতে! আশ্চর্য!

কি বলব দিদিমণি ?

বলে দে—মনীষা বলে এখানে কেউ থাকেনা।

এতো বড় মিথ্যে কথাটা বলবো ?

তর্ক করিসনি যা বলছি তাই বল গিয়ে।

অল্প পরে কাবেরী ঘুরে আসতে মনীষা জিজ্ঞেস করে—কিরে, চলে গেছে তো ?

কি জানি, আমি তো বলে এলাম এখানে মনীষা বলে কেউ থাকেনা। দরজাও বন্ধ করে এসেছি। বাবুটি কে গো দিদিমণি ? তুমি চেনো নাকি ?

হয়তো চিনতাম এক কালে, আজ আর চিনিনা, চিনতে চাই না।

আহা কথার কি ছিরি গো! ঘর ছেড়ে চলে যায়।

আপন মনেই স্মৃতি রোমন্থন করে চলেছে মনীষা। সে তন্ময়তা কেটে যায় কাবেরীর তাগাদায়। খেতে ডাকছে। খাওয়ার ইচ্ছে নেই, তবু উঠতে হয়! টেবিলে বসে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করে—কিন্তু মুখে তুলতে পারেনা। একি সাগরের চিন্তা তাকে পেয়ে বসলো! সে কি এখনো সাগরকে ভালোবাসে? হয়তো বাসে, তাই দেখা করলো না। ভালোবাসার একটা অভিমান আছে।

কি হলো গো তোমার? একগালও যে মুখে তুললে না!

মৃদু হাসে মনীষা। ভালো লাগছে না। হ্যাঁ, ওকে কি খুব রোগা মনে হলো?

তাই তো দেখলুম!

রোগা হয়ে গেছে সাগর। মনীষা ভাবে। কি স্বাস্থ্য ছিলো, আর কি স্বাস্থ্যই হয়েছে!

শীত বিদায় নিয়েছে। মরশুমি গাছগুলোও হারিয়ে গেছে বাগান থেকে। সেদিকে তাকিয়ে ভাবছিলো মনীষা—বাগানটা এখন আমার মতোই নিঃস্ব। আমার মতোই রুক্ষ কঠিন—

পিওনের ডাকে চমকে ওঠে মনীষা। কি চাই!

পার্শ্বেল।

পার্শ্বেল আমার নামে? আমি তো কাউকে—চিন্তিত মনে মোড়কটি খোলে। একটি বই। রাতের তারা। প্রকাশনী থেকেই তার ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। সাগরের লেখা। পাতা উল্টে দেখে—তার নামে উৎসর্গ করে লেখা—মনীষা, জানিনা তুমি কেমন আছো, তবু তোমাকেই—

মনে হলো—বেহালার চড়া সুরে কে যেন কেঁদে উঠলো।

দিন দুই পরে বিশেষ কাজে কলকাতায় যাওয়ার প্রয়োজন হলো মনীষার। বহুদিন পর ছেড়ে যাওয়ার শহরের বুকে পা রাখলো আবার। কতো হাসি আর আনন্দের সাক্ষী হয়ে রয়েছে এই রাজপথ, কতো ছায়া পড়েছে বিয়োগ ব্যথার। সাগর—হ্যাঁ, সাগরের কথাও এরা জানে! এদের বুকে কান পেতে

শুনলে হয়তো বলে দেবে সাগরের ঠিকানা। কিন্তু পথ কথা বলে না। তাহলে কে বলবে তার ঠিকানা? হ্যাঁ—পাওয়া যাবে। প্রকাশনীর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে।

গেলো, কিন্তু ব্যর্থ হলো সে। সাগর নেই বাড়ীতে।

কখন আসবে বলতে পারেন?

বৃদ্ধটি ঘাড় নাড়ে। কি দরকার বলুন? কোথা থেকে আসছেন?

আমি মানে—ঢোঁক গেলে মনীষা। আমি গিরিডি থেকে আসছি। ওঁর একটি বইয়ের জন্যে অভিনন্দন জানাতে এসেছি।

বাবু নিরুদ্দেশ। অনেকদিন বাড়ী আসেনি।

নিরুদ্দেশ! না না—সাগর নিরুদ্দেশ হবে কেন? প্রতিশোধ নিলো আমার ওপর।

আচ্ছা, ওর স্ত্রীর সংগে একটু দেখা করে আসবো?

বৃদ্ধের চোখে জল আসে। তিনিও নেই।

নেই? কোথায় গেছেন।

বাবুর সংগে ঝগড়া করে অনেকদিন আগেই চলে গেছেন বাপের কাছে।

ঝগড়া করে চলে গেছে?

হ্যাঁ, একেবারে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে কি যেন ভাবে মনীষা। তার পর বলে—ওঁর পড়ার ঘরটা আমায় একটু দেখাবেন?

উদাসীন দৃষ্টি মেলে বৃদ্ধটি বলে চলুন—বাড়ীতে আমি একা। এই মাটি আঁকড়ে পড়ে আছি—যদি বাবু ফিরে আসে কোনদিন—এই আশায়।

সাগরের বড় একটা ছবি। হাসি মুখে তাকিয়ে। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মনীষা। পেছনে উদাসীন বৃদ্ধ। কি দেখলেন?

মনীষা চোখ ঘোরায়। আলমারীতে অসংখ্য বই। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে সে মোটা একখানা খাতা দেখে। কৌতুহলী হয়ে পাতা উল্টোয়। প্রথম পাতাতেই কয়েক ছত্র লেখা—বাকি সব সাদা। লেখার আর প্রয়োজন হয়নি সাগরের। খাতাটি তুলে ধরে চোখের সামনে—"জানি, তুমি একদিন এখানে আসবে। তাই তোমার উদ্দেশ্যেই লিখে যাচ্ছি। তোমায় আমি সত্যিই ভালো বেসেছি। তার মধ্যে কোন

প্রতারণা ছিলোনা। অথচ, আমার জন্যেই তোমার জীবনটা ব্যর্থ হলো। আজও তুমি একাকী। পৃথিবীর কাছ থেকে চেয়েছি অনেক, কিন্তু কিছুই পাইনি। তাই, পৃথিবী ছেড়েই চলে যাচ্ছি।

একি করলে সাগর। এই যদি তোমার মনের কথা তবে কেন জোর করে অধিকার করলে না আমায়। কেন বললেনা—তুমি আমার—শুধু আমার? উদ্‌ভ্রান্তের মতোই বৃক্ষের পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসে মনীষা।

কথা বলতে গিয়ে থমকে যায় কাবেরী। তোমার এ কি বেশ গো?

কেন মৃদুহাসে মনীষা।

এই সাদা শাড়ী জীবনেও তো পরতে দেখিনি।

এবার থেকে দেখবি।

কেন? কলকাতায় কি রঙীন শাড়ী ছিলোনা দিদিমণি? এখনো বিয়ে-থা হয়নি—ছিঃ ছিঃ—

ওকথা বলিস নি কাবেরী, আমায় আর রঙীন শাড়ী পরতে নেই।

তার মানে! একথা বলছো কেন?

সাদা থানটার দিকে তাকিয়ে মনীষা আস্তে আস্তে বলে—আমি যে বিধবা।

———

সমীকরণ

শোভেন বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ টান দিয়ে সিগারেটটা এ্যাসট্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন নিরঞ্জন দাসগুপ্ত। আগুন নেভার ছোট্ট একটা শব্দ উঠলো দীর্ঘশ্বাসের মতো, সেই সংগে খানিকটা ধোঁয়াও। সেদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—কথাটা ভালো করে ভেবে দেখো সনৎ। ইমোশনের মাথায় দুম করে কিছু করে ফেলোনা। ইউনিয়নের সেক্রেটারীর পক্ষে সেটা শোভা পায় না।

ভালো করে ভেবেই ঠিক করেছি নিরঞ্জনদা।

কেন! তোমার অসুবিধেটা কি? আমি প্রেসিডেণ্ট হলেও সব প্ল্যান এ্যাণ্ড প্রোগ্রাম তো তোমারই! ফুল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স নিয়ে কাজ করেছো। তাহলে কমপ্লেনটা কার বিরুদ্ধে—যে জন্যে তুমি রেজিগনেশন দিতে চাইছো? কলিগ সম্পর্কে কি—

কলিগদের সহযোগিতা পেয়েছি বরাবর। ওদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই!

অভিযোগ কি তবে আমার বিরুদ্ধে? কিন্তু আমি তো কোন opposition part নিইনি সনৎ! বরাবরই তোমায় সাপোর্ট করেছি।

অস্বীকার করছিনা। শুধু সমর্থন নয় অনেক উপদেশও পেয়েছি আপনার। সেগুলোর মূল্যও আমার কাছে কম নয়!

তাহলে কেন! কেন সরে যেতে চাইছো? কার বিরুদ্ধে অভিযোগ?

নিজের বিরুদ্ধে। সন্দেহ আমার যোগ্যতার বিরুদ্ধে।

How absurd! কি বলছো সনৎ! বিস্ময়ের ধাক্কায় সোজা হয়ে বসেন। যোগ্যতার বিরুদ্ধে! I mean efficiency নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে? তাও তোমারই মনে!

হ্যাঁ নিরঞ্জনদা। সেই কথা বলবো বলেই মিটিং ডেকেছি। চলুন, আর দেরী করে লাভ নেই। এতোক্ষণে সকলে বোধহয় এসে গেছে।

না না, আগে তুমি মনস্থির করো। একি পাগলামী করছো? Management-এর সংগে আমাদের এতোগুলো grievance নিয়ে লড়াই, তুমি সরে দাঁড়ালে কে proceed করবে?

কেন, আপনি! একটু হাসে সনৎ। আপনি স্বচ্ছন্দে ম্যানেজ করতে পারবেন। গোপেনকে সেক্রেটারী করুন। ও বুদ্ধিমান ছেলে। আপনি পেছনে থাকলে ও ঠিক ফাইট করে যাবে।

আরে দূর, গোপেন-টোপেন দিয়ে কাজ হয় না। আর আমি? আমি কি করবো? তোমার procedure আর আমার! সে কি এক হলো?

আমি helpless নিরঞ্জনদা।

সনৎ don't be adament, ভুলে যেওনা এতোগুলো লোকের ভালোমন্দ তোমার ওপর নির্ভর করছে। Management-এর একটা weakness আছে তোমার ওপর, তাছাড়া ভয়ও করে। তোমার, জায়গায় গোপেনকে দেখলে তারা গ্রাহ্য করবে? মুখের তোড়ে ভাসিয়ে দেবেনা? তাঁর গলায় আকুতি। সমস্ত অন্তর থেকেই যেন একটা অনুরোধের সুর ফুটে বেরয়।

কিছুক্ষন চুপ করে বসে থেকে সনৎ বেশ দৃঢ় স্বরে বলে—নিরুপায়, সত্যিই আমি নিরুপায় নিরঞ্জনদা। আমায় ক্ষমা করুন। নিজের সংগে অনেক লড়াই করার পর এই decision নিয়েছি। কথাটা শেষ করে দাঁড়িয়ে ওঠে সে। এবার চলুন, ওরা অপেক্ষা করছে।

নিরঞ্জনও উঠে দাঁড়ান। দুপা এগিয়ে আবার থেমে যান। সমস্ত শরীরটা তাঁর ঋজু হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টিও তীক্ষ্ণ। মুখে এক বিচিত্র হাসি নিয়ে তুরুপের শেষ তাসখানি ছুঁড়ে দেন সনতের দিকে। এরপর সকলে তোমায় সন্দেহ করবে সনৎ। আঙুল দেখিয়ে বলবে—You are purchased by the management, তার উত্তরে কি বলবে?

কিছুই না। মৃদু হাসে সনৎ। এই কথাই তো তাদের কাছে আশা করা উচিত নিরঞ্জনদা! এতোদিন ধরে যাদের মধ্যে শুধু বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছি, ভালোবাসার বদলে ঘৃণা করতে শিখিয়েছি, আজ তাদের কাছ থেকে

সরে এলে ঘৃণা পাওয়াই স্বাভাবিক, ভালোবাসা নয়। সেটা আশা করাই ভুল।

*   *   *

ক্যান্টিন ঘরের আবহাওয়াটা বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। থমথম করছে সবার মুখ। শুরুর সংগে সংগেই আলোচনা থেমে গেছে সকলের প্রতিবাদে। প্রসংগ শুধু একটি। ইউনিয়নের সেক্রেটারী সনৎ চৌধুরী স্বইচ্ছায় রেজিগনেশান দিচ্ছে। নিজের অযোগ্যতা-এটাই নাকি একমাত্র কারণ। আর কিছু বলেনি।

ঘরের জমাট নিস্তব্ধতা ভাঙে গোপেন মল্লিক। তোমার যোগ্যতা নিয়ে ইউনিয়নের কেউ প্রশ্ন তোলেনি, বরং সবচেয়ে efficient leader বলে মেনে এসেছে। তাহলে তোমারই বা হঠাৎ কেন মনে হচ্ছে একথা? আজ সামান্য একটা কারণ দেখিয়ে সরে দাঁড়ালে-এতোগুলো লোকের সংগে বঞ্চনাই করা হবে সনৎ। সেটা তোমার কাম্য নয় নিশ্চয়ই?

চায়ের কাপটিতে শেষ চুমুক দিয়ে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখে সনৎ। পকেট থেকে রুমাল বের করে বিন্দু বিন্দু ঘামগুলো সযত্নে মোছে কপাল থেকে। চিন্তায় মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। সকলেরই সপ্রশ্ন দৃষ্টি তার ওপর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তারা দেখার চেষ্টা করছে মনের ভেতরটা। কিন্তু সনতের মনের জমাট কালো অন্ধকারে পথ হারিয়ে সে দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে। গোপেনের কথার জের টেনে সুধীর কর্মকার বলে—যে বঞ্চনাকে তুমি ঘৃণা করো সনৎদা, যার বিরুদ্ধে লড়ে এসেছো চিরদিন—আজ সেই বঞ্চনাই করবে আমাদের সংগে?

টেবিলের ওপর সনতের রেজিগনেশান লেটারখানা পড়ে রয়েছে। একপাশে একটা বই চাপা দেওয়া, যাতে উড়ে না যায়। তবু, পাখার হাওয়ায় তার একটা কোন থির থির করে কাঁপে। সেদিকে তাকিয়ে সনৎ বলে—বঞ্চনা সকলের সংগেই করা যায় সুধীর, যায়না শুধু নিজের সংগে। তার জ্বালা অনেক। তবু, কলিগ্‌দের জন্যে সে চেষ্টাও করেছি। কিন্তু আর পারছিনা। আমার আত্মা কেবলই আহত হচ্ছে। বলছে—যা করবে, আগে দেখো, তা করার যোগ্যতা তোমার আছে কিনা।

কিন্তু তোমার efficiency নিয়ে তো আমাদের কোন সন্দেহ নেই। একই সংগে বলে ওঠে গোপেন ও সুধীর।

I know—আমি জানি ভাই। কিন্তু—

তাকে থামিয়ে দিয়ে নিরঞ্জন বলেন—বরং last year-এ বোনাসের ব্যাপারে তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করেছো। তবুও কেন যে এই complex তোমার মধ্যে grow করলো ভেবে পাচ্ছিনা। Be practical সমৎ, তুমি মেহনতী মানুষেরই একজন, কোনরকম সেন্টিমেণ্ট তোমার সাজে না। লড়াই করে বাঁচতে হবে, নিজেদের পাওনা বুঝে নিতে হবে ঐ শোষকদের কাছ থেকে। লড়াই চলছে আমাদের, এ অবস্থায় কতকগুলো impassioned কথা বলে সরে দাঁড়াবে লড়াই থেকে?

নিরঞ্জনদা, এতোদিন যা করেছি, যা বলেছি—তার কোনটারই অধিকার নেই। যে কথাগুলো বলে-নিজেদের সুখ সুবিধে আদায় করেছি-সে কথা উচ্চারণ করা আমার পক্ষে অন্যায়। Management-এর যে অপরাধ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ঘৃণায় থুথু ফেলেছি, আজ সে থুথু নিজেরই গায়ে ফিরে আসছে নিরঞ্জনদা।

কি বলছো সনৎ—।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। উত্তেজনায় সনতের গলা কাঁপতে থাকে। বিন্দু বিন্দু ঘাম আবার জমে ওঠে কপাল আর নাকের দুপাশে। একটু চুপ করে থেকে নিজেকে সংযত করে বলে—কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি আমাদের মাইনে বাড়াবার কথা। নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিষের দাম বেড়েছে, সুতরাং মাইনেও বাড়ানো উচিত। এই কোম্পানী যদি একটি পরিবার হয়, তাহলে আমরা সেই পরিবারেরই একজন। একের সংগে অপরের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সাহচর্য ছাড়া কোম্পানী চলতে পারে না, সেই কারণেই আমাদের সুখ সুবিধে কোম্পানীর দেখা উচিত। এই যুক্তিই আমাদের তরফ থেকে দেখানো হয়েছে। তাইতো?

হ্যাঁ, কথাটা কি মিথ্যে?

না, মিথ্যে নয়। এবং মিথ্যে নয় বলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই সাহাচর্যের প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু আমাদের পরিবারে-এর অন্যথা হয়েছে।

অন্যথা হয়েছে তোমাদের পরিবারে! তার মানে?

বাবার increment হলো, খুশি হয়ে মায়ের শাড়ী আনলেন, ভাই-বোনেদের নতুন জামা এলো, সকলকে খুশি করার জন্যে মিষ্টিও এলো একবাক্স। কিন্তু আশ্চর্য! আমাদের বুড়ো চাকরটা বাবার কাছে মাত্র দুটাকা মাইনে বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হলো। তিনি সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন এই দুর্মূল্যের বাজারে চাকরের মাইনে বাড়াবার সামর্থ্য তাঁর নেই। অবাক হয়ে গেলাম। যে দুর্মূল্যের বাজারে মায়ের শাড়ী আসতে পারে, ভাই বোনদের জামা আসতে পারে, অধিকন্তু হিসেবে মিষ্টিও আসতে পারে একবাক্স, সেই বাজারে চাকরের সামান্য দুটো টাকা বাড়তে পারেনা? তাকে খুশি করার প্রয়োজন নেই? অথচ, এই বুড়ো চাকরের সংগে আমাদের আত্মীয়তা না থাকলেও, সেও আমাদের পরিবারের একজন। তার সহযোগিতা un-avoidable, একদিন অসুখ করলে মা হিমসিম খেয়ে যান তার কাজগুলো সামলাতে।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকে সনৎ। লজ্জায় মাথাটা নীচু হয়ে যাচ্ছে। কেননা বাবা তারই, অপরের নয়। আস্তে আস্তে বলে—এতোখানি অবিচার মুখ বুঁজে সইতে পারলাম না। বাবার সংগে তর্কে নামলাম। চেষ্টা করলাম অনেক, তবু বোঝাতে পারলাম না তাঁর অন্যায়টা কোথায়। বোঝাতে পারলাম না স্বার্থপর ও শোষক বলে যাদের আমরা চিরদিন ঘৃণা করে এসেছি তাদের সংগে বাবার এতোটুকু তফাৎ নেই। আমি হেরে গেলাম।

ঘরের মধ্যে জমাট স্তব্ধতা। নিঃশ্বাসের শব্দও বুঝি শোনা যাচ্ছে। আব-হাওয়া আরো ভারী হয়ে উঠেছে। কারুর মুখে কথা নেই। সকলের মনেই অনুরণিত হয়ে চলেছে সনতের শেষ কথাগুলো—আমি হেরে গেলাম…হেরে গেলাম…হেরে…

আমি হেরে গেলাম নিরঞ্জনদা। বিষাদের হাসি হাসে সনৎ। আমার যে procedure-এর সুখ্যাতি করছিলেন, সেই procedure-ই fail করে গেলো নিজের বাড়ীতে। যাঁর ওপর অধিকার সবচেয়ে বেশী, যাঁর চেয়ে আপন আমার আর কেউ নেই—যাঁর সংগে নিজের সম্বন্ধ অস্বীকার করা যায় না, তাঁকেই convince করাতে পারলাম না। এযে আমার কতোখানি ব্যর্থতা তা আর কাউকে বোঝাতে পারবোনা। এ লজ্জা ঢাকা পড়বে না কোনভাবেই। সেইদিন সেই মুহূর্তেই ঠিক করেছি আমি resignation দেবো। কেননা,

এতোবড় পরাজয়ের পর অপরের কাছ থেকে জোর করে কিছু আদায় করার অধিকার আমি হারিয়েছি। ঘরই যাকে মানলোনা-বাইরে যুদ্ধ করার শক্তি তাকে কে যোগাবে? মনের ভেতর থেকে কে একজন সর্বক্ষণই বলতে লাগলো rectify yourself, আগে নিজেকে শোধন করো, perfect হও, তারপর বিচার করতে বসো অপরের। এরপরেও এতোখানি মিথ্যের বোঝা আমি বইতে পারবো না নিরঞ্জনদা। আমায় ক্ষমা করুন।

কথাটা শেষ করে যেন হাঁপাতে থাকে সনৎ। এতোদিন মনের সংগে যুদ্ধ করে কেবলই অশান্ত হয়ে উঠেছে, আহত হয়েছে। এবার শান্তি। অপূর্ব এক শান্তির সুর সে শুনতে পাচ্ছে। এ সুর ভালোবাসার। প্রবঞ্চনা নয়, প্রতারণা নয়, এবার শুধু reclamation—সংশোধন করতে হবে নিজেকে।

সামান্য একটা সেন্টিমেন্টই তোমার এমন বিপর্যয় আনলো সনৎ! লজ্জার কথা।

সেন্টিমেন্ট! হ্যা নিরঞ্জনদা, এ-আমার সত্যদর্শন-revelation. যে সত্যকে নিজের অজ্ঞানতা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম, সেই সত্যই প্রকাশ পেয়েছে। এতোদিন মানুষের ওপর শুধু জোর করেছি, ভয় দেখিয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি, আজ বুঝছি সে পথ ঠিক নয়। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা যদি থাকে, তাহলে অধিকার জোর করে প্রতিষ্ঠা করতে হয়না নিরঞ্জনদা, আপনিই প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা রিক্ত, ভালোবাসার ভাঁড়ার একেবারে শূন্য করে বসে আছি। তাই এতো যুদ্ধ, হানাহানি, বিদ্বেষ, এতো অসহযোগ। অপরের প্রতি ভালোবাসা নেই বলেই শুধু নিজের স্বার্থ বুঝি, অপরের প্রয়োজন বুঝিনা। একটু থেমে সনৎ বলে—আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। মিথ্যের যে পথটাকে এতোদিন সত্য বলে আঁকড়ে রেখেছিলাম, সে পথ থেকে সরে সত্যের পথে চলতে হবে! জানি, আমার জীবন দিয়ে হয়তো এর শেষ দেখে যেতে পারবো না, তবু আশা রাখি অস্বীকৃত এই সত্যের পথ একদিন সকলের সামনে প্রকাশ পাবেই। সেদিন, মানুষ আর এতোটা রিক্ত মনে করবে না নিজেকে।

কথাটা শেষ করে উঠে দাঁড়ায় সনৎ। রেজিগনেশান লেটারখানা টেবিলের ওপর তেমনিই পড়ে আছে। পাখার হাওয়ায় মৃদুকম্পন তার বন্ধ হয়ে গেছে, সে যেন আত্মপ্রত্যয়ে স্থির। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে একবার মৃদুহাসে। তারপর আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে যায় মাথা উঁচু করে।

নগ্ন নির্জন

অমিয় মুখোপাধ্যায়

বহুদিন পর দেখা হ'ল মৌসুমীর সাথে। এক রকম হঠাৎ-ই। উত্তর পাড়ায় একটি লাইব্রেরীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। অনুষ্ঠান শেষে ষ্টেশন আসার পথেই তার সাথে দেখা। আমি তাকে লক্ষ্য করিনি। সে-ই আমাকে ডেকেছিল।

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, কোলে বছর দুই-এর একটি শিশু নিয়ে দাঁড়িয়ে। এখানে দেখব, আশা করিনি। খুশী ও বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম—মৌ, তুমি এখানে?

মাস ছয় হ'ল উনি এখানে বদলি হয়েছেন।

কোলেরটি?

আমার মেয়ে।

ভারি সুন্দর দেখতে হয়েছে। ছোট্ট ফর্সা হাতখানি ধরে নাড়া দিলাম একবার। হেসে উঠল। শব্দহীন এক ঝলক মিষ্টি হাসি। কোলে নিলাম। ওর বড় বড় চোখ দুটি বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে ধরল আমার চশমা লাগান মুখের ওপর। তারপর মৌসুমীর দিকে হাত বাড়িয়ে ফিরে গেল ওর কোলে। কি নাম রেখেছো?

বর্ণালী।

বাঃ, বেশ মিষ্টি নামটি তো! বিকেল বেলায় বেড়াতে বেরিয়েছো বুঝি মেয়েকে নিয়ে?

না, সকালে ওর মুখে শুনলাম, তুমি আসছো লাইব্রেরীর উদ্বোধন করতে। তাই দেখা করার আশায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

আমারই জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে!

কেন, বিশ্বাস করতে পারছোনা বুঝি ?

না ঠিক তা নয় ; তবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এভাবে কথা বলাটা কি তোমার দিক থেকে খানিকটা অসুবিধের নয় ?

তা হয়তো। কিন্তু—

বুঝেছি। কোন পরিচয়ে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে গল্প করবে, এই তো ?

তাই যদি বুঝে থাকো, তা বলে কি সেই নিষ্ঠুর সত্যটাকে এমনি করেই আমার দিকে ছুড়ে মারতে হয় ?

লজ্জা পেলাম। ওকে আঘাত দেবার কোন অভিপ্রায়-ই আমার ছিল না। তাই খুশী হয়, এমন-ই কোন কথা খুঁজছি। সে-ই আবার বলে উঠল—এসো না, বাগানের ঐ লিচু গাছটার তলায় একটু বসি। আসবে ?

'সেই ভালো, চলো একটু বসা যাক এখনই ফেরার কোন তাড়া নেই আমার।' ওরই পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি বাগানের দিকে। মনের মধ্যে তখন অতীত দিনের স্মৃতির ভীড়; আমাকে পুলকিত, ব্যথিত করে তোলে। কী মধুর নিবিড় সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হ'য়ে গেছি আজ! দীর্ঘ দশ বছরের নিঃসঙ্গ পথ চলা আজ নতুন করে পীড়িত করে আমাকে। চিন্তায় ছেদ পড়ল আমার। দেখি, লিচু গাছের নির্জন ছায়ায় কখন এসে দাড়িয়ে আছি।

কি ভাবছো বলো তো ?

কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্যেই একটু হাসলাম। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাসের ওপর পেতে দিয়ে বললাম—নাও, এটাতে বসো।

রুমালটাকে তুলে দিয়ে বসতে বসতে মৌ বলল—রান্নাঘরের কালি মেখে যাদের দিন কাটে, ঘাসের ওপরের ধুলো থেকে তাদের ভদ্রতা বাঁচাতে চাওয়াটা অর্থহীন।

মুখোমুখী বসলাম। বর্ণালীকে কোলে নিয়ে কলমটা তার হাতে দিলাম খেলতে। মৌ বলল,—

আজ তুমি নিজেই যে কলম ওর হাতে তুলে দিলে, আশীর্ব্বাদ করো, একদিন ও যেন তোমার কলমের মর্য্যাদা রাখতে পারে।

না, লেখক হ'তে আমি কাউকে বলবো না। অনেক দুঃখ আর হতাশার তিমির পেরিয়ে এসে তবেই একজন লেখক জীবনে প্রতিষ্ঠা পায়। অবজ্ঞা,

উপেক্ষা আর হতাশার এই মরু পার হতে যে কী দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তা বোঝানো যাবেনা। কোন প্রাণে ওকে ঐ পথে ঠেলে দিই বলো? লেখা-পড়ায় ও দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল করুক, জীবনে সুখী হোক, শুধু এই আশীর্ব্বাদটুকুই করবো।

ওর বাবা কিন্তু তোমার লেখার বড় ভক্ত। লেখা পর্ড়ে, আর মাঝে মাঝে খুকুকে বলে—'খুকু, বড় হ'য়ে তুইও এরকম অনেক বই লিখবি। জানো, আমি কিন্তু ওকে তোমার সব কথাই বলেছি।

আমার সব কথা! কি সব?

এই তুমি আমার গ্রামেব লোক, এক পাড়াতেই আমাদের বাড়ী, ছেলে-বেলায় খুব দুষ্ট ছিলে, এইসব। ছেলেবেলায় একবার কানের রিং ধরে এমন টেনে দিয়েছিলে যে কানটা কেটে গিয়েছিল। মনে আছে?

শুধু এইটুকু? আর তাতেই কি সব কথা বলা হল? আমি কি তোমার কাছে শুধু 'গ্রামের লোক?' আর কোন পরিচয় নেই? কি ক্ষতি হ'ত, যদি বলতে, 'আমরা পরস্পবকে বড্ড বেশী করে চিনেছিলাম, কাছে পেয়ে-ছিলাম।' বলতে তো পারতে—

'আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি।
সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ।
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখি
তাহার গানে আমার নাচে বুক।'

বেশী কিছু বলা হ'ত কি এতে?

কি করে বলবো? তোমার মতো তো আর রবীন্দ্রনাথ আমার গলায় বাসা বাধেননি। আর তোমাব মতো এমন সুন্দর করে কবিতাও আমি বলতে পাবিনা। 'বলাকা' কে তোমার মনে পড়ে অমিত?

বিস্মিত হলাম। বিবাহিত জীবনের মাঝ পথে এসেও কুমারী জীবনের সেই উজ্জ্বল স্মৃতিটুকু কি আজও ভোলেনি মৌ। 'বলাকা' ওরই নাম। একদিন আমিই দিয়েছিলাম।

পড়ে বৈকি। ওকে যদি আজ ভুলে যাই, তাহলে যে মনে রাখার মতো আর কিছুই থাকেনা মৌ। সেবার টাইফয়েড থেকে উঠে যখন চুপচাপ বসে

থেকে সময় আর কাটতে চাইতো না, তুমি সঞ্চয়িতা এনে দিতে শুধু তাই নয়, বায়না ধরতে ওর থেকে কবিতা পড়ে শোনাতে হবে। 'বলাকা' কবিতাটি তোমার ভাল লাগতো, আর তা-ই পড়ে শোনাতে হ'ত রোজ। মনে পড়ে? এই নিয়ে তোমাকে একদিন বলেছিলাম—এত করে 'বলাকা' শুনছো, 'বলাকা' হ'তে ইচ্ছে করছে নাকি?

তুমি বলেছিলে—হ'লে বেশ ভাল হত। সীমাহীন আকাশে দুরন্ত ডানা মেলে উড়ে বেড়াতাম খেয়াল খুশী মতো ; বাধা দিত না কেউই।

তোমাকে কাছে টেনে নিয়ে কানের কাছে মুখ নামিয়ে চুপি চুপি বলেছিলাম—'বেশ তো, তুমি আমারই 'বলাকা'। উড়ে বেড়াবে আমার মনের আকাশে; আমার হৃদয়ের নিভৃত আঙিনায় পড়বে এসে তোমার ছায়া। তারপর দিনান্তে ক্লান্ত ডানা নিয়ে নেমে আসবে আমার পৃথিবীতে।' কোন প্রতিবাদ করনি। শুধু ভীরু ভীরু চোখে বাবেক তাকিয়েছিলে মুখের দিকে, চোখের ওপর। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছিল তোমার মুখ। এমনি করে তোমার আমার মধ্যে যে নিভৃত সম্পর্কটা গড়ে উঠেছিল, ক্রমে তা সবাই জানল, জানলেন তোমার বাবা। একটা বি. এ. পাশ বেকার ছেলের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সাথে তোমার ভাগ্যটাকে বেঁধে দেবার মত অবিবেচক তিনি ছিলেন না। এক সমৃদ্ধ বন্দরে তোমার নৌকো গেল ভিড়ে। আর আমি ভেসে চললাম অন্ধকার দরিয়ার মধ্যে দিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশে।

সবই জানি অমিত, মনে পড়ে সবই। কিন্তু কি লাভ, আজ আর সে কথা ভেবে? দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার।

না, লাভ হয়তো কিছুই নেই। তাছাড়া আজ তোমাকে এ সব কথা শোনানোও হয়তো আমার অন্যায়।

ন্যায়-অন্যায়ের কথা আসছে না। আমি শুধু এই টুকুই বুঝি, আজ সে সব কথা মনে করে মনকে ভারি করা ছাড়া আর কোন লাভ নেই। তার চেয়ে নতুন কোন কথা বল শুনি। এখন কি লিখছো? আচ্ছা, আমাকে নিয়ে কিছু লিখতে পারোনা?

তোমায় নিয়ে? সবই তো লেখা হয়ে গেছে মৌ! প্রতিটি লেখায় তোমার ছায়া। নিজের ছায়া দেখে চিনতে পারোনি?

পেরেছি অমিত। কিন্তু সেতো আমার ছায়া? আমার মনের ছায়া তো পড়েনি সে লেখায়? আমার যে অনেক কিছু বলার আছে—

বর্ণালীকে কোলে নিয়ে ও বললে।

হ্যাঁ। একটু থেমে মৌসুমী বলে—আজকের বর্ণালীকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি যায়না সেদিনের অমিতকেও। তাই অতীত ম্লান হবে না জীবন থেকে কোনদিনও।

বেশ। তোমার মনের ছায়াও তো দেখলাম। এবার সে ছায়াও পড়বে কাগজের বুকে।

তোমার শরীরের যা অবস্থা, তাতে করে সাহিত্যচর্চা কিছুদিনের জন্যে বন্ধ রেখে চেঞ্জে যাও।

সাহিত্যচর্চা বন্ধ রাখলে বাঁচবো কি নিয়ে মৌ? ঐ টুকুই তো জীবনের একমাত্র সম্বল। বিক্ষত মন আর নিঃসঙ্গ হৃদয় নিয়ে চেঞ্জে গেলেই কি শরীর সারবে ভাবো?

আমার একটা কথা রাখবে অমিত?

বলো।

তুমি বিয়ে কর। এভাবে তোমার জীবনকে নিঃশেষ করোনা।

বিয়ে করলেই বুঝি জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়? আর আমার জীবন নিঃশেষ হচ্ছে একথাই বা ভাবছো কেন?

স্থূল দৃষ্টিতে আমরা জীবনের যে ছবি দেখতে অভ্যস্ত, সে তো মানুষের এই দাম্পত্য জীবন। স্বামী, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, ছোট্ট একটি বাসা; আর স্বপ্নময়, ছন্দময় অফুরান দিন। একেই তো আমরা জীবনের সার্থকতা বলি।

কিন্তু জীবনকে যে ভিন্ন দৃষ্টি নিয়ে দেখতে জানে তার কাছে তো জীবন কখনও ব্যর্থ হ'য়ে যায় না। যে প্রেম আমাকে দিয়েছে আনন্দ, দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে যে আমাকে করেছে সোনা; আমার চলার পথে সে প্রেম আজও নিষ্কম্প শিখায় আলো দিয়ে চলেছে। আমার জীবনকে সে ব্যর্থ হ'তে দেবেনা কখনও।

যুক্তির বেড়া তুলে আসল প্রশ্নকে শুধু এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছো অমিত। এই যুক্তি দিয়ে মনকে প্রবোধ দিতে গিয়ে মনের সঙ্গে অহর্নিশ যুদ্ধ করে চলেছো তুমি। তোমার ভেতরে ও বাইরে তাই এত বিষণ্ণতা। ক্লান্ত

চোখে আজ শুধু বেদনার আর্তি। তোমার প্রতিটি লেখায় এই দ্বন্দ্বই বার বার প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। কি লাভ, নিজেকে তিলে তিলে এভাবে শেষ করে? আমি বলছি, তুমি বিয়ে করো অমিত; কথা রাখো।

জীবনে যাকে পরম সত্য বলে জেনেছি, তাকে সামনে রেখে যদি শেষই হ'য়ে যাই, ক্ষতি কি? আমার অসীম আকাশে 'বলাকা' যে আজও সঞ্চরণশীল। আমার সমস্ত জীবন জুড়ে যে তার ছায়া ফেলেছে তাকে কেমন করে ভুলে যাবো?

উত্তর দিলনা মৌসুমী। কেবল আমার চোখের থেকে ওর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে পায়ের আঙুল দিয়ে কয়েকটা ঘাসকে পিষতে লাগল ধীরে ধীরে। ওরই দিকে তাকিয়ে আছি আমি। আর ভাবছি জীবনের বসন্তবেলায় যাকে নিয়ে অহর্নিশ স্বপ্নের জাল বুনেছি, সেই মৌসুমী আজ আমারই সামনে বসে। কোনদিন ভাবিনি, এমনি করে কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে আবার তাকে কাছে পাবো।

আমার নীরবতায় মৌসুমী জিজ্ঞেস করল কি ভাবছো?

ভাবছি কাছে থেকেও তুমি আজ কত দূরে।

বংশীবালা

সেখ গিয়াস উদ্দিন

"এই অকালে বাজারে বসে বসে খেতে লজ্জা করে না, বুড়ো বাঁদর। খেঁকিয়ে উঠল প্রফুল্লর মা। আজ প্রফুল্লর মনে বড্ড ব্যাথা লাগল রোজই তো মা এমন করে বলে কিন্তু আজ আর সহ্য হল না প্রফুল্লর। কোন রকমে রাতটুকু কাটিয়ে ভোরের বেলায় উঠে বাবার দেওয়া একটা আংটি আজও এত কষ্টের মধ্যে আঁকড়ে রেখেছিল, ভাঙ্গা বাক্স থেকে আংটিটা নিয়ে কলকাতায়

রওনা হল প্রফুল্ল। কলকাতায় গিয়ে যা হোক একটা কিছু করবে আর তার থেকে সপ্তায় সপ্তায় মার জন্যে কিছু পাঠাবে। না হয় শেষে মুটেগিরিই করবে।

ভাগ্য কি এতই প্রসন্ন? মুটে হবে তারও উপায় নেই। তাদের বুকে শীল মারা আছে। প্রফুল্ল ব্যথাভরা বুক নিয়ে এখানে সেখানে ঘুরতে ঘুরতে একটা ফাঁকামত জায়গায় থমকে দাঁড়াল। কিসের সুর? সুরটা প্রফুল্লর জানা মনে হল; ঘাড় ফিরিয়ে খুঁজতে লাগল কোথা থেকে ভেসে আসছে সুরটা। বেশ কিছুটা দূরে একটা মাঠমত জায়গার কতকগুলো দশ-বারো বছরের ছেলে কাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল প্রফুল্ল। ভিড় ঠেলে ঢুকল প্রফুল্ল। দেখে একজন পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের বুড়ো-মত লোক, মাথার চুলগুলো বেশীর ভাগ পেকে গেছে, কপালে অনেককটা ভাঁজ পড়েছে, সেই বুড়ো বাঁশী বাজাচ্ছে পাশে অনেক বাঁশী রাখা আছে। বাঁশী! হ্যাঁ! সে বাঁশীরই ব্যবসা করবে! বাঁশীবালা হবে। বুড়োর মতই ছেলে জড় করে বাঁশী বিক্রি করবে। প্রফুল্ল ভাল বাঁশী বাজাতে পারে, তার বেশ মনে আছে, বাবার জন্য সে যখন মাঠে ভাত নিয়ে যেত, তখন তার কোমরে একটা বাঁশী গোঁজা থাকত। বাবা হাল চষতে চষতে হাল ছেড়ে যখন খেতে বসত, প্রফুল্ল পাশের পিয়ারা গাছের গুলতির মত ডালে উঠে গিয়ে পা ঝুলিয়ে বসে মনের আনন্দে বাঁশীতে ফুঁ দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীটা কেঁপে উঠত। বাবা শুনে মুগ্ধ হয়ে বলতো, "রোজ বাজাবি প্রফু—আমি যখন খেতে বসব, তখন এ্যাঁ?" ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাত প্রফুল্ল।

প্রফুল্লর বাবার কত আশা ছেলেকে নিয়ে, কিন্তু আশা আশাই রয়ে গেল। চাষের মরসুমে লাঙ্গল চষতে চষতে হঠাৎ একদিন লাঙলের ফাল পায়ে পড়ে পা-টা কেটে ফাঁক হয়ে গেল; পয়সার অভাবে ডাক্তার দেখাতে না পারায় ক্ষতস্থান সেপ্টিক হয়ে গেল, আর তার ফলেই দশ-বছরের ছেলে প্রফুল্ল ও প্রফুল্লর মাকে রেখে সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। বিদায়ের দুদিন আগে ছেলেকে ঐ আংটিটা দিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছিল,—"'এটা রেখে দে, খোকা কাজে লাগাবে!"

প্রফুল্লর মা পরের বাড়ী ঝি-গিরি করে কোন রকমে দিন কাটিয়ে দিত। অকালে এই ভাবে স্বামী চলে যাওয়ার শোকটা তাকে বেশী লেগেছিল, প্রকাশ

করতে পারেনি অন্তরেই চেপে ছিল শুধু প্রফুল্লর মুখ দেখে। তাকে বাঁচতে হবে প্রফুল্লর জন্য। তাই স্বামী মারা যাবার পরও এতদিন বেঁচে আছে শুধু প্রফুল্লর ভবিষ্যৎ চেয়ে।

বাবার মৃত্যুর মাস সাতেক পরে প্রফুল্লর একবার জ্বর হয়েছিল। তখন হাতে একটাও পয়সা নেই যে এক শিশি ওষুধ এনে ছেলেকে খাওয়ায়। শেষে মালিক বরেন মল্লিকের বাড়ী ছুটল। অনেক অনুরোধ করে চাইল কিন্তু গৃহকর্ত্রী তার বদলে এক ঝোড়া কথা শুনিয়ে দিল, "না বাপু অমন কাজের লোক আমার চাই না, পয়সা দিলে অমন ঢের কাজের লোক জুটবে, মাসের অর্ধেক না হতে হতে তুমি মাসের পয়সা চাইলে, তা-ভাবলুম সেই দিতে হবে...। ফের বায়না ধরেছো কিছু টাকা দাও...অমন হলে কাল থেকে বাপু কাজে আসিসনি।" বলতে বলতে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে গেল। আর কোন পীড়াপীড়ি না করে ছেঁড়া শাড়ীর ছেঁড়া আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ছেলের মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভাঙা-ভাঙা কাঁপা-কাঁপা গলায় বলেছিল "ভগবান্, তুমি তো সবই জান, তুমিতো সব, ভগবান্ আমার বড় আদরের ধন একে তুমি নিও না! ওদের অনেক আছে, টাকা আছে, ছেলে আছে কিন্তু আমার কিছু নেই এই আমার সব, কক্‌খনো তুমি নেবে না একে!" প্রফুল্ল ক্ষীণ স্বরে মাকে ডেকে বলেছিল,—"মা! মাগো বাবার আংটিটা ঐ-ঐখানে আছে, ওটা কাউকে দিয়ে কিছু টাকা আন।"

মা কত কষ্ট করে তাকে খাইয়েছে, পরিয়েছে, তবু বাবার আংটি বিক্রি করতে দেয়নি। আর আজ প্রফুল্ল নিজেই সেই আংটি স্যাকরার কাছে বন্ধক দিল মার ওপর রাগ করে। মার বুঝি অভিশাপ লেগেছে, তাই সে কোন কাজ পাচ্ছে না এত বড় কলকাতার মধ্যেও। সেই মা কোনদিন অভিশাপ দিতে পারে না ; প্রফুল্লর মনে হাসি। বাঁশী বিক্রি করেই মাকে খাওয়াবে।

বাঁশীবালা বাঁশীবাজান থামিয়ে সব গোছ-গাছ করছে দেখে প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করল—ও বাঁশীবালা ভাই, বাঁশী কি বিক্রি করবে ?

হ্যাঁ—দাদা, আমি তো বাঁশীই বিক্রি করি, তুমি কিনবে নাকি ? ছ-আনা দাম।

হ্যাঁ—ভাই কিনব, তবে অনেক, কুড়ি টাকার।

কুড়ি টাকা! কেন বাছা তুমি কি বিক্রি করবে নাকি?

আর কি করব, ভাই, কোন কাজ পেলাম না তোমাদের কলকাতায়!

তোমার বাবা কোথায়?

আমি তো গরীব। বাবা! বাবা আজ সাত বছর মারা গেছে।

বাঁশীবালা সান্ত্বনা দিল, "কোন ভয় নেই, তুমি আমার সঙ্গেই থাকবে, বল, তোমায় বাঁশী বাজানো শেখাব। আমার বেউ নেই, আজ থেকে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।"

প্রফুল্ল সার্টের খুঁট দিয়ে চোখ মুছে হাসতে হাসতে বলল—"আমি বাঁশী বাজাতে পারি, দাওনা একটা বাঁশী, বাজাই।"

বাঁশীবালা একখানা নতুন বাঁশী বার করে দিয়ে বলল, বাজাও শুনি।"

প্রফুল্ল চোখ বুজে মনে মনে কি বলে বাঁশীতে ফুঁ-দিল, আস্তে আস্তে গলার জড়ানো স্বর পরিষ্কার হয়ে এমন একটা সুর বেরল সে সুরে ঝরে পড়ল বিন্দু-বিন্দু বেদনা—মানুষের হৃদয়ের বেদনা।

এক সময় সুর থামিয়ে বাঁশীবালার সঙ্গে চলতে লাগল। বেশ কিছু দূর যাবার পর প্রফুল্ল জিজ্ঞেস করল, "আমরা কোথায় যাব?

গোবিন্দপুরে তুমি যাবে তো!"

হ্যাঁ-হ্যাঁ আমি যাব। তোমায় আমি কি বলে ডাকব?

"কেন যা বলে ডাকছ। বাঁশীবালা বলবে।

ঠাকুরদা বলব।

তাতেই রাজী। সেই থেকে প্রফুল্ল আর বাঁশীবালা বলে না—ঠাকুরদাই বলে।

বাঁশীবালার সঙ্গে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। প্রফুল্লর অন্তরটা যার জন্য হাহাকার করছে, সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। বাঁশীবালা সংসার ধর্ম করে বুড়ো হয়েছে, এককালে তার সবই ছিল। এখন না হয় সে একা—এক সময় ছেলে, মেয়ে, বউ, নাতি সবই ছিল। কিন্তু বিধাতা একে একে সবই দিয়ে ছিল, আবার সবই কেড়ে নিল। বাঁশীবালার অন্তরটা প্রফুল্লর থেকে বেশী হাহাকার করছে। সবই তাঁর ইচ্ছা। তার উপর আস্থা রেখে বুড়ো বাঁশীবালা আজও বিশাল পৃথিবীর এককোণে বেঁচে আছে। প্রফুল্লকে নাতি

হিসাবে পেয়ে তার অন্তরটা অনেক হাল্কা হয়েছে। আজ সেই প্রফুল্লর পাংশু মুখ দেখে তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল,—"ভাই, মার জন্য মন খারাপ করোনা, আমরা দু দিন পরে মার কাছে যাব। আজ নাহয় কিছু টাকা পাঠিয়ে দিই, কেমন।"

প্রফুল্লর কথামত কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল বাঁশীবালা, সপ্তাখানেক পরে বাঁশীবালা ও প্রফুল্ল মাণিকপুরে হাজির হল। মা প্রফুল্লকে দেখে হাতে স্বর্গ পেল, ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে খেয়ে মুখ লাল করে দিল, আয়, বাবা। আর উনি কে বাবা ?"

"মা উনি ঠাকুরদা ওনার কাছেই থাকি। আর উনিই তো তোমায় টাকা পাঠিয়েছেন।"

থাক, মা, থাক, পায়ে হাত দিতে নেই, হাত দিও না। আশীর্বাদ করি বেঁচে থাক।" চার-পাঁচ দিন বেশ আনন্দের সঙ্গে দিন কাটল। বাঁশীবালা ও প্রফুল্ল মাকে ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। যতদূর দেখা গেল দুজনকে ততদূর দেখল, শেষে আঁচলে চোখের জল মুছে বাড়ী ফিরল। সেদিন আর তার কিছু ভাল লাগলো না—সব সময় ছেলের মুখটা ভেসে উঠছে।

প্রফুল্ল তাড়া দিল, "চল, ঠাকুরদা।"

"হ্যাঁ ভাই, চল।"

দিগন্ত প্রসারিত সবুজ রোয়ালি করা ধান ক্ষেতের বুক চিরে তাদের নিয়ে রেলগাড়ী ছুটে চলেছে। গাড়িতে একটা রাত কেটে গেছে।

উঁচু নিচু এবড়ো-খেবড়ো মেটে রাস্তা ধরে নাতির হাত ধরে ঠুক ঠুক করে হেঁটে চলেছে বুড়ো বাঁশীবালা।

প্রফুল্ল কয়েকটা হাঁক দিল—"মা, মা" বলে। তারপর দরজায় তালা দেওয়া দেখে বুঝল মা বোধ হয় কোথায় গেছে। পাশের বাড়ীর কাকীমা আসছে দেখে কাকীমাকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ কাকীমা মা তোমাদের ওখানে আছে ? ডেকে দাওনা একবার ?"

আঁচলে জল মুছতে মুছতে কাকীমা বলল, "মা ! মা নেইরে খোকা, পনের দিন হল মারা গেছে।"

প্রফুল্ল আর্তনাদ করে চেঁচিয়ে উঠল, "মা ! মাগো !" বাঁশীবালা চোখ

মুছে প্রফুল্লকে টেনে তুলল। "ছি! ভাই কাঁদেনা। কাঁদলে মার আত্মা কষ্ট পাবে।"

অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কাকীমা আঁচলে চোখ মুছে আঁচলের খুঁট থেকে প্রফুল্লর মার গলার হার, চুড়ি, চাবি বের করে প্রফুল্লকে দিল।

"কি হবে? মা নেই! বাবা নেই! সব চলে গেল।" পাশে বসেছিল বুড়ো বাঁশীবালা। সান্ত্বনা দেবার মত সেই আছে। বুকের ব্যথা বুকে চেপে সান্ত্বনা দেয়, "না ভাই, মন খারাপ করিসনি; দুদিনের দুনিয়া, সব মায়াজাল।"

অজান্তে

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

মানুষের জানা-শোনার অন্তরালে ভালবাসা যে ধীরে ধীরে জয়লাভ করতে পারে এবং আপন অজান্তে বৃদ্ধি পায়, সে কথা উপলব্ধি করেছিলাম আমার আর পাপিয়ার ভালবাসাকে কেন্দ্র ক'রে!

তখন আমি ছাত্র। গ্রামের বাড়ীতে থেকে পাশের গ্রামেই পড়াশোনা করি। দিদি থাকে কলকাতায় হোষ্টেলে। পড়ে ওখানকার কলেজে। সেবার পূজার ছুটির সময় দিদি বাড়ী এলো। ছুটির শেষে আমার কলকাতা যাওয়ার সময় আমি তার সংগী হলাম। মেয়েদের হোষ্টেলে আমার স্থান হ'ল না। না হওয়াই স্বাভাবিক। দিদির এক অন্তরংগ বান্ধবীর বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা হ'ল। আমাদের তুলনায় অনেক ধনী ছিলেন তাঁরা। অসুবিধে হওয়া উচিত ছিল কিন্তু দিদির বান্ধবীর আদর আপ্যায়নে তা মোটেই অনুভূত হলো না। এখানে পরিচয় হ'ল তাঁর ছোট বোন পাপিয়ার সঙ্গে। একান্ত মামুলী পরিচয়। বাড়ীতে অপরিচিত নতুন লোকের আগমনে যেমনটি হওয়া উচিত। পাপিয়া

সবে মাত্র ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে। দেখতে বেশ সুন্দর। আরও সুন্দর তার মিষ্টি মধুর ব্যবহার। যে কয়দিন সেখানে ছিলাম, পাপিয়া তার সুমধুর আচরণে আমাকে অবাক করেছিল। দিন চারেক থাকার পরে আবার বাড়ী ফিরে এলাম। কিন্তু আমার মনের একটা বিশেষ অংশ রেখে এলাম সেখানে। আর সৃষ্টি করে এলাম চিঠির যোগসূত্র।

চিঠির আদান প্রদান যথারীতি চলতে থাকল। দিদি কলেজ ছাড়ল—বিয়ে হল—সংসারী হল। কিন্তু আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হল না। গ্রামের পর্ণ-কুটিরের এক যুবকের বার্ত্তা ডাক ও তার বিভাগের কল্যাণে গিয়ে পৌঁছতে লাগল শহরের ধনীর প্রাসাদে, আর প্রাসাদ থেকে লিখিত সংবাদ আসতে লাগল পর্ণকুটিরে। সেগুলোকে সাধারণ বন্ধুত্ব ও প্রীতির নিদর্শন হিসাবেই দেখেছি, এর মধ্যে থেকে কোনও প্রেমের সম্পর্ক কোনও দিন অনুসন্ধানের চেষ্টা করিনি। অথচ এর মধ্যে সেই পদার্থটুকু যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল একদিন আকস্মিক ভাবেই তা ধরা পড়ল আমার কাছে। দীর্ঘদিন আগে আলাপ পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে একটি ধনীর দুলালী যে আমায় একান্ত আপন করে নিয়েছিলো—তা বোঝা গেলো অনেক পর।

পাশের গ্রামে গিয়েছিলাম, ফিরতে রাত হলো। বাড়ী ফিরতেই দেখি আমার ঘরে আলো জ্বলছে। বিস্মিত হলাম আমার অনুপস্থিতিতে আলো জ্বলতে দেখে। ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। বিছানায় বসে একটি নারী। অভিজাত পোষাক, মূল্যবান অলঙ্কার তার গায়ে। কিন্তু কেমন যেন বেমানান এঘরের পাশে। ঘরের প্রতিটি আসবাবই যেন লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে রয়েছে।

আপনি —!

আপনি! তুমি আমায় চিনতে পারলে না? আমি—আমি পাপিয়া। ভুলে গেছো আমায়?

পাপিয়া? না— ভুলিনি। ঘটনার আকস্মিকতায় কেমন যেন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আশা করিনি—তোমায় দেখবো এখানে এই অসময়ে। কি ব্যাপার বলোতো?

বিছানা থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে পাপিয়া। সামনে দাঁড়ায়। আমার চোখে তেমনি বিস্ময়। খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে চোখ তোলে। বাবা একজনের সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক করে ফেলেছে। কিন্তু আমি তো—

কিন্তু আমি যে তোমায়—কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় পাপিয়া। তারপর আস্তে আস্তে বলে—আমি সুখ চাই না—অর্থও চাই না—শুধু শান্তি চাই।

কিন্তু পাপিয়া—যদি কোনদিন মনে হয় ভুল করেছো? তখন আর ফেরার পথ থাকবে না। তোমার প্রাসাদের পাশে এটা পর্ণ কুটির। এখানে থাকতে থাকতে যেদিন মনে হবে—নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে—সেদিন কি ক্ষমা করতে পারবে আমার এ দারিদ্র্যকে?

স্মিত হাসে পাপিয়া। জানি এ সংশয় তোমার মনে দেখা দেবে। পাশাপাশি দাঁড়াতে দ্বিধা জাগবে মনে। বেশ, আমার এই অলঙ্কার, আভিজাত্য—যেটাকে তোমার অহঙ্কার বলেই মনে হয়েছে চিরদিন, এই পর্ণকুটিরের বাইরেই রেখে আসছি এখনি। তখন তো আর মনে হবে না আমি প্রাসাদ থেকে এসেছি? তখন তো তোমার মনে হবেনা—আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে? না না আমায় ফিরিয়ে দিওনা। অর্থ নয়, সুখ নয়—শুধু শান্তি চাই পারবে না দিতে? চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে তার।

পাপিয়ার দিকে তাকিয়ে মনে হলো—সমস্ত অহঙ্কার যেন একটা একটা করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে দূরে। চোখের জলে ধুয়ে মনটাকে শুভ্র করে তুলেছে। হাত দুটি তার টেনে নিই নিজের হাতে। মাথাটা আপনা থেকেই নীচু হয়ে আসে। চিবুকে হাত দিয়ে মুখটা তুলে বলি - মাথা নীচু নয়, উঁচু করো পাপিয়া। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে হলে মাথা উঁচু করেই লড়তে হবে!

একটু হেসে সরে দাঁড়ায় সে! বলে—মা আসছেন, এ ঘর থেকে এখন যাও।

———

কখনও অন্ধকারে

রতন মহাপাত্র

মৃত্যু!

হ্যাঁ, মৃত্যুই একমাত্র পথ। নিজেকে মৃত্যুর মুখে ছুঁড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই সনাতনের।

ওর বিশা, যাকে বলে ছেলের মতো ছেলে। যেমনি জোয়ান, তেমনি পাক্কদাব। যতো বোঝাই হোক, একাই ঠ্যালা নিয়ে চলেছে। দর্ দর্ ঘাম ঝরছে গায়ে। যেন কাল-ঘাম ছুটছে। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই। লোকজনের ভিড়, সাইকেল-রিক্সা-লরি, সব বাঁচিয়ে ট্রান্সপোর্ট থেকে মাল নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে গুদামে-গুদামে। সাঁঝের বেলা বাড়ী ফিরে সনাতনের হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছে। কোনোদিন ছ'টাকা, কোনো দিন আট-টাকা।

সবাই বলতে বাধ্য হয়েছে—"সত্যি, সনাতন ধন্যি তুর ব্যাটা। একলাই সিরমটের বুজাই ঠ্যালা গড়-গড়াই লি যাচ্ছেক।"

সনাতন শুধু হাসতো। আর বলতো—"উ মোর ব্যাটা লয় গো, উ ভগবানের চ্যালা।"

আজ সেই জোয়ান মরদ ছেলেকে যমের মুখে তুলে দিয়ে কি করে বাঁচবে সনাতন! চারদিক তার কাছে অন্ধকার। বুকটা তার ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। বিশা ছিলো ওর চোখের আলো। ওর হৃদ্‌পিণ্ডের রক্ত।

বিশার-মাও কাঁদছে দিন-রাত। এসব সইতে পারছে না সনাতন। তাই মৃত্যুই কেবল শান্তি এনে দিতে পারে ওকে।

সুতরাং, আত্মহত্যা। হ্যাঁ, এটাই ঠিক। কালই ভোরে সবার ঘুম ভেঙে জাগার আগে বিশার খোঁজে চলে যাবে সনাতন। পেছনের আম গাছটা,

নতুন শণের দড়ি-গাছাটাও ঠিক আছে। ঠ্যালা বাঁধবার জন্যে নিজের হাতেই ওটা তৈরি করেছিলো বিশা।

ভোরের আলো ফুটলো। ঘুম ভেঙে সবাই জাগলো। কিন্তু পেছনের আমগাছে সনাতনের প্রাণহীন দেহটা ঝুলতে দেখা গেলো না।

দেখা গেলো উঠোনের পাশে এ ক'দিন ধরে পড়ে থাকা রিক্সার চুপসানো চাকাগুলোয় হাওয়া দিয়ে টাইট্ করতে।

তা'হলে আবার রিক্সা নিয়ে ভাড়া খাটতে বেরোবে সনাতন।

হ্যাঁ, বেরোতেই তো হবে। আগের দিন যে কথায় কথায় নিজের মনের ইচ্ছাটা হারুখুড়োকে বলে ফেলেছিলো সনাতন। হারুখুড়োও চোখ দু'টো বড়ো করে বলেছিলো—"তুই আত্মঘাতী হ'বি সনাতন! সাত-জন্মেও তুর মুক্তি হবেক নাই, ই কথা মুই জোর গলায় বলছি কিন্তুক।"

সনাতন শুধু কেঁদে বলেছিলো—"মুই বাঁচি কি লিয়ে খুড়া? মোর বিশা ব্যাটা যে মোকে মারি দিয়ে গ্যাছেক গো!"

হারুখুড়ো তখন বুঝিয়ে বলেছিলো—"তুই ত মরবিক সনাতন, তারপর তুর খাঁদি-ঝি, তুর মনা-ব্যাটা, তুর ইস্তিরি কি করবেক শুনি? সবগুলানই মরবেক। তুই বরং ভাবি ছাখ সনাতন, মরণকে কি ধরণ আছেক। তুর বিশা ব্যাটা গ্যাছেক, তার লাগি তুই মরবিক, তুর পোষ্যি-গুলানও ভুকে শুকে শুকে মরবেক। ইটা কি ভাল হবেক সনাতন! এ্যাত্ত পাপ তুই রাখবিক কুথা, বল?"

এর কোনো জবাব দিতে পারেনি সনাতন। শুধু প্রতিজ্ঞা করেছিলো মনে মনে, বাঁচতে ওকে হবেই। ওর মনা-ব্যাটাও তো বড়ো হবে একদিন। মরদ হবে। ঠ্যালা চালাবে। আর দেখতে দেখতে সব ঠিক হয়ে যাবে একদিন।

বেরোতে হলো সনাতনকে রিক্সা নিয়ে। মোড়ের মাথায় স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে বলতে হলো—"এসুন বাবু, এ্যাক লিমেষে কাচারি ধরি দিচ্ছি।"

সামলে নিলো সনাতন।

কেউ কেউ বলাবলিও করলো—"সনাতনটা যা'হক উর সা- জুয়ান ব্যাটার শোকটা ভুলছেক।

কেউ বা সহানুভূতি প্রকাশ করে বলতো—"আহা, ব্যাচারা কি করবেক আর। যম ত ঘরের লোক লয় যে দু'টা কথা বুঝাই বলবেক।"

কিন্তু, পারলোনা বিশার-মা। দিন-রাত কেঁদে কেঁদে শুকিয়ে গেলো মানুষটা। সনাতন কতবার বলেছে—"তুই আর কাঁদিস না বিশার-মা, তুই ভুলি যা অর কথা। উ মোদের ব্যাটা লয় গো, উ দুষমন।"

ভুলতে কি পারে বিশার-মা। অমন পাক্কদার ছেলে। আপসেই চোখ ফেটে জল আসে। বুকের ভেতরটা কেমন করে যে সবসময়।

একেক সময় সনাতন রেগেমেগে বলেছে—"তুই শ্যাষে এ্যাকটা অসুক ধরাবিক বিশার-মা। নিজেও মরবিক, আর মোদিকেও মারবিক।"

ধরলোও তাই। অসুখ ধরলো বিশার-মাকে। রক্ত নেই। তার ওপর বুকের রোগ। অ্যানিমিয়া প্লাস হার্ট ডিজিজ।

শেষে সনাতন বললো—"চ' বিশার-মা, তুকে হাঁসপাটালে ভত্তি করি দিই। ঘরে মুই তুব চিকিচ্ছা করতি লারব।"

একদিন নিজের রিক্সায় করেই বিশার-মাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এলো সনাতন।

তারপর রোজ যেতো বিকেল চারটায় দেখা করতে।

দিনে দিনে কিন্তু বিশার মার অবস্থা খারাপের দিকে গড়াতে লাগলো।

এদিকে দু' দু'টো বাচ্চাকে নিয়ে নাজেহালে পড়লো সনাতন। সকাল সকাল ভাতে-ভাত ফুটিয়ে ওদের খাওয়ায় আর নিজেও দু'টো মুখে দিয়ে কাজে বেরিয়ে যায়। সারাদিন হাড়-ভাঙা খাটুনি। তবু সান্ত্বনা পায় সনাতন যখন বিকেলে বিশার মা'র রোগ-ক্লিষ্ট মুখটাও অন্ততঃ দেখে।

কিন্তু সে সান্ত্বনাও ঘুচে গেলো সনাতনের যেদিন বিকেলে গিয়ে সে আর বিশার মা'র মুখ দেখতে পেলো না। ক'মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ছিলো সনাতন বিমূঢ় হয়ে। চোখে জল এসেছিলো কি না, কে জানে, তবে দ্বিতীয়বার মৃত্যুর মুখে নিজেকে নিক্ষেপ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ফিরে এসেছিলো সনাতন।

এবার ও মরবেই। আর এ-মাটিতে বাঁচতে পারে না সনাতন। বিশা নেই, বিশার-মা নেই, সনাতন থাকবে কি করে?

* * *

ভোর বেলা গলায় ফাঁস নিয়ে ঝুলে পড়তে যাবে সনাতন, এমন সময় কেঁদে

উঠলো মনা, বোধ করি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেই,—"বাপু! বাপু! বা-পু-উ—উ—!"

মনা কাঁদছে। কি করবে সনাতন?

গলার ফাঁস খুলে নেমে আসতে হলো সনাতনকে আম গাছের ডাল থেকে।

পরদিন সন্ধ্যায় হারুখুড়োর কাছে গেলো সনাতন।

সব শুনে খুড়ো বল্লে—"তুই এ্যাক কাজ কর সনাতন, মরতে তুই লারবি, মরা তুর হবেক নাই। খাঁদি আছেক, মনা আছেক, তুই মরবিক ত উদিককে কে দেখবেক শুনি! তার চাই বলি কি, তুই বিলাসের বেওয়া ঝিটাকে বিয়া কর। ছাগুলানও মানুষ হবেক, আর তুর মনেও শান্তি আসবেক। বিলাসটা বুড়া হইছ্যা উর ঝিটারও এ্যাকটা গতি হবেক।"

সনাতন বলে—"লোকে হাঁসবেক যে খুড়া।"

হারুখুড়ো চোটে গিয়ে বলে—"লোক হাঁসলে তুর কি যাবেক শুনি? আর ই ত সখের বিয়া লয়।"

সনাতন ঘাড় নেড়ে জানায়—"ই সব কথা বাদ ভাও খুড়া।"

হারুখুড়ো শেষ চেষ্টা করে—"তুই এ্যাকবার ভাল করি ভাবি ভাখ সনাতন, এ্যায় তুর ধম্ম হবেক।"

সনাতন লোকহাসিকে অগ্রাহ্য করে খাঁদি-মনার মুখ চেয়ে খুড়োর কথাতেই মত দিয়ে আসে শেষ পর্যন্ত।

—•—

সৌদামিনী

শ্রীতরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

"কিছু জোগাড় করতে পারলে, না আজও খালি হাতে ফিরলে", বিরক্তি মিশ্রিত কথাগুলি ছুঁড়ে দেয় বিপিন ঘোষের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। বিপিন প্রথমে এ কথার কোন জবাব দিতে পারে না। শুধু নীরবে মাথার চুলগুলোর মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করে। পরে আস্তে আস্তে জবাব দেয় 'না, আজও কিছু হোল না।" কথাটা শেষ হওয়া মাত্রই সৌদামিনীর গলা ঝন্ ঝন্ শব্দে বেজে ওঠে, "সে যে হবে না, তা আমি আগেই জানতাম। তোমার মুরোদ ঢের জানা আছে। বৌ ছেলেকে যদি দুবেলা দুমুঠো খাওয়াতেই পারবে না, তবে বিয়ে করেছিলে কেন? অমন মিনসেদের গলায় দড়িও জোটে না?" এক অস্বাভাবিক ভঙ্গী করে সৌদামিনী।

বিপিন ঘোষের প্রথমা স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান রেখে মারা যাওয়ার পর, বিপিন ঘোষ আর বিয়ে করতে চায়নি। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনদের উপদেশে এবং কচি ছেলেটার কথা ভেবে দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করে। প্রথমে অবস্থা খুব ভালই ছিল। প্রথম বড় লক্ষ্মীকে যখন ঘরে আনে, তখন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী প্রতিমার মতই তার ভাঁড়ার উছ্‌লে উঠত। তখন ভাগে চাষ করে সে যা ধান পেত, তাতে সারা বছর খেয়েও বিক্রী করতে পারত। কিন্তু লক্ষ্মী মারা যাবার পর তার সংসারও যেন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। পর পর কয়েক বছর প্রকৃতির কোপে সারা বছরের খোরাক তো দূরের কথা, ধার দেনায় তার মাথা বিকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। বাইরে মহাজনের তাগাদা আর ঘরে সৌদামিনীর গঞ্জনা এ উভয়ের মধ্যে পড়ে বিপিন ঘোষের মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে জাগে। শুধু ছেলেটার মুখ চেয়ে পারে না। লক্ষ্মী মারা যাবার পর ওর দায়িত্ব এখন তো তারই হাতে।

সেই একভাবেই দাওয়ায় খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে বিপিন ঘোষ অতীত আর বর্তমানের স্মৃতি রোমন্থন করছিল। সৌদামিনী অদ্ভুত মূর্তি নিয়ে সেখানে এসে হাজির হোল। বাঘিনীর জ্বলন্ত চোখ নিয়ে একবার তার দিকে তাকিয়েই ঝংকার দিয়ে উঠল, "বলি, সারাদিন মড়াকাঠের মত এক জায়গায় বসে থাকবে নাকি? বে-আক্কেলে মিনসের ঢং দেখলে গা জ্বলে যায়। বলি, অত ছাই-পাঁশ ভাবনার কি আছে, উপায় তো হাতের কাছেই আছে।" কথাগুলো শ্রুতিকটু ঠেকলেও, শেষের কথাটায় বিপিন একটু বিচলিত হয়। বলে, "কিসের উপায়?" হাত, পা নেড়ে সৌদামিনী জবাব দেয়, 'যার জন্যে অত আকাশ পাতাল ভাবা, সেই উপায়।' "কিন্তু উপায়টা কি বলবে তো", কুপিত সিংহীর কাছে বিপিন ঘোষ মূষিকের মত প্রশ্ন করে। —"ওই নাদুস নুদুস খাসিটা কি করতে আছে। দাও না ওটাকে বেচে। এ বাজারে ওর দাম তো কম নয়।"

কথাটায় বিদ্যুৎপৃষ্টের মত চমকে ওঠে বিপিন। আহত স্বরে জবাব দেয়, "কি বলছ তুমি সদু। শ্যামচাঁদ যে বিজুর প্রাণের চেয়ে প্রিয়। জবাবে সৌদামিনী অঙ্গ হিল্লোলিত করে বলে, "আ-হা-হা-হা, কি আমার শ্যামচাঁদরে। চোদ্দপুরুষের শ্যামচাঁদ। বলি, দু পয়সার নেই মুরোদ আবার ছাগলের জন্যে পিরিত উছলে পড়ছে। ও সব ছেঁদো কথা ছাড়। যদি ভাল চাও আমিই ও পাপ মিটিয়ে দোব।" বিপিন ঘোষকে আষ্টেপিষ্ঠে বাক্যবাণে জর্জরিত করে সৌদামিনী রান্নাঘরের দিকে হন্ হন্ করে চলে যায়।

বিপিনের আহত চেতনা আরও অসাড় হয়ে আসে। সে আর ভাবতে পারে না। সৌদামিনীর বাক্যবাণ যেন তার অনুভূতিকে আঘাত করে অসাড় করে দিয়েছে। সৌদামিনীর এত বড় নিষ্ঠুরতা তার নরম হৃদয়ের বাঁধ ভেঙ্গে দেয়। শ্যামচাঁদ যে বিজুর প্রাণ পাড়ার পাঁচজন যেমন জানে, সৌদামিনীও তেমনি জানে। আর জানে বলেই সতীনের ছেলের প্রতি তীব্র রোষে সে এই জিনিসটাই বার বার করে বিপিনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিপিনের আহত অন্তর উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে ওঠে। না, সে কখনই পারবে না বিজুকে আঘাত দিতে। সে ভালভাবেই জানে শ্যামচাঁদকে ছিনিয়ে নিলে বিজু বাঁচবে না। টাকার দরকার—ঠিকই। সেজন্য তাকে অন্য চেষ্টা করতে হয়। এত বড় নিষ্ঠুর কাজ সে করতে পারবে না। তাতে সৌদামিনী যা বলে বলুক।

গামছাটা ঝেড়ে বিপিন উঠে দাঁড়ায়।

খিড়কীর দিকে পেয়ারা গাছটার তলায় ছাগলটা বাঁধা আছে। কচি নধর দেহটা দেখে দুষ্ট লোকের জিভে জল আসা স্বাভাবিক। বিপিন ঘোষ আস্তে আস্তে ছাগলটার কাছটিতে এসে দাঁড়ায়। ছাগলটা মুখ তুলে তার দিকে চায়। যেন তার বিষন্ন চোখ দুটি দিয়ে কিছু খোঁজার চেষ্টা করে। ধীরে ধীরে ছাগলটার গলায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে বিপিন। অবলা পশু শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তার দিকে চেয়ে থাকে। তার অন্তরের ব্যথাটা বুঝি সেও বুঝে ফেলেছে।

উদ্গত কান্নার ঢেউকে সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারে না। "নারে না, আমি কিছুতেই তোকে বেচ্তে পারব না। যত অভাবই হোক্ আমি তো জানি তুই বিজুকে কত ভালবাসিস। অবলা জীব, তাই মুখ ফুটে কিছু বলতে পারিস না।" অনেকক্ষণ একই ভাবে বিপিন সেখানে দাঁড়িয়েছিল। যাদব মণ্ডলের গলার স্বরে সম্বিৎ ফিরে এল।

সেদিন সকালে বিপিন ঘোষ গেল পীরগঞ্জে। রমজান্ বড় ভাল লোক। সরল ধর্মভীরু মানুষ। নিজের চাষ বাস নিয়ে থাকে। আপদে বিপদে লোককে সাহায্য করা তার এক মহৎ গুণ। বিপিনকে সাদরে বসিয়ে জিগ্যেস করল, "কি হে ভায়া, এতদিনে চাচাকে মনে পড়ল। এদিকে আর পা'ও মাড়াও না যে? ভুলে গেলে নাকি।" লজ্জিত স্বরে বিপিন জবাব দেয়, তোমাকে ভুলে যাব চাচা, এমন দুর্মতি যেন কোনদিন না হয়। আপদে বিপদে তুমি না থাকলে মরতে হোত।

সেখ্ জিভ কেটে বলে, "উ-হুঁ-হুঁ অমন কথা বোলো না ভায়া। আল্লার খিদ্‌মতগারি করাই তো আমাদের কাজ। আপদে বিপদে মানুষকে যদি সাহায্যই না করতে পারব, তবে মিছেই মুসলমান হয়ে জন্মেছি।" বিপিন ঘোষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "তোমার মত সবাই তো ভাবে না চাচা। এই যা দুঃখ।"

সেখান থেকে বাড়ী ফিরতে বেলা এক প্রহর হয়ে গেল। চৈত্রের চন্‌চনে রোদ্দুরে চারদিক ঝাঁ ঝাঁ করছে। বাড়ীতে প্রবেশের মুখে একটা আর্তক্রন্দন-ধ্বনি শুনে বিপিনের বুকটা ধড়াস্ করে লাফিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতরে ঢুকে যে দৃশ্য দেখল তাতে ব্যাপারটা বুঝতে তার দেরী হোল না। ধড়

কাটা ছাগলের মত বিজু মাটিতে পড়ে ছট্‌ ফট্‌ করছিল আর চীৎকার করছিল। বিপিনকে দেখে সে আরো জোরে কেঁদে উঠে বলল, "বাবা আমার শ্যামচাঁদকে ওরা নিয়ে চলে গেল। আমার শ্যামচাঁদকে ফিরিয়ে দাও।" তার একই গগনভেদী হাহাকার প্রতিধ্বনিত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

এত কাণ্ডেও সৌদামিনীর কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না। সে আপন মনে রান্না করছিল। বিপিন ক্রোধে লাল হয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল। গলার স্বর চড়িয়ে বলল, "ছাগল বিক্রী করতে তোমায় কে বললে? জবাব দাও আমার কথার।" বার দুয়েক বলার পর সৌদামিনী স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে জবাব দিল, "বেশ করেছি। একটা ছাগলের জন্যে বাপ-বেটার শোক্‌ একবারে উছ্‌লে উঠল। ভাত যোগাবার মুরোদ নেই, আবার চোখ রাঙাবার বহর দেখ? বেশ করেছি, একশবার করব। মিছে আমায় ঘাঁটাতে এস না। সপ্তকাণ্ড শুনিয়ে ছাড়ব।" চড়া স্বরেই বিপিন পুনরায় বলে, "তোমার লজ্জা করেনা সদু? তুমি না মা! পেটে ধরনি বলে বিজু কি তোমার সন্তান নয়? মুখটা বিকৃত করে সৌদামিনী জবাব দেয়, "আ—হা—হা মরে যাইরে, কি আমার সতীনের ছেলেরে!"

বিপিন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে উঁচিয়ে বলে, "ইচ্ছে করছে তোমার মুখটাকে চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিই।" —"তা দাও-ই না। ওইটিই বা বাকি থাকে কেন? আর আমি এ সংসারে থাকব না। আজই বাপের বাড়ী চলে যাব।" উত্তেজিত স্বরে বিপিন জবাব দেয়, "তাই যাও। তোমার মত বউ এ সংসারে থাকার চেয়ে না থাকা অনেক ভাল। আর কোনদিনও এ মুখো হয়ো না।"

সেইদিনই বিকেলে সৌদামিনী শিশুপুত্র দুটির হাত ধরে বাপের বাড়ী চলে গেল। আর বিজু অসুখ বাঁধিয়ে বসল শ্যামচাঁদের শোকে। অনেকদিন পরে সেদিন সন্ধ্যায় বিপিন ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক টানছিল। গল্‌ গল্‌ করে বেরোনা ধোঁয়ায় তার ভেতরের চিন্তাগুলো অনেকটা হালকা মনে হচ্ছিল। পূবের আকাশে পূর্ণিমার বড় গোল চাঁদ উঠেছে। আজ পূর্ণিমা, বিপিনের মনে ছিল না। আর কি করেই বা থাকবে। এখন তো আর লক্ষ্মী নেই। সে যখন ছিল, এই রাতটা তারা কত আনন্দেই না কাটাত।

ঘরের ভেতর কম্বল মুড়ি দিয়ে বিজু শুয়েছিল। ছেলের জন্য বিপিনের পিতৃহৃদয় ব্যথায় টন টন করে ওঠে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বলে, বেচারা,

শ্যামচাঁদের শোকে অসুখই বাঁধিয়ে বসল। কে জানে কোন অঘটন না ঘটে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায় "হে ঠাকুর ওকে ভাল করে দাও দয়াময়। ও আমার লক্ষ্মীর সন্তান। ওর প্রতি অবিচার কোর না প্রভু।"

দিন দশ বারো কেটে গেল। বিজুর অবস্থার উন্নতি তো দূরের কথা আরও অবনতি হয়ে চলেছে। স্থানীয় ডাক্তার শেষে হাল ছেড়ে বলেছেন,- কোলকাতার ডাক্তার দিয়ে দেখাতে হবে। তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। কথা শুনে বিপিনের কপালে হাত পড়েছে। এখানকার খরচ যাহোক করে চালাচ্ছিল। কিন্তু কোলকাতার ডাক্তারের খরচ যোগাবে কেমন করে? সে যে অনেক টাকার দরকার।

ছেলের শিয়রে বিপিন রাতদিন নিদ্রাহীন অভুক্ত শরীরে বসে থাকে। আর ভগবানকে ডাকে, "প্রভু উপায় বলে দাও। আমার বুক থেকে বিজুকে ছিনিয়ে নিয়ো না।" বিজু শুধু বিকারের ঘোরে এক কথা বার বার বলে, "বাবা, আমার শ্যামচাঁদকে এনে দাও। আমি নাহলে আর বাঁচব না।" কখনও স্বপ্ন ঘোরে বলে, ঐ দেখ, আমায় শ্যামচাঁদ ডাকছে। আমি যাই। ওকে কতদিন দেখিনি। শ্যামচাঁদ দাঁড়া, আমি যাব।" ছেলের দশায় বিপিন শুধু হাপুস নয়নে কাঁদে আর ভগবানকে আকুল স্বরে ডাকে।

ঠিক পনের দিনের মাথায় হঠাৎ সৌদামিনী এসে হাজির। বিপিন দেখেও কোন কথা বললে না। তার তখন অর্দ্ধমৃত অবস্থা। সদুই কথা বলে, 'বিজুর নাকি খুব অসুখ।" বিপিন শুধু সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়, "হ্যাঁ"। —ডাক্তার দেখান হচ্ছে তো, খবরটা আমায় জানাওনি কেন? ভেবেছিলে আমি আসবনা? ভেবেছিলে বুঝি পিতৃত্ব নিয়ে তুমি একা গর্ব করবে? আর আমার মাতৃত্ব বৃথা যাবে।" সৌদামিনীর এ স্বরে বিপিন চমকে ওঠে। এ কি সেই সদু! আবার তাকে বিস্মিত করে সৌদামিনী বলে ওঠে, "টাকাকড়ির জন্যে নিশ্চয় খুব টানাটানি হচ্ছে? আমার গয়নাগুলো কি করতে আছে? ওগুলো তুমি বিক্রী করে দাও না? যত টাকা লাগে লাগুক। বিজুকে সারিয়ে তোল। নারীত্বকে তো আমি হেরে যেতে দিতে পারি না।" বিপিন মুগ্ধ হয়ে সৌদামিনীর কাছে এসে দাঁড়ায়। "এসব কি তুমি সত্যি বলছ সদু।" —"হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আর বিজুকে বল তার শ্যামচাঁদ আবার আসবে।"

বিপিন সহসা সদুকে বুকে টেনে নেয়। পরম তৃপ্তিতে বলে, "আঃ, তুমি আমায় বাঁচালে সদু। তুমি আমার লক্ষ্মী প্রতিমা।" সৌদামিনী বিপিনের বুকে মাথা রেখে আনন্দে কেঁদে ফেলে।

হকারী

সূর্য্যকান্ত নন্দী

তখনও বেলা আছে। সন্ধ্যে হতে বেশ দেরী। কিন্তু মেঘের সবুর সয় না। বজ্রনিনাদ কণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে মিশ্‌মিশে কালো চুলের মতো একরাশ মেঘ দলবদ্ধ অবস্থায় মিছিলের সারিতে ক্ষণিকের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লো। ঘুট ঘুটে অন্ধকার সারা আকাশকে ঘিরে ফেললো। অকালে দেখা দিল রাত্রের অস্পষ্ট আঁধার। আর সেই সঙ্গে সাইক্লোন-প্রায়। দমকা হাওয়া। বৃষ্টির ধারা ক্ষিপ্ত, উন্মাদ।

বসন্তের পর গ্রীষ্মের মাঝে বর্ষার পূর্বাভাষের অযাচিত এই বৃষ্টিতে ভিজতে সন্দীপের ভালোই লাগছিল। যেমন ভালো লাগতো বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে স্কুল থেকে ফেরার সময়। বগলের মাঝ দিয়ে পিঠের উপর বই রাখার ব্যাগ থাকতো। ব্যাগ ঝোলাতে ঝোলাতে প্রথম বর্ষাধারায় ভিজতে ভিজতে ছুটতে ছুটতে সানন্দে সে বাড়ী ফিরত। তারপর বাড়ী পৌঁছলে অবশ্য বাবার বকুনি ছিল। তবু সে বৃষ্টিতে ভিজতে ভালোবাসতো।

আজও ভালবাসে। কিন্তু আজ তার পিঠে বই রাখার ব্যাগ নেই, আছে মশলা মুড়ির টিন। তাকে আর বাবার বকুনি শুনতে হয় না। আজ সে ছাত্র নয়, হকার। রোজগার করতে হয়, সংসার চালাতে হয়।

সংসার ছোট্ট হলেও আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী। সে জন্য তার মা লোকের বাড়ীতে ঝি-এর কাজ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সন্দীপ মানা করেছে।

সংসারে তিনজন। সে, মা আর এক ছোট ভাই। ভাইটার নাম দীপক। ক্লাস সিক্স-এ পড়ে। ভাইকে মানুষ করার ইচ্ছা প্রবল। নিজে তো অর্ধ মূর্খ। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্ব চলতে চলতে বাবার মৃত্যু হয়। আর পড়া হয়নি। সেই শেষ। তদ্দিন থেকে ঘরের অভাব

অনটন মেটাতে তাকে হকারীর কাজ. নিতে হয়েছে। আর সেই দিন থেকে তার বাসনা দীপুকে মানুষ করতে হবে।

আসার সময় দীপু বলেছিল একটা কলম নিয়ে যেতে, কয়েকদিন ধরে বায়না ধরেছে অবশ্য। কিন্তু এ ক'দিন সন্দীপ পয়সার অভাবে কিনতে পারে নি। আজ কিনেছে। চারটার গাড়ীতে খদ্দের বেশী ছিল। বোধহয় কোথাও সভা-সমাবেশ রয়েছে। দূর-দূরান্ত থেকে তাই উদ্বিগ্ন শ্রোতারা বিনে পয়সার মামা গাড়ীতে এসে ভীড় করেছে। তার সব মশলা মুড়ি বিক্রী হয়ে গেছে।

আজ তার সমস্ত বাসনা তিলে তিলে পূর্ণ হয়েছে। ভাই-এর কলম, নিজের দোকানের জিনিসপত্র, মায়ের ওষুধ······

ক'দিন ধরে মায়ের জ্বরটা বেড়েছে। মাকে ওষুধ কিনে খাওয়াতে পারেনি। সারাদিনে যা রোজগার হয় তাতে কোন রকমে সবাইর খোরাকী জোটে, ওষুধ-পত্রাদি কিনতে পয়সা কুলোয় না।

দম্‌কা হাওয়ার সাথে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো একবার। বৃষ্টিতে এতক্ষণ ভেজার পর তার একটু শীত-শীত করছে। এখন অবশ্য বৃষ্টি একেবারেই ধরেছে। কিন্তু হাওয়া মাঝে মাঝে দম্‌কা দিয়ে উঠছে।

ছেলেবেলায় মা বলতো, 'বৃষ্টিতে ভিজবি না, জ্বর হবে।'

সন্দীপ বলতো. 'হোক জ্বর, তবে তো আমি বিছানায় ক'দিন আরামসে ঘুমোব।

এখন ওর জ্বর-টর হয় না। বৃষ্টিতে ভিজলেও না, রোদে ঘুরলেও না।··· কিন্তু এখন যদি ওর একদিন জ্বর হয় তবে তার সংসারের সবাইকে উপোস করে থাকতে হবে—তা সে জানে।

আয়ের টাকা থেকে বাঁচাতে পারে না। জমাতে পারে না। একটা চাকরী-বাকরী থাকলেও...কিন্তু তাকে চাকরী কেই বা দেবে? হকারী জীবনই তার শ্রেয় পথ।

দারুন হট্টগোলে সন্দীপ সচেতন হয়ে ওঠে। গুলি-গোলা বোমা বাজির শব্দ কানে আসছে। সামনে অনেক লোক ছুটে পালাচ্ছে। পেছন থেকে কয়েকজন। সবাই বিপন্ন! আর্তনাদ চীৎকার! সবাই যেন আগে পালাতে চায়।

সন্দীপ কিছুই বুঝতে পারে না। কেমন যেন হকচকিয়ে যায়। এহেন বিপর্যস্ত স্থান থেকে সেও পালাতে চায়। কিন্তু বিপদটা কি? কোথায় পালাবে? কোন দিকে? যেদিকে লোক ছুটছে সেইদিকে সেও ছুটতে সুরু করলো।

কিন্তু পেছনের বিপদ তাকে রেহাই দিল না। পিস্তলের একটা গুলি এসে লাগলো তার পায়ে। অত্যাচারী তার গতিরোধ করতে চাইছে। কিন্তু সন্দীপ পরাজয় স্বীকার করবেনা তার কাছে। অস্পষ্ট আর্তনাদ একটা, তারপর আবার চললো। ছুটছে, বস্তির সেই ছোট্ট ঘরটিতে যাবে বলে। ওখানে তাকে পৌছুতেই হবে। তার এখনও অনেক কাজ বাকী। সংসারের মধ্যে তাকে ফিরে যেতে হবেই।

নাঃ, বিধাতা বিমুখ। নতি স্বীকার অবশ্যম্ভাবী। রাস্তার মাঝে তার সুশ্রী দেহটা ক্রমশ এলিয়ে পড়লো। হৃদয় থেকে তার সন্ধির পতাকা উড়তে সুরু করলো। লাল তাজা রক্ত কালো পিচের রাস্তায় বইছে।

রাস্তার উপরে গড়াগড়ি খাচ্ছে সন্দীপের হাত থেকে ফসকে যাওয়া একটি চমৎকার ফাউন্টেন পেন আর মায়ের জন্য কেনা ওষুধ।

নবমী নিশি

মৃণাল চক্রবর্তী

অসহায় মানুষগুলো বৎসরান্তে পুনরায় আনন্দের জোয়ারে 'নাও' ভাসিয়েছে। সবাই উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে ধরণীর চারিকোণে দৃষ্টিটাকে আলতো বাধা মুক্ত করে দেয়।

কিন্তু, কিসের এ বিরহ জ্বালা?

অনন্ত জিজ্ঞাসায় মন-কলসি উপচে পড়ে।

কেন? বর্ষার শেষ পরিণতি যে—। ও—তাও ভাল।

বর্ষার বিদায় লগ্ন প্রকৃতির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। তাই বিরহজ্বালায় গোমড়ামুখো হয়ে অশ্রু বিসর্জন করছে। তারই ফাঁকে নবীন শরৎ ফিক্ করে হেসে উঠে বিদ্রুপাত্মক দৃষ্টি দিয়ে বর্ষাকে 'ফেয়ার ওয়েল' জানাচ্ছে। যেন ছনিয়ার মানুষগুলোর সংগে হাত বাড়িয়ে সখ্যতা জমাতে ব্যস্ত।

—আর কেন? এবার আমার সংগে তোমরাও হাস না? তাহলে বেশ মজা হবে। না—না—থামো। একটু সবুর করো আর কয়েক দিন বাদেই আমি আসছি।

বর্ষা চলে গেল।

চিরাচরিত প্রথানুযায়ী শরৎ এসে স্থান দখল করলো। উজ্জ্বল নীল নভোমণ্ডল। শিশির সিক্ত সোণালী রোদ। মাঠের মালারাশীতে সবুজের কেয়ারী। ধরিত্রীব উদ্যানে রং বাহার প্রজাপতির সমারোহ আর মানুষের মন সমুদ্রে আনন্দ জোয়ার।

কবি আবৃত্তি করলো;—

"আজিকে তোমার মধুর মুরতি
দেখিনু শারদ প্রভাতে।"

সংগে এসে খবর দিলো দেবী শারদের আগমন বার্তা। একতারায় তান তুলে বাউল গাইলো,—

"উঠো উঠো মা মেনকা
আর না ঘুমাও—
দ্বারে এলো উমা তোমার
তারে লইয়া যাও॥"

সবাই যখন খুশীর সায়রে অবগাহনে রত—ছায়া তখন একা বসে। কয়েক ঘণ্টা,—মাত্র কয়েক ঘণ্টার মামলায় ছায়ার জীবনের সমস্ত আমোদ, আহ্লাদ, শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। নিভে গেছে পথ চলবার আলোটুকু। মৃতপ্রায় ছায়া এখন সে-ই একটি দিনের অপেক্ষাতে। একটা বছর পেরিয়ে গেলো—

পথের দিকে চোখ পড়লেই চেঁচিয়ে ডাকতে ইচ্ছে করে ছায়ার। ওরে শোন খাসনে—শোন। কিন্তু হায় রে! কে শোনে কার কথা!

*　　*　　*

স্বামীহারা জীবনেও সে একটু সুখানুভব করেছিল। যখন পড়শীরা তার চোখের মণিকে কোলে দিয়েছিল। যেদিন তাদের সুখের নীড়ে কালের মোক্ষম ঢেউটি আছড়ে প'ড়ে সারা সংসারটাকে ভেঙ্গে রেণু রেণু ক'রে দিয়েছিল—ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অনেক কষ্টে গড়া তার নীড়টাকে—

সেদিন পাড়ার সৌদামিনী পিসী অতনুকে কোলে দিয়ে বলেছিল,—কেন বাছা তোর তো সবই রয়েছে। এটার মুখের দিকে চেয়ে ত্যাক্ দেকি—সব পাবি। স-ব পাবি। ঘর, সংসার, আশা আহ্লাদ সব পাবি।

সত্যিই সেদিন অতনুর মুখপানে চেয়ে হৃদয়ের দাবাগ্নি প্রশমিত হয়েছিল। সুখ পেয়েছিল ছায়া। তারপর কতদিন হয়েছে অতিবাহিত। এসেছে মাস। মাস পেরিয়ে এসেছে বছর। ঠিক যেন ওর বাপের আদল পেয়েছে অতনু। অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে। অতনুর মাঝেই স্বামীর প্রতিকৃতি খুঁজে পায় ছায়া।

ভালই চলছিল দিন। নেমে এসেছিল মা ও ছেলের ছোট্ট সংসারটিতে শান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপ। তথাপি মাঝে মাঝে হৃদয়ের ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়।

পূজো—পূজো—পূজো—

দেখতে দেখতেই এক রকম পূজো চলে এলো। পূজো মণ্ডপে বেজে উঠলো ঢাক-ঢোল-কাড়া-নাকাড়া। আর শানাই-এর সুদূর প্রসারী মূর্চ্ছনা। একে একে ষষ্ঠী গেলো, সপ্তমী গেলো, গেলো অষ্টমী, এলো নবমীর সকাল। এক সময় জনস্রোতের মধ্য দিয়ে দুপুর গড়িয়ে এলো বিকেল।

অতনু খেলা ছেড়ে মার কাছে আসে। কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আবদারের সুরে বলে—মাগো—।

ছেলের কপালে ওষ্ঠদ্বয় চেপে ধরে ছায়া। উত্তর দেয়—কি বাবা।

—আমি ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি!

—ওমা সে কি কথা! হাতে ধুলো! পায়ে ধুলো! এই অবস্থায় যাবি? ছিঃ বাবা—লোকে নিন্দে করবে যে। চল, হাত, পা মুছে দিই—বাবু সেজে যেয়ো কেমন?

ছেলেকে মনের মত করে সাজালো ছায়া। গালে চুমু এঁকে দিয়ে বললো—দেরী করিসনে যেন। কারুর সংগে আবার খুনোখুনি করবি নে?

ঘাড় নেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল অতনু। পেছন পেছন এগিয়ে গেলো ছায়া। চিৎকার পেড়ে বললো—রাত করিসনে কে-ম-ন—অতনু ততোক্ষণে আওতার বাইরে।

নবমীর চাঁদকে অংকে নিয়ে নাবলো নবমীনিশি।

রাতে মা ও ছেলেতে ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ শব্দে চমকে উঠে ছায়া। ঘুম টুটে যায়। অতনু মেঝের ওপর প'ড়ে ছট্‌ফট্ করছে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠে ছায়া।

অতনু—অতনু—বাবা আমার—কি হ'লো? —ওরে অতনু!

কিন্তু অতনু তখন চুপসে গেছে। কোন কুলকিনারা না পেয়ে ছুটে যায় সোদুপিসীর কাছে।

একটু বাদেই সৌদামিনীসহ দিশেহারা ছায়া ফিরে আসে।

লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোতে একবার দেখেই আর্তনাদ ক'রে উঠলো সৌদামিনী —ওমা—এ যে ঊলাউঠা গো—ও বাবা গো—কি হবে গো—

শর্ব্বরীর শেষভাগে দুই রমনীর সম্মিলীত আর্তনাদ ধ্বনি ক্রমশঃ অন্তরীক্ষের পথে ছুটে চললো। পাড়ার সকলে জেগে ওঠে। পাশের বাড়ীর নিমাই চুপ করে থাকতে না পেরে ছুটে আসে। এ অবস্থায় বিলম্ব মানে বিপদ ভেবেই ডাক্তারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলো।

ডাক্তার যখন এলো রজনী তখন ভোর। দেহটার স্পন্দন থেমে গেছে। অসাড়ে পড়ে আছে অতনু। নাড়ী পরীক্ষা করতে গিয়েই চমকে ওঠে ডাক্তার। মুখে কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারেন না।

—ও মা গো·········

আছড়ে পড়লো ছায়া। মাথা খুঁড়তে লাগলো। এ তুমি কি করলে মা। কি এমন পাপ করেছিলাম—যার জন্য তুমি আমার ধনকে কেড়ে নিলে।

সৌদামিনী নিঃশ্চুপ। কানাই এক পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে। সান্ত্বনা দেবার ভাষা কোথায়! কেঁদে চলেছে ছায়া।

গবাক্ষের সরু গলি দিয়ে ভোরের নিশানা জেগেছে। পূজোমণ্ডপে বিদায় রাগিণী ধরেছে শানাই।

বাউল গেয়ে চলেছে—

"নবমী নিশিরে
তোর কোন দয়া নাইরে
তোর কোন দয়া নাই।
এতো ক'রে সাধিলাম
তবু হইলি ভোর॥"

ভোরের গোধূলিতে কোকিলটা উঠোনের সজনে গাছটার শাখায় ডেকে চলেছে—কুহু—কুহু—কু—হু———

ওয়েসিস

শেখ গোলাম মইনুদ্দিন

এখন কেমন লাগছে? ঠিক কত দিন যে কামালের সঙ্গে দেখা হয়নি বলতে পারবনা, বোধহয় বছর চারেক হবে। আমি জানি এতদিন পরে ও কেন এসেছে।

বললাম, ভাল নয়,। এর থেকে সংক্ষেপে উত্তর দিতে পারলে দিতাম। সকাল থেকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে ঐ কথাটাই বলছি। অবাক হলেও কিন্তু কেউ কিছু বলেনা, সবাই আমাকে করুণা করতে চায়, এমনকি আব্বাসও যার সঙ্গে একদিন—থাক ও সব পুরোনো কথা তুলে লাভ নেই।

কি ভাবছ এত? ভয়ের কিছু নেই। ডাক্তারবাবুতো বলেছেন অপারেশন করলে ভাল হয়ে যাবে।

বেশ কিছুক্ষণ আবোল-তাবোল বকার পর কামাল চলে গেল, যাবার সময় আসল কথাটা বলে গেছে। ওর টাকাটা যেন পাঠিয়ে দিয়ে আমি ঋণ মুক্ত হই। বলা যায় না কি হবে, শেষকালে ঋণ রয়ে যাবে।

আজকে যাঁরাই আমাকে দেখতে এসেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের ওরকম দু-একটা আসল কথা ছিল। আশ্চর্য হইনি। হাট মাত্রেই বেচা কেনা হয়। জীবনের এই হাটেই বা পাওনা গণ্ডা কেউ ছাড়বে কেন?

একটা ধাঁধার কথা মনে পড়ল, দুনিয়াটা কার বশ? সত্যি, কথাটা এতদিনে হাড়ে হাড়ে বুঝছি।

আমার ভাগ্নী ফরিদা এসে বলল, মামা তোমার মাউথ অরগানটা আমাকে দিয়ে যেও। তুমি না থাকলে অন্য কেউ নিয়ে নেবে।

সবাই চায় আমার অবর্তমানে আমার জিনিষগুলো দখল করতে। সত্যিই

তো, আমি যদি না ফিরি তাহলে তো জিনিষগুলো কেউ না কেউ নেবে?" তার থেকে নিজে থেকে বিলিয়ে দিলে সবাই খুশী হবে।

নিতে অবশ্য কেউ কেউ আপত্তি করল, কি এমন হয়েছে যে তুই ভাল হবি না? হ্যাঁ তবে যে কদিন তুই থাকবি না জিনিষগুলি আমাদের কাছে গচ্ছিত থাক। ফিরে এলে নিয়ে নিস্।

মনে মনে হাসলাম। একবার নিলে কেউ কি আর ফেরত দেয়। কত ওজর দেখাবে, ভেঙ্গে গেছে, হারিয়ে গেছে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তখনও জানতাম না যে আমার জন্য এখনও অনেক কিছু অপেক্ষা করছে।

বারান্দা থেকে আব্বা-মার কথা শুনতে পেলাম। আব্বাজান মাকে বলছেন, এখনও তুমি ভেবো দেখো। দু হাজার টাকা ছেলেখেলা নয়, আমি বলি কিনা নিমাইবাবু যেমন দেখছেন দেখুন। আর তাছাড়া আমার ঐ টাকা দিলে দোকান যদি ফেল করে, তাহলে ছেলেমেয়ে নিয়ে পথে বসতে হবে।

মা বললেন, না ও নার্সিং হোমে ভর্ত্তি হোক। তাছাড়া ও ভাল হলে ওর মাইনেতে আমাদের চলে যাবে। আর জানো তো রফিক সাহেবের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে আমাদের অবস্থা ফিরে যাবে।

আব্বাজান গম্ভীরভাবে বললেন, কিন্তু ও যদি না ভাল হয় তাহলে?

উঃ! আমার দুচোখ পানিতে ভরে গেল। আমাকে টাকার সঙ্গে ওজন করছে আমার আব্বা, মা, যাদের আমি কত ভক্তি করি, ভালবাসি।

পরদিন মাকে ডেকে বললাম, নার্সিং হোমে আমি ভর্ত্তি হব না।

মা বললেন, সে কিরে, ভাল হবি কি করে?

বললাম, কেউ যখন চায় না আমি ভাল হই তখন আমার মরাই ভালো।

মা কেঁদে উঠলেন, আমরা কেন চাইব না? আমরা কি তোর দুশমন?

পাড়ার অনেক লোক এলো বোঝাতে। সবাই ভাবল আমার ভয় লাগছে অপারেশনের জন্য। সবাই আশ্বাস দিল ভয়ের কোনো কারণ নেই। হাজী সাহেব চাচা এলেন। যাঁর সঙ্গে মানুষ চাঁদে যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে আমার ঝগড়া হয়েছিল। সবাই বোঝালেন। কিন্তু আমি কারো কথা শুনলাম না।

তারপরদিন যন্ত্রণাটা বাড়ল। ভেতরটা সব জ্বলে যাচ্ছে। বুঝলাম দিন ঘনিয়ে আসছে। স্মৃতির পাতা উল্টে গেলাম। সাতাশ বছরের জীবনে কি করেছি। দু'একটা দেনাও আছে। ইস্কুব কসাই দশটা টাকা পাবে।

ঠিক করলাম—কাল ডেকে দিয়ে দেবো। সবাইর কাছে মাফ চাইতে হবে, কখন কি হয় বলা যায় না।

আশ্চর্য, পরদিনই ইসুব এল। সে কিছু বলার আগেই বললাম, তোমার ঋণ শোধ করলে আমার মুক্তি। এই নাও টাকা।

ইসুব বলল, আপনি ভাল হয়ে গেলে টাকাটা দেবেন। টাকা চাইতে আমি আসিনি। আমি গিয়েছিলুম মেদিনীপুরে এক পীরসাহেবের কাছে। খুব ভালো লোক। আপনার কথা তাঁকে বললাম। উনি পানি পড়া দিয়েছেন, এই নিন, বলেছেন আপনি ভালো হয়ে যাবেন।

আনন্দে আমার চোখ দুটো ভরে উঠলো। সত্যিই আমি ভালো হয়ে যাব। অন্তত এই একটা লোকের জন্য আমাকে ভাল হতেই হবে।

মাকে ডেকে বললাম—ব্যবস্থা করো। নার্সিং হোমে আমি কালকেই যাব।

কবর

অতুল দাস

স্টিমার থেকে নেমে কোন কেরায়া নৌকা দেখতে পেল না জলিল। পেল না ওর পথে ফেরার কোন সংগীও। এদিকে অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। ঝোপে ঝোপে জোনাকী জ্বলছে থেকে থেকে। ফাগুন ছোঁয়ায় ঝিঁঝি পোকারা গানে মেতে উঠেছে।

আঁকাবাঁকা খাল তার পার ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে নারকেল, সুপারী, আম, জাম, শিমূল, পলাশ, গাব গাছ আর ঝোঁপ জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে আঁকাবাঁকা পথ। ঘুটঘুটে অন্ধকারে সবে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে যেন। একা একা যেতে হবে চার মাইল পথ। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে জলিলের।

—নিজের কথা ভেবে নিজেই আশ্চর্য্য হচ্ছে জলিল। এই তো মাত্র মাস

তিনেক আগে যখন মুক্তিবাহিনীতে ছিলো তখন এই ঘুটঘুটে অন্ধকার, ঘন পাতার গাছপালা ঝোপ জঙ্গল ছিল সারাক্ষণের সাথী। হয়তো কোথাও শত্রু সৈন্যের জন্য ওৎ পেতে আছে। তখন পাশেই কোন খাদে পাকসৈন্যের আদিম বর্বরতার নিদর্শন স্তূপীকৃত নরকঙ্কাল বা গলিত শব নিয়ে শেয়াল কুকুরের টানাটানি। তখন এ সবের ভয় ছিল না। ভয়ের কথা ভাববার সময় ছিলনা। ছিল শুধু পাক হানাদারদের বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করবার অদম্য কামনা—বাসনা—সাধনা। আর এখন এই পথে হাঁটতে তার ভয় করে। হাতে টর্চ থাকতেও জ্বালাতে সাহস হয় না। কে জানে যদি একটা নরকঙ্কাল চোখে পড়ে ভয়ে আর এগোতে পারবে না তাহলে। কোন দিকে তাকায় না। সামনে চোখ নামিয়ে কয়েক হাতের মধ্যে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রেখে পথ চলে,—কে জানে যদি কোন জলাভূমিতে প্রেতাগ্নি জ্বলে ওঠে। অদূরে একটা গাব গাছের ঘন পাতায় আড়ালে ছোটবেলার কুপ-পাখী নামে সেই অলক্ষণে পাখীটা কুপ-কুপ করে ডেকে উঠল। অন্য সময় হলে সে বলতো, 'দূর হ পোড়ামুখী, দূর হ...তোর মুখে ঝাঁটা মারি। কিন্তু এখন ও সব কিছু বলতে পারলো না।—কে জানে গলা পেয়ে কোন অশরীরী আত্মা এই বন জঙ্গলের অন্ধকার পথে তার আর্বিভাব টের পায়। পিছু নিয়ে কেঁদে কেঁদে শুধোয়—তুমি বলতে পার, আমার খোকা কোথায় বা আমার স্বামী কোথায়?...এমনি আরো কত কিছু? কি জবাব দেবে তাদের?

এখনতো আর চাষবাস নেই। করিম চাচা হয়তো নৌকা নিয়ে নামছেন খালে। ঘাটে থাকলে নিশ্চয়ই পার করে দেবেন। প্রয়োজন হলে আর আধ মাইল পথও এগিয়ে দেবেন। তা হলে খালের এ পারের এই ভয়ের পথ দিয়ে আরো বাড়তি তিন-পোয়া মাইল হেঁটে পুল পেরিয়ে আবার অতটা পিছু হেঁটে বাড়ি যেতে হবে না।

করিম চাচার বাড়ির সোজা এসে থামল জলিল। ওপরের দিকে টর্চের আলো ফেলল।

কৈ খালের ঘাটে নৌকা তো চোখে পড়ছে না! তবে কি সব ঘুমিয়ে পড়েছে? রাত কত হল?

টর্চের আলোয় হাতের ঘড়ি দেখল জলিল। ন'টা পার হয়ে গেছে। আঁকাবাঁকা খালের পার দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে চলল জলিল।

নিজের বাড়ির খালের ঘাটের সোজাসুজি এসে থামল 'জলিল। খালের' ঘাটের বাঁয়ে হিজলগাছের তলায় নৌকার ছইয়ের মধ্যে একটা লালচে আলো জলছে টিম টিম করে। এক বুক সাহস পেল জলিল। মনটা ঝরঝরে হয়ে উঠল। একটা লম্বা স্বস্তির শ্বাস ফেলল।

—ওপারে কে আছ? ...কেরায়া মাঝি নাকি?

ওপার থেকে উত্তর এল, আমি করিম মাঝি। ··· পার অইবার চাও নাকি?

—আমি জলিল করিম চাচা।

জলিলের কথা শুনে করিম চাচার বুক আনন্দে ভরে উঠল। আমাদের জলিল আইছে! করিম চাচা ছইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে লগি থেকে নৌকার দড়ি খুলে দিল, তুই আইছ জলিল!

আনন্দে দুঃখে করিম চাচার মুখে আর কোন ভাষা এল না। কাঁচাপাকা ধূসর দাড়িতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আবেগ চোখে দেখল জলিলকে।

—করিম চাচা, আপুনি এখানে? নৌকার ভিতর আর কে?

আমার মাইয়া ময়না।

—ম-য়-না! জলিল হাতড়াচ্ছিল যেন।

—তুমি দ্যাখছস্ সাত বছরের ময়নাকে। এখন ওর বয়স সতের বছর। তুমি ওরে চিনবা কেমন কইরা। উইঠা আইস্, সব কমু, সব শোনবা।

জোয়ারের জল খালের পার ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে যাচ্ছে উত্তরে। করিম চাচার নৌকা এসে মিশে গেল খালের পাবের সঙ্গে। জলিল পা বাড়িয়ে নৌকায় দিল। উঠে বসল ডানে-বাঁয়ে ময়না আর করিমচাচাকে রেখে।

ময়না অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছিল জলিলকে। দেখছিল জলিলও। ময়নাকে দশ বছরের আগে দেখা সেই সাত বছরের ময়না: চেক শাড়ি গাছ কোমর বেঁধে পরা। হাতে মোটা মোটা লাল-নীল-সবুজ রঙের বেমানান কাঁচের চুড়ি, কানে রূপোর ফুল, নাকে রূপোর নাকছবি।

জলিলও খাল পারাপারের ফাঁকটুকুতে সাত বছরের ময়নাকে এই নৌকার ময়নার সঙ্গে একবার মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করল: অনেক খুঁটে দেখলে চেহারায় মুখের একটু আদল পাওয়া যায়। আর কিছুতেই যেন মিল দেখতে পাচ্ছে না জলিল! —হাতের সেই মোটা লাল-নীল-সবুজ কাঁচের

চুড়ির জায়গায় আকাশ-নীল রঙের কাঁচের চিক্কণ চুড়ি ওর শ্যামলা গোল কব্জি দুটোয় অদ্ভুত মানান সই, নাকের নাকচাবি অনুপস্থিত, কানে রূপোর ফুলের জায়গায় ডায়মণ্ড-কাটা সরু সোনার ইয়ার রিং, পরনে কচি কলাপাতা রঙের খোলে রূপালী পাড়ের শাড়ি।

করিমচাচার হাড্ডিসার কব্জি দুটোয় এই মুহূর্তে যে কি পরিমাণ শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে—তা বোঝা যায় তার বৈঠার টানে। নৌকা দুলছে, ছইয়ের সঙ্গে ঝুলনো হ্যারিকেনটা দুলছে। দুলছে ময়নার কানের ইয়ার রিং।

করিমচাচা নৌকো পারে এনে পুঁতে-রাখা লগিটায় দড়ি বেঁধে দিল।

লগিতে নৌকা বেঁধে করিমচাচা হাতের কোষ ভরে খালের জল তুলে চোখে মুখে দিল। কাঁধের গামছা নিয়ে হাত-মুখ মুছে হাঁটু ভেঙ্গে বসল।

খালের পারে নল-খাগড়ায় কেয়াঝোপে জোয়ারের জল কাটছে কল কল করে। কেয়াফুলের গন্ধ ভুর ভুর করছে হিজলতলার বাতাসে।

জলিল অধীর হয়ে উঠল। বলল "করিমচাচা, কই বললেন না তো কিছু?"

করিমচাচা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, "জলিল, ক্ষ্যামা করবার পারবা না?—আমি যে একটা অন্যায় কইরা ফ্যালাইছি।"

করিমচাচার মত শান্ত সরল সাদাসিধে মানুষ কি অন্যায় করতে পারল? "বলল, আপনি কি অন্যায় করতে পারেন।"

করিমচাচা উঠে ছইয়ের ভেতর থেকে হ্যারিকেনটা বাইরে এনে ওপরে হিজলতলার দিকে তুলে ধরল। বলল, ঐ দেখ তোমাদের জায়গায় তোমার চাচীর কবর। ···তোমাদের এক টুকরা জমি নষ্ট কইরা ফ্যালাইছি, জলিল, আমার উপায় আছিলো না। তোমার চাচী মুক্তিবাহিনীর ছাওয়ালগোরে খাবার পৌছাইতে গিয়া পাকহানাদারের গুলিতে... ।"

একটু থেমে হাতের পিঠে চোখের জল মুছে করিমচাচা আবার বলল, "তোমার চাচীর লাসটা নৌকায় লইয়া আইলাম। শকুন কুকুরে খাইবো—মন মানল না। পানিতে ফ্যালাইয়া দিমু—মাছে ঠোকরাইয়া খাইবো, জোয়ার ভাঁটায় ওঠা-নামা করবো, পইচা পইচা পানীতে মিইশা যাইবো—মন মানল না। আমার গো ওদিকে তখন পাকহানাদারগো ঘোরাঘুরি। কারগো জমিতে কবর দেবো ··শেষ পর্যন্ত্য তোমার গো এই জমিটুকু নষ্ট করলাম।"

"জলিল, তুমি ময়নাকে ছোট্ট ভাবছস্...তারপর থিকা ও ওর মামুর বাড়ি থাইকা লেখাপড়া করতো। পাঁচটা না সাতটা না একটা সন্তান। ভাবলাম লেখাপড়া অইবো না...ওর মামুর বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। —এবার তো দশক্লাশ পার অইবার কথা ছিলো।

তোমার চাচী চইলা গেল, চাইর দিকে গোলা-গুলি হত্যা-অত্যাচার—ময়নারে আর ওর মামুর বাড়ি রাখবার মন চাইল না। নিজের ধারে নৌকায় লইয়া আইলাম, কয়মাস ধইরা বাপ-মাইয়ায় এই হিজলতলায় নৌকায় আছি। রাতদিন পার করছি মুক্তিবাহিনীর ছাওয়ালগোরে। খালের উপর দিগের পোলডা আবার ভাইঙ্গা দেছে দুষমনেরা।"

"জলিল, আমার একটা কথা রাখবার পারবা...তোমার চাচীর কবরটা যেন চইষা না ফ্যালাও। আমার ইচ্ছা জীবনের শেষ কয়ডাদিন এই হিজলতলায় নৌকায় নোকায় কবরটার ধারে পার কইরা দেই। ...আর ময়নার একটা ব্যবস্থা ...।"

ছইয়ের ভিতর থেকে ময়না মার্জিত নরম গলায় বাধা দিল, "আব্বা, তুমি থামো।"

—করিমচাচাকে আমার আব্বার কথা জিজ্ঞাসা করতেই করিমচাচা হতভম্ব হয়ে গেলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন—আমার আব্বা বেঁচে নেই। পাকদস্যুরা আমাদের ঘর দুয়ার জ্বালিয়ে দিয়েছে। আব্বাকে কোথায় নিয়ে গুলি করে মেরেছে কেউ জানে না। সংসারে আমার একমাত্র আব্বার জন্য মনটা হু হু করে কেঁদে উঠল। চোখে বাঁধ ভাঙ্গা পানি নামল।

করিমচাচা আর ময়না অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল জলিলের দিকে। চোখের দৃষ্টিতে তাদের সম-বেদনা।

করিমচার দিকে চোখ তুলল জলিল। ধীর শান্ত-কণ্ঠে কথা বলল, "করিমচাচা, যদি আপনার আপত্তি না থাকে আমি ময়নাকে শাদি কবব।"

করিমচাচাচা আনন্দে কেঁদে ফেলল। বলল "আপত্তি...কি যে বল জলিল। ...কিন্তু তোমরা তালুকদার, আমি তোমার গো চাষী—তোমার গো চাষীর মাইয়া ময়না—এ কি তোমার মানায় জলিল!"

ছইয়ের ভিতর ময়না মাথা নীচু করল। কাপড়ের আঁচল খুঁটতে-লাগল।

করিমচাচা কাঁধের গামছা দিয়ে আনন্দাশ্রু মুছল, ময়নার দিকে চেয়ে বলল, ময়না, তুই… ?

ময়না বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিল জলিলের দিকে। কিছু বলতে গিয়ে মুখটা তুলেও বলতে পারল না। মাথাটা হাঁটুর উপর রেখে—দৃষ্টিটাও গোপন করল।

খাঁচার পাখী

শ্রীনিতাইচন্দ্র রায়

কালীঘাটে আদি গংগার তীরে পিতার শ্রাদ্ধাদি শেষে মায়া ছোট ভাই-বোন দুটিকে নিয়ে বাসায় ফিরছিল। ওদের দুজনাকে একটা সিটে বসিয়ে দিয়ে সৌভাগ্যক্রমে স্বল্প ভীড় বাসটাতে নিজের জন্য একটা সীটের আশায় এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। পাশ থেকে ডাবল সিটে একা বসে থাকা যুবকটি বলে উঠল,—"এখানে বসতে পারেন—" বলে সে উঠে দাঁড়াল।

মায়া তাকাল ছেলেটির দিকে।

অবিন্যস্ত রুক্ষচুল, চোখ দুটো বড় বড়, স্বপ্নালু; ভাবুক বীট্‌লদের গোষ্ঠীর কেউ একজন বলেই মনে হয়।

মায়া বলল—"আপনিও তো বসতে পারেন।" জানলার দিকটা দেখাল সে।

দূরত্ব বজায় রেখে সপ্রতিভাবেই বসল ছেলেটি।

মায়া খুঁটিয়ে দেখবার জন্য আবার তাকাল ছেলেটির দিকে। ভবঘুরে চেহারা, রাজপুত্র যদিও কোনদিন দেখেনি মায়া, তবে মনে হোল সত্যিই রাজপুত্রের মত। বোতাম খোলা—জামার বুকের উপরকার তিলটার উপর দৃষ্টি আটকে গেল মায়ার। ঠিক যেন তাপসের মত।

মায়ার কৌতুহলের আঁচ পেয়ে ছেলেটি এবার তার বড় বড় চোখ দুটো তুলে ধরল মায়ার মুখের উপর। এক মুহূর্ত ভ্রূ কোঁচকাল সে। তারপর

বলল—"আমার অনাবশ্যক কৌতূহলের জন্য যদি কিছু মনে না করেন তো জিজ্ঞাসা করি—আপনি কি ভৈরব মিত্রের মেয়ে মায়া? আমি তাপস।"

তাপস! স্মৃতির অতলান্ত অনুভূতি উদ্বেল হয়ে উঠল মায়ার। লক্ষ কোটি যুগের মাধ্যাকর্ষণের ভার কাটিয়ে হঠাৎ যেন পরশমনির ছোঁয়ায় লঘু চপল হয়ে উঠল। স্বপ্নের পাখায় ভর করে ওদের বিখ্যাত কিমু গোয়ালার গলিটার সকল নোংরা আবর্জনার অনেক উর্দ্ধে বিচরণ করে সে শহরতলীর নিজের নীড়ে পৌছাল। তাপসের ত্বরিৎক্ষিপ্র সাহচর্যে সম্পাদন করল সে পিতার শ্রাদ্ধান্তিক সামাজিক অনুষ্ঠানটুকু।

জীবনে হাজারো ঘা খাওয়া ঘর পোড়া ভৈরববাবু অনেক বিবেচনা করে অবসর গ্রহনান্তিক প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকায় ক্রমবর্ধমান শহরতলীতে মাথা গোঁজবার নিজের এই ঠাঁইটুকু করে নিয়েছিলেন। চাকুরীর ভাবনা শেষ হওয়ায় অনেক পরিকল্পনা, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক ভাবনা তিনি ভেবেছিলেন—কিন্তু কিছু করে উঠবার আগেই ওপারের খেয়া এসে হাজির হোল।

রান্নাঘরের সবকাজ শেষে উত্তরের বারান্দার ফালিটুকু পেরিয়ে অনেক ভয় ভাবনা, অনেক আশায় দুরুদুরু বক্ষে নিজের পড়বার ঘরে নিঃসঙ্গ তাপসের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল মায়া। সেই ছোট্টচুর্ণি নদী-তীরের দিনগুলো থেকেই কেন যেন মায়ার একা একা তাপসের সামনে আসতে ভয় করে। কেন—তা সে জানে না। কিন্তু সংগে একটা কেউ থাকলে এই ভাবটা তার হয় না। তাপস তার সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করেনি। করেনি বলেই কি তার নিজের এই ভয়, নিজের উপর এই অবিশ্বাস? সে বুঝতে পারে না।

চেয়ারের পিঠে মাথা এলিয়ে কি যেন ভাবছিল তাপস। মায়া আসতে চোখ খুলল,—বলল—'বোস'।

অবাধ্য ছেলের মত উদ্ধত ভঙ্গীতে বলতে ইচ্ছা করল মায়ার—'বসব না. চলে যাব,' কিন্তু সুবোধ বালিকার মতই বসে পড়ল।

বলতে গেলে প্রায় একযুগ পরে দেখা—কত কি বলার, কত কিছু শোনার ছিল। কিন্তু তা তো আর হচ্ছে না। লাষ্ট ডাউনটা সম্ভবতঃ এখনও ধরা যাবে। কিন্তু কেন চলে যেতে চায়? তাপসও তাকে ভয় করছে নাকি?

তার তন্বী ষোড়শীর তপস্যা আজ প্রাক্ তিরিশের উত্তর ফাল্গুনে সারদা বিদ্যা-পীঠের সংযমী বড়দি মনির স্নিগ্ধ তনুশ্রীতে কি সাফল্য অর্জন করতে চলেছে ?

সাহস সঞ্চয় করল মায়া। চোখ রাখল সরাসরি, তাপসের চোখে। মৃদু হাসল তাপস। কি সুন্দর, কি মিষ্টি! আবার অভিভূত হোল মায়া, স্মৃতির গহনে সেই সোনালী দিনগুলো গুনগুনিয়ে উঠল।

তাপস মৃদুকণ্ঠে ডাকল মায়াকে, যেন স্বপনপারের দেশ থেকে এক ঝলক মিঠে সুর ভেসে এল মায়ার কানে, নিষ্পলক চোখ তুলে তাকাল সে। তাপস জিজ্ঞাসা করল—"আলোটা কি চোখে লাগছে? তাহলে নিভিয়ে দিই। বাইরে এখন চাঁদের আলো।"

মাথা নাড়ল মায়া। হাত বাড়িয়ে সুইচটা অফ্ করে দিল তাপস। একরাশ কালো চিন্তা খ্যাপা কুকুরের মত খুবলে খুবলে অবশ করে দিতে চাইল মায়ার বুক, ঠোঁট, নিতম্ব—সারা দেহমন। সে তার গাঁয়ের ছোট্ট নদী চুর্ণির মত ছুটে পালিয়ে যেতে চাইল এক প্রবল সর্বপ্লাবী আবর্তের গ্রাস থেকে। কিন্তু খোলা জানলা দিয়ে আসা একঝলক চাঁদের আলোর মায়াবী-বৃত্তের মধ্যে তাপসের পাগল করা স্নিগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইল সে।

"জান মায়া, আমার বাবা, মা, দিদির ওপর অকথ্য অত্যাচার করে নৃশংস ভাবে খুন করলেও আমাকে কেন যে চলে যেতে দিয়েছিল সেই হিংস্র নেকড়েগুলো আজও বুঝতে পারি না,"—যদি কান্নার আরেক নাম হাসি হয়, তবে হেসেই বলল তাপস।

নিথর হয়ে বসে রইল মায়া।

"বাউণ্ডুলে স্বভাবের জন্যই হোক, কিংবা বাঁচা মরা সমান অর্থ জেনেই হোক, তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি সেইদিন থেকেই সারাভারত ভ্রমণ করে বেরিয়েছি। কিসের টানে, কেন, স্পষ্ট কোন বোধ ছিল না।" যেন আপন মনে একটা করুণ গাথা আবৃত্তি করতে লাগল তাপস—"শেষে একদিন হঠাৎ আলাপ হোল স্বামী ভূমানন্দজীর সংগে, তাকে সব খুলে বললাম। বলতে গেলে শিষ্যত্বই গ্রহণ করলাম। শেষ কটাদিনে বারবার তোমার কথা, ভৈরব কাকার কথা মনে পড়ত—কি ভেবে কোলকাতা চলে এলাম স্বামিজীর সম্মতি নিয়ে।"

আধো আলো ছায়ায় একটা উষ্ণ হাত বাড়িয়ে তাপসের হাতটাকে কোলে টেনে নিতে ইচ্ছা করল মায়ার।

কি যেন ভাবতে ভাবতে তাপস বলে—"ভেবেছিলাম, জীবনের মত আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, আর কোনদিন দেখা হবে না, কিন্তু দৈবক্রমে দেখা হলো। দেখলাম—তুমি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ—সুখ সমৃদ্ধি সুনাম পেয়েছ, এখন তুমি সারদা বিদ্যাপীঠের বড় দিদিমণি—আমার মত ভবঘুরে নও। আমার স্থিতি নেই, ধুমকেতুর মতো শুধুই ছুটে বেড়াতে হবে জীবন ভোর। অবশ্য ক্ষোভও নেই সেজন্যে। মনকে প্রস্তুত করে নিয়েছি যেদিন থেকে স্বামীজীর পায়ে নিজেকে সমর্পণ করেছি। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় তাপস। চলি, ভবিষ্যতে আর হয়তো দেখা হবে না।

তাহলে আজই বা হলো কেন? মায়া চোখ তোলে।

এটুকুর প্রয়োজন ছিলো মায়া। এটুকু না হলে হয়ত মুক্তিও পেতাম না।

মায়ার তৃষিত হৃদয় আর্তনাদ করে ওঠে। বলে না যেতে দেবো না। দুহাত বাড়িয়ে টেনে নিতে যায় তাপসকে।

ছিঃ ছেলেমানুষী করোনা মায়া। আমি স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি।

হাত টেনে নেয় সে। কি প্রয়োজন ছিলো অতীতের এই পৃষ্ঠাকে সামনে মেলে ধরার? নিজের হাতে গড়া সোনার খাঁচাটিকে নিয়ে তো সে সুখীই ছিলো, কেন তবে বনের পাখী এসে অসীমের স্বপ্ন দেখিয়ে আবার দূরে চলে যাবে? উন্মত্ত আবেগে পিষ্ট দলিত মথিত করতে চায় সে তাপসকে, কিন্তু তাপস সরে দাড়িয়েছে তার অসীম ব্যক্তিত্ব নিয়ে।

আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে বসে থাকে মায়া। তার মনে হয়—মোটা শিক দিয়ে তৈরী একটা সোনার খাঁচার মধ্যে সে যেন একটি ময়না হয়ে ছটফট করছে এক বনের পাখীর জন্যে। কিন্তু কিছুতেই খাঁচার বাধা পেরিয়ে সে পৌঁছতে পারছেনা। আপ্রাণ চেষ্টা করছে তবু পারছে না। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে উঠে দাঁড়ায়।

কাকজ্যোৎস্না

দীপ্তিপ্রকাশ ভট্টাচার্য

সুতপার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন সীতেশবাবু। বাঁধা মাইনের টিউশনি করেন না তিনি, কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় এ ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। বছর তিনেক আগে এক পরিচিত ব্যক্তির চিঠি নিয়ে এই মেয়েটি তাঁর কাছে আসে। চিঠিতে বন্ধু মেয়েটির পড়াশোনা এবং থাকার ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ জানিয়ে ছিল। কারণ মেয়েটি কলকাতায় নতুন।

সীতেশবাবু যখন ক্লাসে তন্ময় হয়ে যান পড়ানোর মধ্যে, মুগ্ধ দৃষ্টিতে একজন যে দিনের পর দিন সেই শান্ত সৌম্যমূর্তি এঁকে গেছে মনের পটে তার খবর সীতেশবাবু কোনদিনই রাখেননি। সুতপার উপর বিশেষ দৃষ্টি থাকায় মাঝে মাঝে দু'একটি কথা যে তাঁকে শুনতে হয়নি, তা নয়, তবে তিনি তা কোনদিনই আমল দেননি। অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে চাপা গুঞ্জনও লক্ষ্য করেছেন আর মনে মনে হেসেছেন। সীতেশবাবু নিজের কানের দুপাশে রুপালী রেখাগুলো সযত্নে বেছে বেছে বার করে রাখেন যাতে সহজেই ধরা পড়ে তিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পৌঁছে গেছেন।

সুতপার পড়ায় অমনোযোগিতা দেখে তিনি কিছুটা বিরক্তভাবেই বললেন, তোমায় আজকাল প্রায়ই খুব অন্যমনস্ক দেখি, কলেজে তো নয়ই বাড়ীতেও পড়াশোনা করো না, কী ব্যাপার! পড়তে না ভালো লাগে ছেড়ে দিয়ে ঘরকন্নার কাজে মন দাও। টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সুতপা। সস্নেহে তিনি সুতপার মাথায় হাত দিয়ে নাড়া দিলেন, "আরে কাঁদছো কেন"? সুতপার সামনে একটা চেয়ার টেনে তিনি বসলেন। "আমি আর কলেজ যাবো না।" চমকে উঠলেন সীতেশবাবু, কলেজ যাবে না, মানে? সুতপা হাতে লেখা একটি কাগজ

বার করে দিল। মুহুর্ত্তে চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো সীতেশবাবুর। কিন্তু মিথ্যের কাছে তুমি আত্মসমর্পণ করবে? সুতপা মাটির দিকে দৃষ্টি নামায়। "সবটা তো আর মিথ্যে নয়। আমি আর মিশনারী আশ্রমে ফিরে যাবো না।" অবাক দৃষ্টিতে সীতেশবাবু সুতপার দিকে চেয়ে থাকেন। "আমি এখানেই থাকবো; আর কোথাও যাবো না, আপনি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না, বলুন।" সীতেশবাবু তড়িতাহতের মত চমকে ওঠেন, চেয়ে দেখো আমার দিকে, জরাজীর্ণ অতীতকে আঁকড়ে ধরে তোমার দৃপ্ত বর্তমানকে বিসর্জন দিও না। তোমার ভুল যেদিন ভাঙবে সেদিন হয়ত মাশুল দেবারও সুযোগ পাবে না।" জিজ্ঞেস করেন, "তোমার বয়স কত?"

আস্তে আস্তে কান্না ভেজা গলায় উত্তর দেয় সুতপা, "কুড়ি"। নিজের বুকে হাত রেখে সীতেশবাবু বলে ওঠেন, "পঁয়তাল্লিশ"। টেনে টেনে উচ্চারণ করেন কথাগুলি। তারপর বেছে বেছে মাথা থেকে পাকা চুলগুলি আলাদা করে দেখান তাকে। সুতপা, সৌম্য চেহারাটা আব একবার মনে মনে ধ্যান কবে নেয়। খুব স্তিমিত কণ্ঠে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলে, "তবুও"। চোখ বুজেই মাথা গুঁজে দেয় সীতেশবাবুব লোমশ বুকের মাঝে।

তোমার বাবা, মা, কোথায় থাকেন?" ফ্যাকাশে হয়ে গেল সুতপা। সীতেশবাবু এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তবে থাক।"

সুতপা স্থির হয়ে বসলো, "না আজ আপনাকে কিছুই গোপন করবো না, তাহলে হয়ত সারা জীবনই জ্বলতে হবে। আমার মা দার্জিলিঙএ একটা স্কুলে মাষ্টারী করতেন। বিমাতার সংগে বনিবনা না হওয়ায় তাঁর সংগে সমস্ত সংশ্রব ছেদ করে একা চলে এসেছিলেন এখানে। সেই স্বচ্ছন্দ-গতি জীবনে বাধা পড়ল যেদিন সেখানে একজন সরকারী অফিসার বদলী হয়ে এলেন। তাদের বাসা ছিল কাছাকাছিই। সঙ্গীহীন জীবনে দু'জনে দুজনকে খুঁজে নিতে দেরী করেননি। তারপর স্বাভাবিক গতিতে একান্ত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন পরস্পরকে। আর সেই সাগর মন্থনে প্রথমেই উঠেছিল এই গরল। যেদিন তিনি শুনলেন, সেইদিনই রাত্রে বাবার অসুখের অজুহাতে চলে যান কলকাতা। কিন্তু প্রবল বন্যা আর বিপর্যয়ে পথেই আটকে পড়েন। মিশনারী আশ্রমের স্বেচ্ছাসেবকরা তার অচেতন দেহটা মিশনে এনে জমা দেয়। তিনি আমাকে জন্ম দিয়েই সমস্ত

যন্ত্রণা, সব গঞ্জনার বাইরে চলে যান। আমাকে মানুষ করার ভার খৃষ্টান মিশনারীরাই তুলে নেন।

উদাস দৃষ্টিতে নিশি পাওয়া মানুষের মত চারিদিক যেন হাতড়াতে থাকেন। তাঁর অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে যায় সুতপা। সীতেশবাবু দু'হাতে মুখ ঢেকে মন্ত্রমুগ্ধের মত বলে ওঠেন, "সুতপা, আজ তুমি যাও।" "কখন আমার কথার উত্তর পাব বলুন, আমি আর থাকতে পারছিনা। চীৎকার করে ওঠেন সীতেশবাবু, "সুতপা তুমি যাও, তুমি যাও।" চোখ আঁচলে মুছতে মুছতে সুতপা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

সারা রাত ঘুমোতে পারেনা সুতপা। ভোর হতে না হতেই ছুটে এসেছে সীতেশবাবুর বাসায়। ঘর বন্ধ, তালা লাগানো। অনেক কষ্টে দু'হাতে ঘরের দরজা ধরে নিজেকে সামলালো সে। পায়ের শব্দ পেয়ে বাড়ীওলার ছেলে একটা চাবি নিয়ে নেমে এলো ওপর থেকে। বললো—"আপনি, সুতপা দেবী? এই চাবিটা সীতেশবাবু রেখে গেছেন আপনাকে দেবার জন্যে। টেবিলের ওপর আপনার একটা চিঠি আছে।"

"তিনি কোথায় গেছেন?"

উত্তর পেলো—"জানিনা কাল রাত্রের ট্রেনে কোথায় গেছেন। আপনার জন্যে এই চাবিটা আর একটা খাম দিয়ে গেছেন কলেজে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। এই নিন চাবি।"

সমস্ত ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে সুতপার। ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিল একটা খাম। থরথর করে কাঁপতে লাগলো তার হাত। খুলে ফেললো চিঠিটা।

কল্যাণীয়াসু,

প্রথমবার সুযোগ পাইনি তাই দ্বিতীয়বার শুধরে নিচ্ছি। তুমি যে ঘটনার কথা আমাকে বলেছ তাতে কিছু ত্রুটি ছিল সংশোধন করে নিয়ো।

আজ ইচ্ছা করেই পালালুম। শুধু তোমার কাছ হতে নয়, পারলে পৃথিবীর কাছ থেকেই বিদায় নিতুম। বিশ বছর আগে যা খুঁজে বেড়িয়েছি আজ তা হাতের কাছে পেয়েও ধরে রাখবার শক্তি নেই, তাই পালাচ্ছি তোমার কাছ থেকে, নিজের কাছ থেকে।

আশীর্বাদ জেনো।
সীতেশ মুখোপাধ্যায়

চিঠি শেষ করে পাগলের মত হাতড়াতে থাকে সুতপা টেবিলে রাখা অন্য কাগজগুলি। ছিঁড়ে ফেললো আর একটি খাম। মেঝেতে ঠক করে একটা ইংরেজী ছাপাফর্ম পড়ে গেল। তুলে নিল সুতপা, কনিকা সেনের সাথে রেজিষ্ট্রী বিয়ের একটি সার্টিফিকেট। কাঁপা কাঁপা হাতে খুলে ফেললো খবরের কাগজে মোড়া একটি বাঁধানো ফটো। ডায়রীর মধ্যে রাখা তার মায়ের বহুবার দেখা ফটোটার পাশে একজন সৌম্যশান্ত প্রশান্ত মূর্তি। সীতেশবাবুর পঁচিশ বছর বয়সের চেহারাটা চিনতে সুতপার একটুও অসুবিধে হোল না।

দু'হাতে সজোরে বুকের মাঝে ফটোটা চেপে ধরে সুতপা অব্যক্ত বেদনায় গুমরে গুমরে মরতে লাগলো।

অলকার বিয়ে

গৌরীশঙ্কর দাস

অলকা সেনকে আপনারা কেউ চেনেন না, আমি চিনি। লম্বা-পাতলা ছিপছিপে দোহারা চেহারা। রঙ্ মোটামুটি ফর্সা। পরনে কালপেড়ে সাদা শিফনের শাড়ী। গলায় সরু বিছার সঙ্গে লাগানো একটি ছোট্ট লকেট। ডান হাতের মনিবন্ধে একটি লেডিজ ঘড়ি। পায়ে হিল তোলা জুতো। হাতে মাঝারী সাইজের একটি ভ্যানিটি ব্যাগ। এই হলো আমাদের অফিসের লেডি টাইপিষ্ট মিস্ অলকা সেনের মোটামুটি একটি পরিচয় পত্র। মোটামুটি বললুম এই কারণে, পরিবর্তন আমার আছে, আপনার আছে, সুতরাং মাঝে মধ্যে মিস্ অলকা সেনের-ও যে থাকবে, এ আর বিচিত্র কি?

যাই হোক্ মিস্ অলকা সেন এবার মিসেস হতে চলেছেন এবং আজই। একটু অবাক হবারই কথা। কারন গতকাল পর্য্যন্ত যার সঙ্গে এক টেবিলে

কাজ করেছি, ঘুনাক্ষরেও জানতে পারিনি তার বিয়ে! মনে মনে ভাবি, অদ্ভুত চাপা মেয়ে তো। অবশ্য আমার এই ক্ষোভের একটি বিশেষ কারন আছে। সেটি হলো দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাকেও ওর পাশাপাশি বসে টাইপ রাইটারে ঝঙ্কার তুলতে হয়। সুতরাং সে হিসেবে আমরা পরস্পরের সমব্যাথী বৈকি। এবং সমব্যাথীর কাছে মনের কথা খুলে বলা আমাদের কেমন যেন একটা অভ্যেস। অবশ্য অলকা আমাকে অনেক বলেছে এবং আমিও বলেছি। তবু বিয়ের মতো 'একটা সিরিয়াস' ব্যাপারে ও একেবারে চুপ থাকবে, এটা কেমন আশ্চর্য্য মনে হলো। যাই হোক, ওর বাসার ঝি মোক্ষদার মারফৎ পাঠানো ওর ক্ষুদ্র চিরকুটটা আমার সব কৌতূহলের নিরসন ঘটলো। অলকা লিখেছে,

"অরুণ,

আজ আমার বিয়ে। কালরাত্রে সুকোমল এসেছে। আজ ভোরে চলে যাবে। তাই যাবার আগে শুভ কাজটা সেরে নিতে চায়। তুমি তো সবই জানো। আমি আপত্তি করিনি। তুমি এসো কিন্তু, না এলে রাগ করবো। ইতি—

অলকা

এরপর নিশ্চয়ই আর আর অবিশ্বাস করা চলে না। সুতরাং যাবার জন্যে তৈরী হই। ঘড়িটাব দিকে তাকিয়ে দেখি বেলা প্রায় নটা বাজে। তাহোক কারণ রবিবার, ছুটির দিন। সুতরাং নিশ্চিন্তে বাথরুমে স্নান করতে করতে ভাবি, মিস্ অলকা সেন এবার তাহলে সত্যি সত্যিই মিসেস অলকা চ্যাটার্জী হলেন। হ্যাঁ—সুকোমলের পিতৃদত্ত পদবী চ্যাটার্জী। অবশ্য সুকোমলের কথা ও আমাকে আগেই বলেছিল। এক গ্রামেই ওদের বাড়ী। সেই সূত্রে ছোট বেলায় আলাপ এবং বন্ধুত্ব। যদিও পরে সেটা মন দেওয়া নেওয়া অবধি গড়িয়েছিল, কিন্তু নানা কারণে, মালাবদলটা আর হয়ে ওঠেনি। কারণ— অভিভাবকদের রক্ত চক্ষু। আজ আর সে সব কোন সমস্যাই নেই। সুকোমল ডাক্তারী পাশ করেছে আর অলকাও স্বোপার্জিতা নারী। সুতরাং দুজনেই— অভিভাবকদের রক্তচক্ষুকে অবহেলা করার মতো সাহস অর্জন করেছে।

স্নান সেরে জামা কাপড় বদলিয়ে অতঃপর অলকার বাসায় যাবার জন্যে পা বাড়াই। কিন্তু ওকে আমার ড্রইংরুমে হঠাৎ বিষণ্ণ মুখে বসে থাকতে দেখে

থমকে দাঁড়াই একটু লজ্জিত ভাবেই বলে, ছিঃ ছিঃ, কিছু মনে করো না অলকা, একটু দেরী হয়ে গেল। কিন্তু তার জন্যে তোমাকে ছুটে আসতে হবে কেন?"

"তার আর দরকার হবে না, অরুণ। সুকোমল চলে গেছে, সেই খবরটাই দিতে এলুম।" থমথমে গলায় জবাব দিল অলকা।

"চলে গেছে!" আমার কণ্ঠে বিস্ময় ঝরে পড়লো, "সে কী!"

"হ্যাঁ, এই দেখ।" বলে আমার হাতে সুকোমলের লেখা একটি চিরকুট তুলে দিলো অলকা। তাতে লেখা,

"অলকা—

কয়েকটা টাকার জন্যে আমার বিলেত যাওয়া হচ্ছিল না। তাই এগুলো নিয়ে যাচ্ছি। কিছু মনে করো না। যদি কোন দিন ফিরি, সুদে আসলে ফেরত দেব। ইতি—

সুকোমল।"

আমি চিরকুটটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিতেই ও ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো। "জানো অরুণ, ও আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে তা, নিক্। তবু যাবার আগে —।" বুঝতে পারলুম—অলকার ব্যথাটা কোথায়? তবু সান্ত্বনা দিতে মন সায় দিলনা। শুধু মনে হলো, অলকা খুব বেঁচে গেছে। কিন্তু কেন মনে হলো—তা আমি নিজেই জানিনা।

———

ভালোবাসা কারে বলে

নীলিমা পাল

স্কুল থেকে ফেরার পথে সুরঞ্জন হাঁটতে হাঁটতে একা মেসে ফিরছিল হঠাৎ মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের সেই কটা লাইন। খুব আস্তে আস্তে ও আবৃত্তি করতে লাগল—

"স্বর্গ আর স্বর্গ বলে যদি মনে নাহি লাগে
দূর বনতলে যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগ সম,
তবু চলে যেতে হবে সুখশূন্য সেই স্বর্গ ধামে।"

মনে পড়ল সুরঞ্জনের কলেজ সোশ্যালের সেই অভিনয়ের সন্ধ্যা—কচ ও দেবযানীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল ও আর জয়িতা। আর সেই সন্ধ্যার পরে কচ ও দেবযানীর মত ওরাও পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল, চেয়েছিল পরস্পরকে কাছে পেতে।

আশ্চর্য—সুরঞ্জনের এখন মনে হচ্ছে, আর সেই ভেবে অবাক হচ্ছে যে কলেজের সেই বুদ্ধিদীপ্ত ঝকঝকে ছেলে সুরঞ্জন সেন এরকম একটা অবাস্তব চিন্তা করেছিলো কেন? —আর জয়িতার কথা ভেবেও এখন আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে সুরঞ্জন, জয়িতা—সেকেণ্ড ইয়ারের জয়িতা চৌধুরী, দৃষ্টিতে যার এত গভীরতা সেই বা কেন ভাবল না যে ডায়াসের উপর কচ ও দেবযানীর অভিনয় যতটা মানায় মাটির পৃথিবীতে ততটা মানায় না। ওরা সেদিন ভাবেনি যে কাব্য করলে অবসরগুলো বেশ কেটে যায় কিন্তু বাস্তবের স্থূল চাহিদা মেটাতে গেলে কাব্যের ডাঁটাগুলো কখন যেন শুকিয়ে সুতো হয়ে যায়। তার ও জয়িতার যেমন হয়েছে। আজ ওরা দুজনেই বেঁচে আছে—কিন্তু আছে কয়েক শো মাইলের ব্যবধানে। আর সেই বাঁচাটাও কি "শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারনের গ্লানি নয়"—অন্তত সুরঞ্জনের দিক থেকে তো বটেই।

পর মুহূর্তেই ওর মনে পড়ে গেল "It's better to have love and lost

than never to have loved at all. আর ভাবলে কেন ওরা জীবনে মিলিত হতে পারলনা—ওদের মধ্যে তো তৃতীয় কেউ এসে বাধার সৃষ্টি করেনি? তবু দুটো সরল রেখার মতো কিছুটা পথ ওরা পাশাপাশি এসেছিল তারপর ওরা ভিন্নমুখী।

সুরঞ্জনের মেস বাড়ীটা বেশী দূরে নয়। এমনিতে তার আজ বেশী সময় লাগল এই পথটুকু পার হয়ে আসতে। স্কুল থেকে বেরোতেই আজ দেরী হয়েছে। তার ওপর ফেলে আসা জীবনের কয়েকটা দিন আজ ওর চিন্তাকে করেছে আচ্ছন্ন—এই অন্যমনস্কতা ওর গতিকে করেছে শ্লথ।

এলোমেলো ভাবনা ছেড়ে কাজের চিন্তায় এলো সুরঞ্জন। পা চালিয়ে হাঁটলে এখনও গিয়ে ও টুইশনিতে যেতে পারবে।

স্কুলের চাকরী—তার ওপর গোটাকয়েক টুইশনি। এই নিয়ে ব্যস্ত থাকে সুরঞ্জন, ভোলবার চেষ্টা করে অতীতের সেই দিনগুলিকে। কিন্তু ভুলতে চাওয়া আর ভুলে যাওয়া এক নয়। তাই মাঝে মাঝে ওর গলায় গুনগুনিয়ে ওঠে "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না সেই যে আমার নানা রংয়ের দিনগুলি।"

আর এক জায়গাতে কোয়ার্টারের বারান্দার বসে শ্যাওলা রংয়ের পশম দিয়ে জয়িতা একটা ফুল স্লীভ পুলওভার বুনছিল আর ভাবছিল কয়েক বছর আগে ও সুরঞ্জনকে ঠিক এই রকম একটা পুলওভার করে দিয়েছিল। শ্যাওলা রংটা সুরঞ্জনের আবার খুব প্রিয় ছিল কিনা।

রাহেলা

সামসুন নাহার ইসলাম

না শেষদিন পর্য্যন্ত কোন ঘটনা ঘটলোনা, নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হ'ল রাহেলার বিয়ে।

বসীর শুধু ভালোই বাসলো, সাহস তার যথেষ্ট ছিলো ঠিকই। ওপার বাঙ্গলাতে গিয়ে রাহেলাকে নিয়ে দিব্যি সুখে বিয়ে করে সংসার পাততে পারতো, শুধু পাঁচজনের কথাতে আজ এ ব্যর্থ ভালোবাসার বোঝা মাথা পেতে নিতে হলো। রাহেলা তো তাকে সত্যই ভালোবেসেছিলো, যদি তাই না হবে, লাজ, লজ্জা, ভয় ওর ত্যাগ করে ক্যানো চলে গ্যালো তার সাথে। ভুল হয়েছিলো কুসুমপুরে গিয়ে ওঠা। কে জানতো ওরা খোঁজ পেয়ে এসে ধরবে তাঁকেই যাঁর কথা সে ফেলতে পারবে না। খলিল মিয়াঁকে অমান্য করে এ্যামন সাধ্য তার ছিলোনা বলেই এ সুযোগ নিলে রাহেলার বাপ-চাচারা মিয়াঁ। ওকে ফিরে আসতে বলে পাঠান। আপনার লোক দিয়ে, কোর্টে ক্যানো? আমরা বাড়ীতেই বিয়ে দিবো, আল্লাহর কসম, ধুম ধাম করেই বিয়ে দিবো। বেচারা খলিল মিয়াঁ সরল মানুষ সরল বিশ্বাসে ওদেরকে আশ্বাস দিলেন, লোক পাঠিয়ে ফিরিয়ে আনলেন বসীর ও রাহেলাকে। হায়! কে জানতো এ্যামন বেইমানি করবে ওরা? বিয়ে তো দিতে রাজী হলই না উপরন্তু কেস দাখিল করলো থানাতে। বেচারা খলিল মিয়াঁও রেহাই পেলেন না, রেহাই পেলোনা তার বন্ধু যারা ছিলো, আজ বসীরের মনে এই প্রশ্নটাই বড়, যদি ফিরে না আসতাম তাহলে? তাহলে রাহেলাকে কে পেতো? কেসে তো করতে পারলোনা কিছু দশজনের বিচারে এই রায়কে মেনে নিতে হলো বসীরকে, রাহেলা এখনও নাবালিকা, মা বাপের মত ছাড়া তার বিয়ে হতে পারেনা, সতেরো বৎসরের রাহেলা আইনের চোখে নাবালিকা নিশ্চয়, কিন্তু তার ভালোবাসার

গভীরতা তো কেউ দেখলোনা, বসীর তো বরাবরই তাকে ভালবাসে, রাহেলাও তো ততধিক, বসীরের তো জানতে বাকি নাই গ্রাম্য রাজনীতিই আজ এভাবে ব্যর্থ করে দিলো তার ভালোবাসার স্বপ্নকে, দলীয় আক্রোশে ওরা রাহেলাকে ছিনিয়ে নিলো বসীরের কাছ হতে, তবু বসীর ধৈর্য্য ঠিক রেখেছে। তবে এ্যাকটা আশা ছিলো শেষ পর্যন্ত্য রাহেলাকে রাজী করাতে পারবে না ওরা এ বিয়েতে। না কোন ঘটনাই ঘটলো না বসীরের আশা মতো রাহেলার বিয়ে হয়ে গ্যালো এ্যাক বিবাহিত পুরুষের সাথে, কে য্যানো হয় সম্পর্কে রাহেলার ঐ লোকটা ? বৌ আছে ছেলেমেয়ে আছে, দয়া করে সে নাকি বিয়ে করলো রাহেলাকে, এই হচ্ছে রাহেলার উদ্ধার পর্ব্ব। বসীর নীরব বেদনায় মূক আজ।

রাহেলা জানে শেষ পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে মেনে নিলো এ বলিদানের তুল্য ব্যবস্থাকে।

বসীরের কাছে এ এ্যাক অবাক বিস্ময়।

হারানো আলো

শ্রীসলিল কুমার দত্ত

তোমরা কি দেখেছ তাকে ? সেই যে কাজলটানা ডাগর চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আলতারাঙা ঠোঁট দুটি নেড়ে গান গাইত ? দেখোনি ! আমি তো দিনের পর দিন তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। রাতের পর রাত কেটে যাচ্ছে অনিদ্রায়। ভোরের আলো ফোটার অনেক আগেই গিয়ে দাঁড়াচ্ছি ঐ গাছ তলাটায়। ভাবছি শিশির ভেজা শিউলি কুড়োতে যদি আসে— দেখবো তাকে। কখনো নদীর তীরে তীরে ঘুরে বেড়াচ্ছি— যদি আলতারাঙা পা দুটি ফেলে নদীতে আসে। কিন্তু না, কোথাও পাচ্ছি না। কোথায় গেলো !

রতন আর একা কোথাও যেতে দেয় না। সে চলে যাওয়ার পর এই রতনই আমার সব দেখাশোনা করছে। জ্যাঠা বলে ডাকে। কি মন্ত্রে যে বশ করেছে জানি না। সারাদিনই চোখে চোখে রেখেছে। একটু ফাঁক পেয়েই বেরিয়ে পড়ি। পা দুটোকে টানতে টানতে মাঠের কোমল ঘাসগুলোর ওপর গিয়ে বসি। অস্তগামী সূর্যের লাল আভা সারি সারি বলাকার সাদা পাখায় ঝিলমিল করছে। নীল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পাল তোলা নায়ের মতো মেঘগুলো ভেসে চলেছে। সকলেই আপন আপন ঘরে ফিরছে। শুধু আমিই একা। আমার ঘর নেই ঘরনী নেই।

জ্যাঠা— ও জ্যাঠা—।

চমকে উঠি। কে রে ? রতন !

হ্যাঁ। না বলে বেরিয়ে এসেছ বাড়ী থেকে, আর আমি চারিদিকে খুঁজে মরছি। কি কাণ্ড বল দেখি ! রাত হয়েছে, ফিরবে না ঘরে ?

ঘর ! আমার আবার ঘর কোথায় রে রতন ? সে যাওয়ার সময় ঘর তো ভেঙে দিয়ে গেছে। সে না এলে তো ঘর গড়া যাবে না ?

আবার বকতে শুরু করলে ? চল— ওঠো। হাত ধরে জোর করে দাঁড় করিয়ে দেয় রতন।

পা দুটোকে আবার টানতে টানতে এগিয়ে যায়। দেখ রতন, কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে। সে খুব ভালবাসতো এই চাঁদটাকে। চোখে চোখে তাকিয়ে থেকে প্রাণের সব কথা বলতে চাইতো। কিন্তু— কিন্তু সে কথা আমার প্রাণ অবধি পৌছতো না, ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেত। অবিচার করেছি, কিন্তু অভিযোগ করেনি সে। কোনদিনও না— ।

দূর থেকে ভেসে আসে সুরের রেশ। কে বাঁশি বাজাচ্ছে এই ভোরে? বাঁশি তো নয়—কান্না। অন্তরের সব ব্যথাটুকু নিঙড়ে নিয়ে সুরের রূপ দিয়ে পৌঁছে দিচ্ছে আকাশে বাতাসে। শ্রীমতীকে কাছে না পেয়ে কৃষ্ণের বাঁশিই বুঝি কাঁদছে। এ কান্না তো আমারও বুকে! আমার বাঁশির সুরও তো আকাশে বাতাসে দিক দিগন্তে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। এ কান্না তো— ।

জ্যাঠা— ও জ্যাঠা— ওঠো গো বেলা হয়ে গেলো।

স্বপ্নের রেশ গেলো মিলিয়ে। সুরের মূর্চ্ছনাও গেলো হারিয়ে। আবার কঠিন বাস্তবে ফিরে আসি।

* * *

রতন, ও কেরে? কাকে এনেছিস!

আমার ছোট মাসি।

ছোট মাসি! না না ঠিক করে বল। আমি যে তার সঙ্গে অ-নে-ক মিল দেখতে পাচ্ছি ওর! তুই কি এতোদিন লুকিয়ে রেখেছিলি আমার কাছ থেকে?

মেয়েটি হাসে খিলখিল করে। আমি সত্যিই ওর মাসি।

মাসি! সত্যিই মাসি? কিন্তু অনেক মিল তোমার সঙ্গে— ।

চোখের ভুল আপনার।

কে বললে ভুল। সেই লাল গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট কাজল কালো চোখ দুটিতে ভীরু চাউনি— এ কি চোখের ভুল!

হ্যাঁ। আপনি যাকে খুঁজছেন—আমি আমি তাকে এনে দিতে পারি।

পারো! সত্যি পারো?

সত্যি-সত্যি-সত্যি। এবার হলো তো?

আশ্চর্য ! আনো দেখি খুঁজে ।

কি দেবেন তাহলে ?

তুমি যা চাইবে ।

বেশ, তাহলে আসুন আমার সঙ্গে । যখন যা বলবো করতে হবে কিন্তু । একটুও না বলতে পারবেন না । মনে থাকবে তো ?

হ্যাঁ ।

আচ্ছা, আসুন আমার সঙ্গে— ঐ খোলা মাঠটায় গিয়ে বসি । আপনাকে গল্প শোনাব ।

বেশ চলো । আচ্ছা, তোমায় কি বলে ডাকবো ?

নীলা ।

নীলা কয়েকদিন মাত্র এসেছে অথচ তাতেই আমার কি অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে । আর তাকে খুঁজতে বেরুই না, স্বপ্নও দেখি না । তবে কি আমি তাকে ভুলে যাচ্ছি একটু একটু করে ! না না না—ওরে রতন— ।

রতন ঘুমিয়েছে, শুধু আমি জেগে । আসুন, আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই । শুয়ে পড়ুন, মাথায় হাত বুলিয়ে দিই ।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, ভোরে ঘুম ভাঙ্গতে দেখি আমার বুকের ওপর মাথাটা দিয়ে নীলা ঘুমোচ্ছে । তাকে নাড়া দিতেই সে উঠে বসে । চোখ দুটি লাল । বিস্মিত হয়ে বলি, সারারাত শুতে যাওনি, এই ভাবে বসে বসে— কেন এ কষ্ট করছো ?

'তাকে ধরব বলে' কথাটা কোন রকমে শেষ করেই নীলা ছুটে পালাতে যায় । আঁচলটা টেনে ধরি । তাকে ধরবে, না আমিই ধরব তাকে ?

নীলা হাসতে হাসতে সরে আসে আমার দিকে আঁচলটা সামলাবার চেষ্টা না করেই । ঘর ভরে ওঠে দু'জনের উচ্ছল হাসিতে । নতুন সূর্যের আলোর বন্যা আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা ম্লান আঁধারকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যায় ।

শুভদৃষ্টি

দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

পিসেমশাইয়েব অস্বাভাবিক গর্জন শুনিয়া ইন্দ্রনীল হতভম্ব হইয়া সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিল। পিসেমশাই অগ্নিশিখাকে লক্ষ্য করিয়া ভৎর্সনা করিতেছেন। অগ্নিশিখাব সহিত নিজের জীবনটাও জড়িত শুনিয়া ভিতরে পা বাড়ানো সম্ভব হইল না। সকালবেলার সমস্ত সৌন্দর্য্যটুকু তীব্রবসে তিক্ত হইযা গেল।

প্রথমে হঠাৎ বাগ হইলেও সে রাগ বেশীক্ষণ স্থাযী হইল না। বিবেচনা করিযা দেখিল স্ত্রীব সহিত তাহার নিজেব ব্যবহাবই এই ঘটনাব জন্য দায়ী। বিবাহিতা স্ত্রীকে কে কবে এমন কবিযা দূবে ঠেলিযা রাখে? দীর্ঘকাল এক বাড়ীতে বাস কবিয়া সে নিজেব স্ত্রীব দিকে কোনদিন ভাল করিয়া চাহিযাও দেখে নাই। তাহার আচরণ লোকেব চোখে অদ্ভুত ঠেকিবে বৈকি?

সত্যি কথা বলিতে স্ত্রীব কথা আজ যেন তাহাব প্রথম মনে পড়িল। 'আহা বেচারী' মনে মনে কথাটা উচ্চাবণ করিল। বাব বার মনে হইতে লাগিল কোথায কোন পল্লীপ্রান্তে ক্ষুদ্র বনফুলটি ফুটিয়াছিল, তাহাকে তুলিবার তাহার কি প্রয়োজন পড়িল। আর তুলিলই যদি তাহাকে পদদলিত করিবার অধিকার কে দিল। অনুশোচনাব কশাঘাতে প্রপীড়িত নিজেব বিবেকেব অন্তর্নিহিত বাণী তাহাব মনে অনুতপ্ত বেদনাবোধেব সহিত আত্মগ্লানি জাগাইয়া তুলিল।

বিবেক দংশনে জর্জরিত ইন্দ্রনীলের সহিত অকস্মাৎ অগ্নিশিখার দেখা হইয়া গেল। ইন্দ্রনীল চোখ ফিরাইয়া লইল না। অনিমেষ নেত্রদ্বয় অগ্নিশিখার আরক্তিম মুখের উপব নিবদ্ধ হইল। বিস্মিত হইল। বিবাহের পব লোকচক্ষে অনাদৃতা থাকিয়াও ক্ষুদ্র মুকুলটি কখন যৌবনেব ছোঁয়ায পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপে পরিণত হইয়াছে তাহা ইন্দ্রনীলের চোখে পড়ে নাই।

আজ তাই সে বিস্মিত, মুগ্ধ। গোধূলির আরক্ত আলোকে দিবা ও রাত্রি সন্ধিক্ষণে কোন শুভ মুহূর্তে ইন্দ্রনীলের কৌতুহলী দৃষ্টি যখন অন্তরের নির্মলতায় স্বচ্ছ বিস্ময় জড়িত কালো দুইটি চোখের উজ্জ্বল তারায় নিবদ্ধ হইল, তখনই যেন তাহাদের অসম্পূর্ণ শুভদৃষ্টি সম্পূর্ণ হইল।

অস্তগামী সূর্যের রাঙা আলোক ছটায় অগ্নিশিখার মুখমণ্ডলে অনুপম সৌহার্দ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছিল। ইন্দ্র নীলের সম্মুখে আসিয়া একবার চোখ তুলিয়া চাহিল। সে দৃষ্টিতে ছিল বিস্ময়। পর মুহূর্তে বিস্ময়ের মেঘ অপসারিত হইয়া তাহার অন্তর আনন্দের বন্যায় প্লাবিত হইল। স্বামীর অনুরাগ ভরা প্রাণ দৃষ্টিপাতে যেন নববধুর সরমরাগে তাহার সারা দেহমন রাঙা হইয়া কি একটা বিস্ময়ানন্দের পুলক সঞ্চারিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সকাল বেলার ঘটনাটিও মনে পড়িল। লজ্জিত হইয়া সে তাড়াতাড়ি ইন্দ্রনীলের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

নিজের ঘরে গিয়া অগ্নিশিখা এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিল। স্বামীর সেই সপ্রশংস বিস্মিত দৃষ্টির প্রকৃত অর্থবোধ করিতে না পারিয়া সে যেন মনের ভিতর কেমন একটা অজানা ভাবের স্পর্শে তাহার দেহমন অভিভূত ও ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল।

—'কি এমন ভাবছ বৌদি যে আমি এসে যতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, তুমি বুঝতেই পারলে না—' কথাটা বলল ইন্দ্রনীলের ছোট ভাই রজত।

অগ্নিশিখা অপ্রতিভ হইয়া সলজ্জভাবে বলিল, 'কি আর ভাবব ঠাকুর পো বোধহয় ঘুম এসে গিয়েছিল।'

সত্যি কথা বলিতে যে বিশেষ কিছুই ভাবে নাই। সে রাত্রে সে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না। অন্ধকার পক্ষে খোলা জানালার বাহিরে যে অগণ্য নক্ষত্র সারা আকাশের বুক জুড়িয়া জ্বলিতেছিল তাহাদেরই পানে চাহিয়া ইন্দ্রনীলের উজ্জ্বল আঁখিতারা দ্বয় নক্ষত্রের মতই তাহার অন্ধকার মনের আকাশে যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল।

হঠাৎ এতদিন বাদে মনের সেই বিচিত্র ভাবের আভাসে অগ্নিশিখা বিস্মিত হইল। রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত গানের ভাষায় বলা যাইতে পারে :—

"জীবনে যা চিরদিন
রয়ে গেছে আভাসে

প্রভাতের আলোকে যা
ফোটে নাই প্রকাশে,

জীবনের শেষ দানে
জীবনের শেষ গানে
হে দেবতা, তাই আজি
দিব তব সকাশে।"

কি সেই অদ্ভুত জিনিস, যার জন্য তার মন আজ এতো ব্যাকুল হয়ে উঠল। নিজের মনের সেই অস্ফুট ব্যাকুল চঞ্চল ধ্বনিকে সে নির্দয় পীড়নে প্রতিহত করিতে পারিল না। কি একটা অভাবের ব্যথায় সুখে বা দুঃখে স্তব্ধ হইয়া রইল।

ভাগ্যরত্ন

গিরিশচন্দ্র রায়বর্মণ

নবনী গ্রামের বিত্তবান সূর্যনারায়ণ বিনয় নম্রতার আদর্শে ম্রিয়মান। গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে তাহার সুখ্যাতির অন্ত নেই। কিন্তু সবার মুখে একটি কথা তিনি নিঃসন্তান।

আজ দশ বছর হোল তিনি সুতপার পাণিগ্রহণ করেছেন। অনেক বড় বড় ডাক্তার দেখিয়ে ও অনেক চিকিৎসা করে কোন ফল হয়নি।

ক্ষোভে দুঃখে সূর্যনারায়ণ একদিন স্থির করলেন তাঁর সমস্ত জমি ও বাড়ী বিক্রী করে দিয়ে তিনি কাশী চলে যাবেন।

সুতপার শত অনুরোধেও সূর্যনারায়ণ দোজবর হতে রাজী নন।

সমস্ত জমি ও বাড়ী বিক্রী করে তিনি কাশী যাবার জন্য তৈরী হতে লাগলেন। কাশী যাবার ঠিক তিনদিন আগে কলকাতা থেকে তাঁর বাল্য বন্ধুর একখানা চিঠি পেলেন।

বন্ধুবরেষু,

আমার একমাত্র সন্তান সমীরণ আগামী ১০ই এপ্রিল লণ্ডন থেকে ফিরে আসছে। আরও সুখবর যে সে কৃতিত্বের সঙ্গে গাইনোলজি (ডাক্তারী) পাস করেছে। সেই আনন্দের দিনে তোমরা যদি আস বিশেষ আনন্দিত হব। শুভেচ্ছান্তে—

তোমার বন্ধু

শিবনাথ

চিঠি পেয়ে সূর্যনারায়ণ স্থির করলেন কলকাতা হয়েই যাবেন। তাই নিউ কুচবিহার জংশনে কামরূপ এক্সপ্রেসে রিজার্ভেশন করে নিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে সূর্যনারায়ণ যাত্রা করলেন কলকাতার পথে। শিবনাথ বন্ধুকে পেয়ে খুব খুশী হলেন। বন্ধুর মুখে সব কথা শুনলেন, বললেন, 'সূর্য, তুমি যা করে ফেলেছ, তাকে আর ফেরানো যাবে না। সমীরণ আগামী কালই ফিরছে, তুমি যদি শেষবারের মত একবার চেষ্টা করে দেখতে আমি সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতাম।'

নির্দিষ্ট তারিখেই সমীরণ এসে গেল। সেদিন তার কোন কথা হোল না পরের দিন সমীরণ সূর্যনারায়ণের সব কথা শুনল, 'বলল, কলকাতার বড় বড় ডাক্তাররা যখন হার মেনে গেছে, তখন আমিও কোন ভরসা দিতে পারছি না। তবে এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখতে পারি এ কেসটা।

কলকাতার ডাক্তারদের পূর্ব রিপোর্ট দেখে ও সমীরণ নিজে পরীক্ষা করে এইটাই বুঝতে পারল যে সূর্যনারায়ণের মৃত বীর্যই সুতপার বন্ধ্যাত্বের কারণ।

সমীরণ আনন্দে যেন নেচে উঠল। মনে হোল কিছু সূত্র খুঁজে পেয়েছে।

সমীরণ চিন্তা করে দেখল ঔষধ প্রয়োগে সূর্যনারায়ণের মৃত বীর্যকে সতেজ করা যাবে না। এমন কি অন্যান্য ডাক্তাররাও এ পথে ব্যর্থ হয়ে গেছেন।

অবশেষে সমীরণ সুতপাকে তিনদিনের জন্য নার্সিং হোমে ভর্তি করিয়ে নিজের এক্সপেরিমেণ্টের বিধি প্রয়োগ করলেন।

দেড়মাস পরে সব পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ হলে দেখা গেল সুতপা গর্ভবতী। সূর্যনারায়ণ আজ চল্লিশের উর্দ্ধে। এই অভাবনীয় সাফল্যের জন্য তিনি আনন্দে আত্মহারা।

সময় গুণে সাত হাজার ষাট ঘণ্টার মুহূর্তে সুতপার কোলে জন্মগ্রহণ করল একটি পুত্র সন্তান। কলকাতার ডাক্তার মহলে সাড়া পড়ে গেল সমীরণের এই এক্সপেরিমেণ্ট সম্বন্ধে।

সংবাদ পত্রগুলোতে বড় বড় অক্ষরে ছাপানো হোল এই খবর— সমীরণের এই অভাবনীয় সাফল্যের কথা আজ সকলের মুখে।

বঙ্গীয় চিকিৎসক সমিতি কিন্তু সমীরণের এই সাফল্যকে সুনজরে দেখলেন না। তাঁরা তদন্ত শুরু করে দিলেন। প্রকৃতির আলো বাতাসের গুণে— তিনটে ঋতুর অবসানে সুতপার নবজাতক আজ মুখান্নপ্রাশনের উপযুক্ত।

শুভদিন দেখে সূর্যনারায়ণ নবজাতকের অন্নপ্রাশনের আয়োজন করলেন। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন ছাড়াও সূযনারায়ণ সমীরণের সঙ্গে আরও দু' একজন ডাক্তারকে আমন্ত্রণ করেছেন।

অন্নপ্রাশনে আমন্ত্রিতবর্গের সমাগমে সূর্যনারায়ণের বাড়ী আজ আনন্দে মুখরিত। শানাই বেজে চলেছে।

সমীরণ শুধু একজন বিলেত ফেরৎ ডাক্তারই না। তাঁর সাফল্যের জন্য তিনি জনসাধারণের কাছে এই অল্প বয়সেই বিষেশভাবে পরিচিত। নবজাতককে আশীর্বাদ করার সাথে সাথে ডাক্তার সমীরণকেও অনেকে ধন্যবাদ জানালেন।

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। হঠাৎ একদিন সূর্যনারায়ণের নামে প্রেসিডেন্সী আদালত থেকে একটা চিঠি এল। তাতে লেখা রয়েছে ;—

.. .. আগামী ১০ই মে বেলা ১ ঘটিকায় আপনার পত্নী ও নবজাত সন্তান সহ কোর্টে উপস্থিত হইবার জন্য আপনাকে জানান যাইতেছে।

চিঠি পেয়ে সূর্যনারায়ণ বন্ধু শিবনাথের কাছে ছুটে গেলেন। সেখানে গিয়ে জানতে পারলেন সমীরণকে পুলিশে গ্রেপ্তার করেছে। কারণ কি তা জানায়নি।

১০ই মে বেলা ১ ঘটিকায় সময় সূযনারায়ণ পত্নী সুতপা ও নবজাতককে নিয়ে উপস্থিত হলেন সাক্ষীর কাঠগোড়ায়। আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে সমীরণ। সরকার পক্ষের উকিল সুতপাকে জিজ্ঞেস করলেন—।

আচ্ছা সুতপা দেবী এই সাক্ষীর কাঠগোড়ায় কেন আপনি দাঁড়িয়েছেন তা কি জানেন ?

—'না।'

যাক সে কথা। আপনার কোলে যে শিশু সন্তানটি আছে— তার মুখাকৃতির সঙ্গে আপনার বা আপনার স্বামী সূর্যনারায়ণের কোনই মিল নেই দেখতে পাচ্ছি।

আচ্ছা একটু চিন্তা করে বলুন তো আপনার কোন আত্মীয়ের সঙ্গে এর কোন মিল আছে কিনা ?

—'না।'

আচ্ছা এবার বলুন ডাক্তার সমীরণবাবু যখন নার্সিং হোমে আপনাকে ভর্ত্তি করান তার আগে তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনাকে কি কিছু জানিয়ে ছিলেন ?

'না'— বললেন সুতপা দেবী।

কিন্তু আপনারা কি জন্য সমীরণকে গ্রেপ্তার করেছেন আমি বুঝতে পারছি না। ওর ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না। তাছাড়া সমীরণকে আমি ছোটবেলা থেকেই জানি। ওর মাথায় কোনরকম পার্টি পলিটিক্সের কথাই ঢোকে না।

'থামুন'— বললেন উকিল।

—'সে সব কথা বলার বা শোনার জন্য আপনাকে আদালতে ডাকা হয়নি। আপনি এখন যেতে পারেন।'

সাতদিন পরে মামলার রায় বেরোল। খবরের কাগজে আবার বড় বড় হরফে ছাপা হোল 'ডাক্তার সমীরণের তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড।'

সংবাদ পত্রের পাতায় সুতপা দেবী বার বার খবরটা পড়লেন। সংক্ষিপ্ত সংবাদ তবুও যেন বুঝতে অনেক সময় লাগছে। পাশেই নবজাতক—এক টানা কেঁদে চলেছে। সুতপা দেবী আজ যেন পাথর হয়ে গেছেন। নবজাতকের কান্না তাকে এতটুকু বিচলিত করতে পারল না।

আধুনিকা

অনিমেষ চক্রবর্তী

আধুনিক জগতের ছেলে হোল অজিত বিশ্বাস। এ শহরের আপ-টু-ডেট ছেলে, হেন লোক নেই যে তাকে এ অঞ্চলে চিনতে ভুল করে। কোথায় সে নেই !

তারই স্ত্রী সুস্মিতা রায় পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। স্বামীর আদেশ,—তাকে আধুনিক জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। অজিত বলে, "তোমায় সকলের সাথে মেলামেশা করতে হবে। কেউ যাতে বলতে না পারে অজিতের বৌটা একেবারে গেঁয়ো। বুঝলে ? সোজা বাংলা যাকে বলে।"

স্ত্রী চেষ্টা করে স্বামীর আদেশ মেনে চলতে, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে পারে না কি ভাবে চললে আধুনিকা হওয়া যায়।

একদিন হঠাৎ অনীশ এসে উপস্থিত অজিতের বাড়ী। অজিত তখন বাড়ী ছিল না। অনীশ এসে ডাকল—

—"বৌদি, বৌদি, বাড়ী আছ ?"

—'কে অনীশ ঠাকুর পো ? এস বস।'

"বৌদি তোমাকে আজ দেখতে এলাম।" মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেল।

—'বস।' সুস্মিতা চেয়ারটা এগিয়ে দিল।

অনীশ বসল না। ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের ওপর ছিল রেডিও। অনীশ টেবিলের সামনে এসে রেডিওটা খুলে দিল, হিন্দী গানের সুর ভেসে এল।

সুস্মিতা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "কটা বাজে এখন ?"

অনীশ রিষ্ট ওয়াচের দিকে এক পলক দেখে নিয়ে বলল, 'তিনটে বেজে পনেরো।'

একটু চুপ করে থেকে অনীশ প্রশ্ন করল,—

—"দাদা কোথায় ?"

—'অফিসে। রাত্রে আসবে।'

অনীশ জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। উদাস দৃষ্টি মেলে ধরল আকাশের দিকে।

হঠাৎ হাতের উষ্ণ স্পর্শে অনীশ চমকে উঠল। দেখল, স্থস্মিতা তার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপরই একটা অভাবনীয় কাণ্ড করে বসল। অনীশের হাতটা টেনে এনে ওর বুকের ওপর চেপে ধরে বলল,—

—"বৌদিকে দেখা হোল ? ভাল করে দেখ।"

এ ধরণের একটা ঘটনা ঘটে যেতে অনীশ বিস্ময়ে হতবাক। তার গলা দিয়ে একটা স্বরও বেরুলো না।

স্থস্মিতা আরও জোরে হাতটা চেপে ধরে বলল, 'কই গো দেখ। কি ভাবে আর দেখবে ?'

অনীশ তখনও বোকার মত দাঁড়িয়ে। ভাবছিল, একি স্বপ্ন, না সত্যি ? যে বৌদিকে সে এতদিন মায়ের মত শ্রদ্ধা করে এসেছে, সেই বৌদিই··· ·····না না সে আর ভাবতে পারল না।

অনীশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সেই ভাবটা কেটে যাবার পর সে বলল, "বৌদি আমায় মাফ করবেন। আমি আজ আসি।"

সে কথা স্থস্মিতার কানেও ঢুকল না। সে তখনও বলে চলেছিল, "বৌদিকে দেখতে এসে এরই মধ্যে দেখা হয়ে গেল ?"

'বৌদি আর এগোবেন না। সামনে খাদ আছে। পড়ে যাবেন।' আচমকা অনীশের মুখ ফসকে কথাটা বার হয়ে গেল।

—কি বলছ তুমি ঠাকুর পো ?

—বৌদি বলে আপনাকে শ্রদ্ধা করতুম, কিন্তু ভাবতে পারিনি আপনার ভেতরের মানুষটা এতখানি নোংরা হবে। আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মত। আমাকে নিয়ে খারাপ কিছু ভাববেন, সেটা আশা করিনি।

ছিঃ অনীশ ! তোমরাই তো সভ্যতার বড়াই কর ? বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও আমাদের বাড়ী থেকে। আর কখনও আসবে না তুমি।

—যাচ্ছি, তবে যাবার আগে বলে যাই আপনার স্বভাব চরিত্রটাকে একটু পাল্টাবেন।

অনীশ চলে গেল।

সে চলে গেলেও তার শেষ কথাগুলো সুস্মিতা ভুলতে পারছিল না। কান দুটো জ্বালা করছিল। ক্ষোভে লজ্জায় চোখে জল এসে গিয়েছিল।

সুস্মিতার স্বামী কখন বাড়ী এসেছে লক্ষ্য করেনি। পাশে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে ঐভাবে দেখে সস্নেহে গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করল,—

'কি হয়েছে সু ?'

সম্বিৎ ফিরে পেল সুস্মিতা। স্বামীর বুকে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল।

"আমি পারব না গো, আধুনিকা হতে পারব না ! আমাকে মাফ করো।"

অজিত খুশী হোল। তার বুকে মাথা রেখে কান্নাটা ঠিক আধুনিকার মত মনে হোল। স্নেহ মাখানো হাত দিয়ে স্ত্রীর চুলগুলো সরিয়ে ছোট্ট করে উষ্ণ উত্তাপ এঁকে দিল।

স্বপ্নের সমাধি

এম. রফিক

কিরে খোকা, দশটা বাজল, তুই ইস্কুলে যাবি না ?" —মা বলল।

—'কই তোমরা যেতে দিলে ?' মাথা নীচু করে বলে খোকা।

—"কেন কি হয়েছে বাবা ? আমরা তো কোনদিন তোকে ইস্কুলে যেতে নিষেধ করিনি।"

—"না তোমরা কেন নিষেধ করবে মা ? হেড মাষ্টারমশাই তো আমায় নিষেধ করেছেন স্কুলে যেতে। স্কুল থেকে আমার নাম কাটা গেছে। আমার পাঁচ মাসের মাইনে বাকী ছিল।"

—"সবই আমাদের কপাল। তোর বাবা সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যা পায় তা দিয়ে যে কত কষ্টে আমাদের সংসার চলে তা তুই বুঝবি না খোকা"—চোখ মুছতে মুছতে অনিতা দেবী রান্না ঘরের দিকে চলে গেলেন।

ঠিক সেই সময়ই বিভাসবাবু স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে রান্না ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমার জামাটা কোথায়

জান ? কাল রোজীকে বলেছিলাম ভাল করে সাবান বুলিয়ে কেচে দিতে!
অনিতা দেবী থালা পরিস্কার করতে করতে বললেন—'কাচা হয়নি।'
—'বলি কেন হয়নি শুনি ?'
—'রোজীর জ্বর হয়েছে সে খবর কি রাখ ? শুধু তো অফিস নিয়ে ব্যস্ত। ছেলে মেয়েদের দিকে একটু নজরও দাও না।'
—'কি বললে ? রোজীর জ্বর হয়েছে ? কই আমি তো জানি না কিছু ? ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ আনা হয়েছে তো ?'

—ওষুধ খাওয়ার মত কপাল কি ভগবান আমাদের মত গরীবদের দিয়েছেন ? তাঁর নজর তো শুধু বড়লোকদের ওপর। বড়লোকের ছেলেরা দেখ আমোদ আহ্লাদে কত টাকা উড়িয়ে দিচ্ছে। আর আমাদের ছেলে মেয়েদের ভাগ্যে অসুখ করলে ওষুধ পর্যন্ত জোটে না।

বিভাসবাবুর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। অনেক আশা করেছিলেন বড় ছেলে অরিন্দমের একটা ভাল চাকরী হলে তাদের অভাবের সংসারে একটু স্বচ্ছলতা দেখা দেবে। কিন্তু সবই ভাগ্য। আজ পর্যন্ত অরিন্দমের একটা চাকরী জুটল না। ছেলেটার কিন্তু কোন ভাবনা চিন্তা নেই। দিব্যি ফুর্তিতে আছে। সকাল সন্ধ্যে সামনের বাড়ীর রকে বসে আড্ডা মারছে। খাবার সময় বোধহয় শুধু বাড়ীর কথা মনে পড়ে।

বিভাসবাবু যা ভাবছিলেন তা কিন্তু সত্যি নয়। অরিন্দমও ভাবে। ভাবে এই সংসারের কথা। ভাবে, বোনেরা বড় হয়েছে। বাবা টাকার অভাবে বিয়ে দিতে পারছে না। বড় ভাই হয়ে বোনেদের দুঃখ সে কোন মুখে দেখবে। বড় বোন কাপড় সেলাই করে সংসারে সামান্য সাহায্য করে। কিন্তু সে বড় ভাই হয়ে সংসারের কোন কাজেই লাগছে না। নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকে অরিন্দম। মনে মনে বলে, 'আমার মরে যাওয়াই ভাল।' কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেই বেঁচে থাকতে হবে। সেই যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হয়ে বসে থাকলে চলবে না। জয় আর সহজে হয় ? তবুও নিরাশ হলে চলবে না। তার আরও মনে পড়ে যায়, জীবনটাই অভিজ্ঞতা, আর অভিজ্ঞতাই জীবন। এক একটি অভিজ্ঞতা যেন এক একটি রুদ্রাক্ষ—সব ক'টি গাঁথা হয়ে গেলে যে মালা হয় তারই নাম জীবন।

তারপর চলল অরিন্দমের অক্লান্ত চেষ্টা। অনেক চেষ্টার পর একটা কাজ জুটল তার। অরিন্দম আর দেরী করল না। সঙ্গে সঙ্গে খবরটা বাবাকে দিল— বলল, 'বাবা, আমি একটা চাকরী পেয়েছি।'
—পেয়েছিস বাবা! কি চাকরী? তুই পারবি তো করতে? কত মাইনে?
—কেন পারব না বাবা? তোমার বয়স হয়েছে। তুমি পারছ আর আমি পারব না?
—কোন অফিসে সে কথা তো বললি না বাবা?
কোন উত্তর না দিয়ে অরিন্দম রান্না ঘরে চলে গেল চা খেতে।

এর কয়েকদিন পরে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। এই ধরণের ঘটনার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না। অফিস যাওয়ার জন্য বিভাসবাবু তৈরী হচ্ছেন। ঠিক সেই সময় পাশের বাড়ীর রাজীব ছুটতে ছুটতে এসে বলল,
—কাকাবাবু সর্বনাশ হয়েছে।
—কি হয়েছে রাজীব?
রাজীবের চিৎকার শুনে বাড়ীর সবাই এসে হাজির হয়। —'অরিন্দম খুন হয়েছে পুলিশের গুলিতে'—বলে রাজীব কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এ কথা শুনে সবাই বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

জানা গেল, অরিন্দম ওয়াগন ব্রেকারের দলে নাম লিখিয়েছিল। অরিন্দম বাধ্য হয়েছিল এ পথে পা বাড়াতে। বোনেদের দুঃখ, সংসারের অভাব-অনটন, বাবার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম তার মনে নিদারুণ বেদনার সঞ্চার করেছিল। আর কোন উপায় না দেখে সে বাধ্য হয়ে এ পথ বেছে নিয়েছিল। ভেবেছিল, বাবা যে কদিন বেঁচে থাকবে তাকে একটু শান্তিতে রাখতে পারবে। মনে মনে অনেক আশার জাল বুনেছিল অরিন্দম, অনেক স্বপ্নও দেখেছিল,—বোনেদের বিয়ে দেবে ভাল ঘরে, ভাইকে ভাল করে লেখা পড়া শেখাবে—শেষে নিজেও বিয়ে করে ঘর সংসার করবে।

তার সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হোল—সে মারা গেল পুলিশের গুলিতে। সৎ সুন্দর জীবনের রুদ্ধপথ খুলতে যে কদর্যতার পথে এগিয়ে গেল সে পথেও অর্থ, স্বস্তি ও স্বপ্নের স্বার্থকতা এল না, এল নির্মম মৃত্যু। বেকার মনের স্বপ্নরাজি বিলীন হয়ে গেল অসীম মহাশূণ্যে—নৈরাশ্যের চরম অন্ধকারে।

যাযাবর

প্রতাপ চন্দ্র সরকার

আমার সমস্ত দেহে একটা শিহরণ খেলে গেল। মনে হলো আমি অজান্তে কোন কারেন্টে হাত দিয়েছি। হাত দিইনি। সে-ই আমার গায়ে হাত দিয়েছিল। সেই মানে ফুটন্ত ইরানী মেয়েটা। নাম সুলতানা।

সুলতানা বললো, "বাবুজী চলিয়ে না তাম্বুমে। আম্মোজী আউর আব্বাজী নেহি হ্যায়। সাকৃচী মে গয়ে।"

সুলতানার আম্মা খাঁটী ইরানী। নাম রাজিয়া। কিন্তু ওর আব্বা বাঙালী মুসলমান। নাম ইয়াকুব। ওরা নীলামে, জিনিষপত্র বিক্রয় করে। ওর আম্মা উন্নত বুকের উপর পাতলা ফিন-ফিনে দামী কামিজটা চাপিয়ে হাতে কোন একটা জিনিষ নিয়ে হাঁকতে থাকে, এক্ রুপিয়া দু রুপিয়া। পথচারী লোকজন ভীড় জমায়। কেউ কেউ ডাক ধরে। আবার কেউ সুলতানার মার বুকের উপর হায়নার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। "কিয়া শুচতে হ্যায়, চলিয়ে না জলদি।" আবার সুলতানা গায়ে হাত দিল। নরম তুলতুলে হাত। আমার মনে একটা আতঙ্ক, একটা উত্তেজনা। আমার আস্তানা, ইটিং হাউসের ঘুপচি ঘরে। আমি এখানে একাই থাকি। ইঁদুর, ছুঁচোর দাপাদাপিতে একবার ঘুম ভেঙ্গে গেলে— সে রাতে আর ঘুম আসতো না। চোখের সামনে ভাসতে থাকতো সুলতানার হাসি হাসি মুখখানা। সুর্মা দেওয়া পটলচেরা চোখের মায়াভরা দৃষ্টি, ঘাঘরা পরা স্থূল নিতম্ব আর কামিজ ঠেলে উঁচু হয়ে ওঠা বুকটা। সুলতানা বেড়ালের মত চুপিচুপি এসে আমার হাত ধরে বলছে, "চলিয়ে তাম্বুমে।" কেন যাবো সে কথা সুলতানা উহ্য রাখলেও আমি জানি কেন সুলতানা আমাকে তাঁবুতে যেতে বলছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। সন্ধ্যার হাওয়ার মত আমার মনে আতঙ্ক আর উত্তেজনা। আস্তে আস্তে আমি আর সুলতানা সকলের

অলক্ষ্যে ইটিং হাউসের পিছনে এসে দাঁড়ালাম। এখানেই সুলতানার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। একদিন ছ'টা দু'টো ডিউটি সেরে অফিস থেকে ফিরতে দেরী হয়েছিল। অবেলায় স্নান করতে এসেছিলাম আমি। এসেই অপ্রস্তুতে পড়ে গিয়েছিলাম। সুলতানা স্নান করছিল। সুলতানা নির্ভাবনায় বুকের কামিজটা খুলে সাবান মাখছিল। আমি দেখে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। সুলতানা খোলা কামিজটা দিয়ে বুকটা ঢাকতে ঢাকতে বলেছিল, "কিয়া দেখতে হ্যায় ?"

বলেছিলাম, 'তুমকো।'

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল সুলতানা। তারপর কোমরের ঝুলানো চামড়ার খাপ থেকে একটা ছুরি বের করে বলেছিল, "দ্যাখতে হ্যায়।" তারপর থেকে সুলতানাকে বেশ কয়েকদিন এড়িয়ে চলেছিলাম। কিন্তু একদিন সুলতানাই আমার খুপচি ঘরে এলো। এসে সোজাসুজি বললো, "বাবুজী দুঠো রুপিয়া দিজিয়ে। কোন কথা না বলে জামার পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে সুলতানাকে দিয়েছিলাম। সুলতানা যাওয়ার সময় বলেছিল, "কাল আপকা রুপিয়া আপস দুঙ্গা।" তারপর দিন সত্যিই সুলতানা টাকা নিয়ে এসেছিল। আমি বলেছিলাম, "তোমহারা ছুরি কাঁহা হ্যায় ?"

"ছুরি! এই দেখিয়ে না" বলে চোখের ইঙ্গিতে নিজের বুকটা দেখিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর হতে বের হয়ে গিয়েছিল। সুলতানা যেন আমার মতই ঘড়ির কাঁটা ধরে স্নান করতে আসতো। ও স্নান করতো। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখতাম। ওর সজীব সিক্ত দেহটাকে তৃষ্ণার্ত চোখ দিয়ে লেহন করতাম।

দুদিন পরেই সুলতানা অযাচিত ভাবে এসে বলছে, "চলিয়ে না বাবুজী তাম্বুমে।" ওর আগ্রহটা ওর দারুণ অস্থিরতার পরিচয় দিচ্ছে। ওর তর সইছে না। আমার হাত ধরে টানছে। আর সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। একখণ্ড লোহা যেমন একটা চুম্বকের আকর্ষণে এগিয়ে যায় আমিও তেমনি সুলতানার সাথে সাথে এগিয়ে চললাম ওদের তাঁবুর দিকে।

আমি চুপিচুপি বললাম, "পুরিনা কাঁহা হ্যায় ?" সুলতানা আমাকে অক্টোপাশের মত জড়িয়ে ধরতে ধরতে বললো, "সিনেমা দেখনে কে লিয়ে

শ্রী ।"

রাজিয়া নেই, ইয়াকুব নেই, পুরিনা নেই। একটা তাঁবুর মধ্যে আমি আর সুলতানা। সুলতানা আর বটেশ্বর। যুবক যুবতী। ইরানী বাঙালী। অনেকদিনের কামনা আমার। অনেক নীরব রাতের স্বপ্ন। আমি সুলতানাকে জড়িয়ে ধরতে ধরতে বললাম, "তুম্ সুলতানা নেহি হ্যায়, তুম্ সুলতা, ম্যায় বটেশ্বর। তোমার সমস্ত ভার বহন করার শক্তি আমার আছে। আমি আর বেকার নেই সুলতা, আমি চাকরী করি।" সুলতানা আমার কথা বুঝলো কি বুঝলো না বুঝতে পারলাম না। যুবক যুবতী, মানব মানবী, ইরানী বাঙালী একাকার।

হঠাৎ বাইরে কার যেন পদধ্বনি শুনলাম। তারপর ক্রুদ্ধ গর্জন, "বের হও, বের হও। নইলে খুন করবো।" স্বরটা সুলতানার আব্বা ইয়াকুবের। আমার আত্মা কেঁপে উঠলো। দেখলাম সুলতানার মুখেও ভয়ের চিহ্ন। আমি সুলতানাকে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। তারপর তাঁবু থেকে বের হতেই আবার ক্রুদ্ধ চিৎকার, "তুমি এখানে মরতে এসেছ কেন? কি নাম তোমার?" —"বটেশ্বর"। অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলাম আমি। —"বটে। সুলতানাকে বিয়ে করবে। সারা জীবন ঘর ছেড়ে, আত্মীয় স্বজন ছেড়ে, খোলা আকাশের নীচে থাকতে পারবে?

পারবে সুলতানার সমস্ত ইচ্ছা মিটিয়ে দিতে?" আমি কোন উত্তর দিলাম না। কি উত্তর দেব ভাবতেও পারলাম না। ইয়াকুব ঝট্ করে আমার হাত ধরলো।

"তোমার মত বয়সেই আমি ভুল করে রাজিয়ার প্রেমে পড়েছিলাম। ওরা যাযাবরের জাত। পথই ওদের ঘর। ঘরই ওদের পথ। রাজিয়া আমাকে ছাড়েনি। সুলতানাও তোমাকে ছাড়বে না। সারা জীবন ঘর বাড়ী ছেড়ে সুলতানার সাথে পথে পথে ঘুরে কাটাতে হবে। তা যদি না চাও তবে সুলতানার ছুরিটা তোমার বুকের রক্ত দেখবেই। যাও কালই এখান থেকে চলে যাও। আমি যে ভুল করেছিলাম সে ভুল আর কোন বাঙালী ভাইকে করতে দিতে চাই না। সুলতানা, পুরিনা আমার মেয়ে তবু আমি সুলতানা, পুরিনা ও রাজিয়াকে এড়িয়ে যেতে চাই—কিন্তু পারি না। রাজিয়ার ছুরিটা সব সময় আমার চোখের সামনে ভাসে।"

ইয়াকুব হাত ছেড়ে দিতেই আমি তাড়াতাড়ি ইটিং হাউসে চলে এলাম। এসেই ম্যানেজারকে সমস্ত টাকা মিটিয়ে দিয়ে বেডিং পত্র নিয়ে বের হয়ে পড়লাম পথে। পথে বের হয়ে তাকালাম সুলতানাদের তাঁবুর দিকে— । ওখানে অত গোলমাল কিসের। সুলতানা আম্মা রাজিয়ার কণ্ঠস্বর, "তুম্ বাঙালী, তুম্ বেইমান, বাঙালীবাবু কো তুম্ ভাগায়া !"

ইয়াকুবের কোন উত্তর শুনলাম না।

আবার রাজিয়ার কণ্ঠস্বর, "কাল হিঁ ফয়সালা করনা হোগা। মেরী বেটী কী ইজ্জত লে লিয়া। ওসকো সুলতানাকে সাথ রহনা পড়ে গা।" আর দাঁড়াতে পারলাম না আমি। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে উঠলো। ছুটতে লাগলাম দ্রুত বেগে। মনে হলো সুলতানা, রাজিয়া আমার পিছু ধাওয়া করে আসছে।

সাদা পর্দার আড়ালে

তালাত আমেদ তরফদার

আমার নাম হাসান জামান। আমি খুবই সাধারণ একজন মানুষ। আমাকে চেনেন না বোধহয়। আমাকে না চিনলেও উত্তমকুমার, সৌমিত্র দিলীপ, সুচিত্রা, মাধবী, অর্পনাকে নিশ্চয়ই চেনেন ? কিন্তু আমরা একই বিভাগে কাজ করি। তবু আমাকে চিনলেন না ? সিনেমার বই আরম্ভ হবার আগে আমার নাম নিশ্চয়ই পড়েছেন, কিন্তু ঠিক মন দিয়ে লক্ষ্য করেন নি। আর করবেনই বা কেন ? আমি তো আর উত্তমকুমার নই।

কোন সিনেমায় গল্প আরম্ভ হওয়ার আগে পর্দায় কালোর ওপরে সাদা অক্ষরে লেখা নায়কের জায়গায় নিজের নাম দেখতে ইচ্ছে করে না ? ইচ্ছা করে না নায়িকার নামের ওপরে আপনার নামটা কালোর ওপরে সাদা অক্ষরে লেখা থাকবে ? আপনার না হলেও আপনার বন্ধুদের কারুর নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে ? আমারও করেছিল একদিন।

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আমি। তখন আমার বয়স মাত্র একুশ বছর। স্কটিশ চার্চ কলেজে ফিজিক্সের ইলেকট্রনিকসে অনার্সের ছাত্র ছিলাম আমি। সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। ছাত্র হিসেবে একেবারে হীরের টুকরো না হলেও একেবারে ফোর্থ ক্লাশ ছিলাম না। কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে আশা ছিল বৈজ্ঞানিক হব। এম, এসসি পাশ করে ডক্টরেট ডিগ্রী নেব। কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল।

কলেজে পড়তে পড়তে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোল। আমি তাকে দাদা বলে ডাকতাম। সাদা-কালোর জগতের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। তিনিই আমার ওই নায়িকার আগে নাম লেখাবার ইচ্ছাটা চরিতার্থ করার পথ দেখিয়ে দিলেন। সঞ্জয়দা নিজে কোন একটা গর্ভনমেণ্টাল ডিপার্টমেণ্টের গেজেটেড অফিসার। আমার চেয়ে অনেক সুখী।

একদিন একটা পার্টিতে গেলাম সঞ্জয়দার সঙ্গে। ও সব লাইনে যেতে হলে একটু আধটু মাতাল পীরের সেবা করতে হয়, করলাম। যে আমি কলেজে পড়েও সিগারেট খেতাম না বলে বন্ধুদের কাছে 'ভাল ছেলে' নামে অভিহিত হয়েছিলাম, সেই আমিই সেদিন সামান্য ড্রিঙ্কও করেছিলাম। অনেক বড় বড় নায়ক নায়িকাকে সেই পার্টিতে দেখেছিলাম। আর দেখেছিলাম আপনাদের এককালীন প্রিয় মধুমিতা দেবীকে।

মধুমিতা সত্যিই সুন্দরী ছিল। গালের দু'পাশে লালের ছোপ। শ্যাম্পু করা চুল। তার সঙ্গে হালকা গোলাপী রঙের ম্যাচ করা শাড়ী ও স্লিভলেস ব্লাউজ। হাতে ছিল একটা ভ্যানিটি ব্যাগ। অপূর্ব সুন্দরী দেখাচ্ছিল।

সেই পার্টিতেই প্রথম পরিচয় হয় মধুমিতার সঙ্গে। আমাকে সঞ্জয়দার মামা একটা চান্স দিলেন। বইটার নাম 'নায়িকা'। নায়িকার রোলই প্রধান আর নায়ক গৌন। নায়িকার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল মধুমিতা। আমার আশা পূর্ণ হতে চলেছে। পিতার অমতে ফিল্মে নাম দিয়ে বাবার অপ্রিয় হয়ে উঠলাম। তিনি আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করে দিলেন।

আমি ইলেকট্রনিক ফিজিক্সের ছাত্র। আমি সিনেমার অভিনেতা কি করে হব? তবুও 'আশার ছলনে ভুলি' স্কুলের সূত্র ছেড়ে উত্তমকুমারের নকল করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু পারলাম না। অভিনয় প্রতিভা আমার ছিল না। পরিচালক মহাশয় আমার নাম কেটে দিলেন।

আমার ইচ্ছার অপমৃত্যু হোল। কিন্তু তখন মধুমিতার সঙ্গে অনেকদূর এগিয়েছি। ও যে কিসের আকর্ষণে আমার দিকে এগোল বলা শক্ত। ও হঠাৎ বলে বসল, ও আর সিনেমায় নামবে না। সংসার করবে। আমি ফেল করার পরও ও আমাকে বিয়ে করল। তখন আমি কপর্দকশূণ্য।

'তপনকুমার' ব্যর্থ হোল। ওই সাদা কালো জগতের প্রতি বিতৃষ্ণায় তার মন বুঝি ভরে গেল। কিন্তু হাসান জামান ওই সাদা কালোর জগৎকে বোধহয় ভালবেসে ফেলেছিল। হতে চেয়েছিল সে নায়ক, হোল রূপসজ্জাকর।

মধুমিতার যা জমানো টাকা ছিল তা ফুরিয়ে গেল। কদলীর জল গড়িয়ে গড়িয়ে আর কতদিন চলবে? দুটো হাত দিয়ে ওঠার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সৎ, ধর্মপ্রাণ পিতার অভিশাপগুলো যেন আমায় জোর করে শুইয়ে রাখল। মনে পড়ল মায়ের কথা। মা একবারও অভিশাপ দেয়নি। শুধু নমাজের মাদুরে বসে আমার ভাল হওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে লেগেছিলেন। শেষ দিনে তাঁর চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। আজ রবিবার। মনে পড়ল সেই মুখের কথা। কিন্তু আজ বেহেড মাতাল হাসান জামানের সেই মুখ নেই যে মায়ের সামনে দাঁড়ায়। বাবা তো মারাই গেছেন।

আমার সেই দুর্দিনে দেবদূতের মত এসেছিলেন রসিদ চৌধুরী। রূপ-সজ্জায় কলিকাতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী রসিদদা। ছোট ভাইয়ের মত আমায় ভালবাসলেন। তাঁর সঙ্গে আমাকে নিলেন। আমার বিপদের দিনে তিনি ছিলেন আমাব একমাত্র নির্ভরস্থীল। এতদিন পরেও রসিদদার কথা মনে পড়লে আমার কোটরাগত শুষ্ক চোখ দুটো জলে ভরে আসে।

কিন্তু আমি সেই কলেজের হাসান জামান হতে পারিনি। আজ আমি বেহেড মাতাল হাসান জামান, আজ আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করতে পারি না পয়সার অভাবে। সেদিনের মধুমিতা আজ টি, বি, রোগে মৃত্যুর দিন গুণছে। নিজের কবর যেমন আমি নিজে খুঁড়েছি, তেমনি মিতাও। ও দিনের পর দিন মদ খেয়ে আমার বন্ধুদের সঙ্গে মাতলামো করত। বড় বড় পরিচালকের সঙ্গে ফুর্তি করত। যখন আমার নিজের মদ খাওয়ার পয়সা থাকত না, তখন মিতাকে অন্য পুরুষদের সঙ্গে মিশতে দেখলে আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠত। মুখে কিছু বলতে পারতাম না। কারণ তখন

ওদের জন্যই কিছু কাজ পেতাম। পয়সার জন্য তখন কুকুর হয়ে গিয়েছিলাম। মিত্রার শরীর খারাপ হওয়ার পর আর কোন পরিচালক আমায় কাজ দিতে চায় না। আমি নাকি তাদের কাছে অনুপযুক্ত। কিন্তু মিতা একটু হেসে ওদের সঙ্গে মদ নিয়ে ঢলাঢলি করলেই আমার কাজ পাওয়া সহজ হোত। তখন আমি উপযুক্ত।

মাঝে মাঝে আমার মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। মনে হয় আমি পাগল হয়ে যাব। মদ খেয়ে খেয়ে আমি অমানুষ হয়ে গেছি। আজ আমি শুধু মদের মধ্যে ডুবে থাকতে চাই। ভুলতে চাই আমার অতীত, বর্তমান সব কিছু। আর ভবিষ্যৎ? ভবিষ্যতের কথা শুনে হাসি পাচ্ছে। আমার ভবিষ্যৎ আছে, নিশ্চয়ই আছে। কি আছে তাও জানি। তা হোল অপঘাত মৃত্যু।

সেই মুখ কোথায়

কিঙ্কর দাশগুপ্ত

বিশু ছুটছে। ...... ছোট একটা কাল রঙের ফোলিও ব্যাগ বগলে চেপে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে এসে চলন্ত বাসটার হাতল ধরে ঝুলতে থাকে। ভীষণ ভীড় বাসটায়। অফিস ছুটির সময় বাসগুলোর রূপই পাল্টে যায়।

বিশু জানে, সারাদিন ক্লান্তির পর ৩০ মিনিটের রাস্তা তার ঝুলে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বাসটা মেন রোড স্টপেজে আসতেই ভীড় ঠেলে জায়গা করে নিয়ে ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। কোন্ সকালে বেরিয়েছে বাড়ী থেকে। দুটো শুকনো রুটি ছাড়া এখনও পর্যন্ত আর কিছু পেটে পড়েনি। মাস তিনেক হোল এইভাবে তার দিন কাটছে।

বি, এসসি পাশ করার পর এক বছর বাড়ীতেই বসেছিল। দু-চারটে

ইনটারভিউ দিয়েছিল, কিন্তু কোন লাভ হয়নি। শেষে অভাবের চাপে বাধ্য হয়ে এ কাজে নামতে হয়েছে। শুধু সেই নয়, তার চেয়েও অনেক ভদ্র, অনেক শিক্ষিত ছেলেই এ কাজ করছে।

বিশুর দৃষ্টিটা হঠাৎ এক জায়গায় আটকে গেল, দেখল এক ভদ্রলোক তার দিকেই দেখছে। কিন্তু কেন দেখছে ? বিশু তো দেখতে খুব সুপুরুষ নয়—নামকরা কোন অভিনেতাও নয়—তবে কেন ? তবে কি উনি জানতে পেরেছেন ভদ্র পোষাকের আড়ালে বিশুর সত্যিকারে রূপ ! তাই উনি বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বিশুর দিকে।

কিন্তু এ ছাড়া যে কোন উপায় ছিল না। বাড়ীতে মা ও ছোট ছোট ভাই বোনেরা তার মুখ চেয়েই যে বসে আছে। এই জঘন্যতম কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য দায়ী তার দারিদ্র্য। সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য তাকে ভাল পথে থাকতে দেয়নি। টেনে নামিয়েছে তাকে এই রাস্তায়।

সে তো চেয়েছিল সৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে। অনেক চেষ্টা করেছিল একটা স্টেবল পজিসানে আসতে। কিন্তু অভাব ও দারিদ্র্য তাকে তাড়া করে বেরিয়েছিল। হাতের কাছে যা পেল তা গ্রহণ করে দেখল জীবনের সততাকে সে বিসর্জন দিতে বসেছে। তৃষ্ণার সময় হাতের সামনের নোংরা জলেই তৃষ্ণা মিটিয়েছে সত্য, কিন্তু এখনও তার বড় হতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছে করে সৎ উপায় দু পয়সা রোজগার করতে। এ কাজে তার বিবেক প্রতি মুহূর্তে বাধা দেয়। কিন্তু অনাহারে ক্লিষ্ট তার মা ও ভাই বোনেদের মুখগুলো যখন মনে পড়ে তখন সৎ ও ভাল হওয়ার স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে হয়। অজান্তে কখন বিশুর চোখ দুটো জলে ভরে গেছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছে নিল। আবার ঘুরে তাকায় লোকটার দিকে, দেখল, তখনও তার দিকে চেয়ে আছে। সি, আই, ডি নয়তো ? হতে পারে। হয়তো তাকে follow করছে। সামনেই কোর্টের স্টপেজ—হয়তো বাস থামলেই সেখানে এ্যারেষ্ট করবে। ভয়ে তার সমস্ত শরীরের লোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে। গা দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে। ইতিমধ্যে কোর্ট ছেড়ে ভিড়িঙ্গি স্টপেজে বাসটা দাঁড়ায়। বিশুর মুখ থেকে হাসি বেরোল। ওখান থেকেই ঘাড়টা একটু কাত করে লোকটাকে দেখতে চাইল। দেখতে পেল না। এবার ঘাড়টা আরও

একটু কাত করায় দেখতে পেল লোকটাকে। লোকটার দৃষ্টিও তার দিকে নিবদ্ধ ! বিশু ভাবে, কে এই লোক। কেনই বা তাকে দেখছে ? সে মনে মনে স্থির করল লোকটা কোথায় নামে দেখা যাবে। সেও সেখানে নামবে। আর তো মাত্র দুটো স্টপেজ। এরপরই ষ্টেশন। বাসটা যখন এসে ষ্টেশনে থামল বিশু শেষবারের মত লোকটাকে দেখে নিল। লোকটাও তাকে দেখল। বিশু আস্তে আস্তে বাস থেকে নেমে একটু সরে দাঁড়াল। লক্ষ্য রাখল প্রতিটি যাত্রীর ওপর। আস্তে আস্তে সবাই বাস থেকে নামল,—কিন্তু সেই লোকটি তো নামল না। তবে কি লোকটা তাকে দেখে বাসের মধ্যে আত্মগোপন করল ? খালি বাসে দৌড়ে গিয়ে উঠল বিশু। সামনে তাকাতেই দেখতে পেল সেই মুখটা। মুহূর্তের মধ্যে শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। রক্তের মধ্যে এক ভয়ানক স্রোত বইতে লাগল। আস্তে আস্তে সে এগিয়ে গেল আয়নাটার দিকে। এ যে তারই প্রতিচ্ছবি। দু' হাতে মুখটা ঢাকা দিল। একি হয়েছে তার মুখাকৃতি। এ কি সেই বিশু ? সেই সুডৌল সৌম্য মুখাকৃতি কোথায় ? কোথায় সেই মুখের লালিত্য। এতো একটা আধপোড়া বেগুনের নমুনা। চোখ দুটো কোটরাগত। চোখের সামনের হাড় দু'টো উঁচু হয়ে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মাস কয়েক হোল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখখানা দেখার মত সময়ও তার হয়নি। পূর্বের মুখাকৃতি স্মরণ করতে পারছে না এই মুহূর্তে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল। চোখ থেকে ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা অশ্রু।

বোষ্টম বাবাজী

শেখ নজরুল ইসলাম

ভালো করে লোকটার মুখের দিকে তাকালাম। একতারা হাতে করে পথে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে। আর গান জানে না কি বলে।

মুখের আদলটায় কিছুটা যেন চেনা ছাপ! আচ্ছা তোমার বাড়ী কোথায় বলত ?

আমি এ গাঁয়েরই মানুষ। এককালে অনেকেই চিনতো জানতো আজ কেউ খোঁজে না।

তোমার নাম অনন্ত দাস ? আমার কথায় লোকটার ভাবান্তর হলো না। তবে মুখে বলল, ঠিক বলছো।

আমি বছর দশেক আগে কয়েক মাসের জন্য মাঝের গ্রামে ছিলাম, তেমন আলাপ পরিচয় না হলে—তখন বেশ কয়েক বার দেখেছিলুম, মনে পড়ল। অবশ্যই সেই সময় এখনকার মত শরীরটা তত ভাঙ্গা ছিল না। এখন দেখলেই মনে হবে বয়স প্রায় ষাট পঁয়ষট্টি। রোগা লিকলিকে চেহারা সুপারির মত চোখ দু'টো মাংসের সঙ্গে সেঁটে বসে গেছে।

প্রায় পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়েও থামতে হলো। কয়েকজন বাচ্চা ছেলের জটলার মধ্যে রোগা লিকলিকে লোকটার হাতে একতারা বেজে চলেছে। সম্ভবত আমাকে দেখে বৃদ্ধ লোকটি বাজনার সঙ্গে গাইতে শুরু করেছে। ফাঁকা মাঠে দীর্ঘক্ষণ পথ চলার ক্লান্তিতে ইচ্ছে করছিল বট গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার। তা' ভালই হলো গান শুনতে শুনতে ক্লান্তি ভাবটা দূর করা যাবে। —তা বাউল বাবাজী শোনাও না ভাল দেখে একখানা গান।

আমার লোকটা মৃদু হাসল। —ভাল গান তো জানি না। তবে শুনুন। তার অসম্ভব চেষ্টা সত্বেও কেন জানি না, গানের সুর ভালো লাগল না।

ফেলে আসা দিনগুলি

লীনা রায় (খুকু)

স্কুলের দেউড়ী পার হয়ে সেন্টপলস্‌ কলেজে ঢুকলাম একরাশ কৌতুহল আর উদ্দীপনা নিয়ে। সতীর্থ সতীর্থা চারিদিকে ছড়ান। কিন্তু তখনও কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে ওঠেনি। হঠাৎই এর মধ্যে একটি মেয়েকে দেখলাম। ভাল লাগল। মনে জায়গা করে নিল। আমি ঠিক করলাম, মেয়েটির সঙ্গে যে ভাবেই হোক আলাপ করবো। আলাপ হয়েছিল বেশ ঘনিষ্ট ভাবেই— আজও মাঝে মাঝে মেয়েটির মুখখানি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

—ওকে আমি গোলাপী বলে ডাকতাম, এরজন্য ও অবশ্য কোন আপত্তি বা অভিযোগ জানায়নি। ওকে দেখেই আমি কেমন যেন ভালবেসে ফেলেছিলাম। অনেক স্বপ্নের নীড় রচনা করেছিলাম দু'জনে মিলে। কিন্তু আমাদের সে স্বপ্ন আজও পূরণ হয়নি। আর হবেও না।

গোলাপীর সাথে আলাপ হয়েছিল অদ্ভুত ভাবেই। কলেজের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে সে সুন্দর রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছিল। গানটি আজও মনে আছে— "আমার পরাণ যাহা চায়—তুমি তাই, তুমি তাই গো………" অনুষ্ঠানের শেষে সবাই প্রশংসা করেছিলো। দলের মধ্যে আমিও তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। সে ধন্যবাদের প্রত্যুত্তরে বলেছিল—'আপনারা খুশী হয়েছেন জেনে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।' কথাগুলো বলে সে আর দাঁড়ায়নি। পরের দিন কলেজে গিয়ে আমি তাকে খুঁজেছিলাম। দেখা মিললো একটু পরে। সাদা ধবধবে শাড়ীর সাথে সাদা ব্লাউজ, টানা টানা কালো চোখ, অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে এসে ক্লাশে ঢুকলো। সে আমার সাথেই পড়তো। দু'জনেরই কেমিষ্ট্রিতে অনার্স। নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাশ শেষ হতেই গোলাপী অবসরের সুযোগ নিয়ে মাঠে গিয়ে বসলো। আর আমি—আমি

তখন মন্থর গতিতে ওর সামনে গিয়ে বসে পড়লাম। ওর সামনে গিয়ে কী বলবো তা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম। গোলাপী আমার দিকে ঘুরে তাকালো কিছুই বললো না। আমি বললাম— 'আপনার গত কালের গান আমার খুব ভাল লেগেছে।'

—'তাই নাকি ?'

—হ্যাঁ। আপনার নাম তো সুগোলাপ নাগ ?

—'কি করে জানালেন ?'

—'কেন ? গতকালের অনুষ্ঠানে বার বার ঘোষিত নামটাকে কি সহজেই ভোলা যায় ?'

সুগোলাপী হেসে নিযে বললো— তা বটে।

আমার ওর সম্বন্ধে জানতে আরও ইচ্ছা করছিলো। কিন্তু সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। আচমকা জিজ্ঞাসা করে বসলাম—কোথায় থাকেন ?

—রাসবিহারী এভিনিউ।

আর কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়ে উঠলো না। পড়াশুনা নিয়ে কিছু কথা হচ্ছিল। এমন সময় কলেজের বেলের শব্দে আমাদের আলাপে ছেদ পড়লো। ক্লাশে চলে গেলাম।

কখন আবার পরেরদিন কলেজে গিয়ে গোলাপীর সাথে দেখা করবো এই কথাই ভাবছিলাম। পরের দিন একটু তাড়াতাড়ি কলেজে গেলাম। কলেজে গিয়ে দেখলাম ও তখনও আসেনি। কিছুক্ষণ পরে এসে ও আমাকে ডাকল। আমি ওর ডাকে সাড়া দিলাম।

এ ভাবে প্রায় দেখা হতে লাগলো। কলেজ ছুটির পরে মাঝে মাঝে আমরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে কোনদিন রেষ্টুরেন্টে, ভিকটোরিয়ায় বা লেকে, আবার কোন কোনদিন সিনেমা অথবা থিয়েটারে যেতাম। দু'জনের চোখে তখন রঙীণ প্রেমের স্বপ্ন। নতুন ঘর বাঁধার স্বপ্নে আমরা বিভোর।

একদিন কলেজ ছুটির পর গোলাপীকে নিয়ে নিউমার্কেট গিয়েছিলাম। ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ও জিজ্ঞেস করলো —'কোন দোকানে উঠবে। কিছুক্ষণ ঘোরার পর ওর জন্য একটি ভ্যানিটি ব্যাগ কিনলাম। ও নিতে কিছুতেই রাজী হয়নি প্রথমে। আমি ওকে বলেছিলাম— 'না নিলে ভীষণ রাগ করবো।' শেষে ও অবশ্য নিয়েছিল। অল্পক্ষণ পরেই ও

আমাকে একটা পেন আর একটা ইংরেজী উপন্যাস কিনে দিল। আমি ওর উপহার সাদরে গ্রহণ করেছিলাম। নিউমার্কেট থেকে বেরিয়ে একটি বড় কাপড়ের দোকানে গিয়ে উঠলাম। এক বন্ধুর বিয়ের উপহার কেনার জন্য। ও-ই একটা লাল বেনারসী পছন্দ করে দিয়েছিল। বাড়ী ফেরার পথে রেষ্টুরেন্টে গিয়ে দু'জনে খেলাম। অবশ্য ওই খাইয়েছিলো।

আমাদের ভালবাসা যখন চরমে উঠেছিলো তখন ও আমাকে বলেছিল—ওর বিয়ের জন্য বাড়ীর সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। মা—বাপের একমাত্র মেয়ে গোলাপী। গোলাপীর অবস্থার কথা ভেবে তার মা-বাবা সেই রকম ছেলেই চেয়েছিল। কিন্তু আমি তা নই। আমি মধ্যবিত্ত আদর্শবাদী পরিবারের ছেলে। গোলাপী আমাকে সব জানিয়েছিল। দু'হাতে মুখ ঢেকে অনেক ক্ষণ কেঁদেছিল। ও বলেছিল— চল আমরা কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধি, যেখানে আমাদের কেউ খুঁজে পাবে না। আমি সেদিন ওকে কিছুই বলতে পারিনি। আমার অক্ষমতা আমাকে সাহসী করে তুলতে পারেনি।

গোলাপীর বিয়ে হয়ে গেছে। ওর মা-বাবা উপযুক্ত জামাই পেয়েছেন ছেলেটি বিলেত ফেরৎ ডাক্তার। ছেলেটি সুশ্রীই বলা যায়। বিবাহ বাসরেই দেখেছিলাম। ওর বিয়েতে না গিয়ে থাকতে পারিনি। বিয়ের চিঠির ভিতরে ওর একটা ছোট্ট চিঠি পেয়েছিলাম। ও লিখেছিল আমি না গেলে ও খুব দুঃখ পাবে, সুখী হতে পারবে না। এরপর আমি আর অভিমান করে থাকতে পারিনি। একগুচ্ছ রজনীগন্ধা নিয়ে পৌছালাম নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে। আমাকে দেখেই ওর মুখটা থমথমে হয়ে উঠেছিল। ওর কাজল কালো চোখ দু'টি জলে ভরে উঠেছিল। আমারও চোখে সেদিন জল এসেছিল। উপহার হিসেবে ফুলের গুচ্ছ ওর দিকে এগিয়ে দিতেই ও দু' হাত বাড়িয়ে উপহার গ্রহণ করেছিল। আর আমার হাতে গুঁজে দিল একটি ছোট্ট ভাঁজ করা কাগজ। কাগজটা সকলের সামনে খুলতে পারিনি। বেরিয়ে এসে খুলে দেখলাম শুধু কয়েকটি মাত্র কথা লেখা ছিল— 'তুমি এত ভীরু, কাপুরুষ আমাকে উদ্ধার করতে পারলে না? তুমি আমাকে ক্ষমা করো।'

এরপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। সময় আমার ক্ষতের উপর পলিমাটি ফেলেছে। আমি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি নিজেরই মধ্যে। এমন সময়

জীবনের জনৈক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। ও বললো—'মনোজ জানিস, গোলাপী এখন কলকাতায়। স্বামীর সঙ্গেই এসেছে। মেট্রোতে দেখা হলো। ও একদম সুখী হয়নি। কি সুন্দর ফুটফুটে দু'টো বাচ্চা। তোকে বার বার করে যেতে বলেছে রাসবিহারীর সেই বাড়ীতে। অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে তোর কাছে সকরুণ মিনতি জানিয়েছে—তুই যেন অবশ্যই দেখা করিস।' আমি বিস্মিত অথচ নির্বাক। ভাবছি সেই দিনগুলিতে কি আর ফিরে যেতে পারবো? পারবো না। গোলাপী— যাকে আমি প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম আমার হৃদয়ে— সে আমার হৃদয়েই থাক। জানি ওকে আর পাবো না, তবু সে চিরদিনই সত্য হয়ে থাক আমার মনে—আমার অন্তরের গভীরে।

শান্তনুর গল্প

নন্দদুলাল আচার্য্য

সময়টা আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। ও কখন উঠত আর কখন নামত না দেখলেও আমি বলতে পারতাম। রোজ একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। ওর পদধ্বনি আমার কানে মিষ্টি সঙ্গীতের সুর ছড়াত। ছাতে উঠে কার্নিসে মেলা শুকনো কাপডগুলো ও তুলতো। এটা ছিল ওর প্রতিদিন গৃহকর্মের একটি অঙ্গ। সূর্যাস্তের ঠিক পূর্বে ও ছাতে আসত। আমিও ঠিক ঐ সময়টাতে কিংবা একটু আগেই ওদের ছাতের পাশে আমাদের ছাতে ওর জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম।

একটু পরে ও এলে খুশীর বাতাসে আমার মনটা ভরে উঠত। আমি অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতাম ওর ভরা যৌবন। পিঠের উপর ছড়িয়ে দেওয়া একরাশ ঘন কাল চুল। ওর সুন্দর মুখখানা। ইচ্ছে হতো কথা বলি। কিন্তু বলি বলি করেও বলতে পারতাম না। কেমন যেন লজ্জা হতো। নিজের ওপর রাগও

হতো, নিজের লজ্জাকে ধিক্কার দিতাম। আমি না পুরুষ! এতো লজ্জা কেন, কেন এতো ভয়! নীচ থেকে প্রতিজ্ঞা করে আসতাম আজ কথা বলবোই! কিন্তু প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হোত। আমার কথা ঠোঁটের কিনারে এসে আটকে যেতো।

ওদের নাকি একটা পোষা ময়না পাখী ছিল। এতদিন হয়ে গেল ময়না কথা বলে না। "ময়নাটা কি বোকা রে—শুধু তাকাবে, কথা বলবে না।" —ময়নার কুখ্যাতি কাপড় তুলতে তুলতে রোজই কাকে যেন শোনাত। অথচ দু' বাড়ীর ছাতের মধ্যে ও আর আমি ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তি কেউ থাকত না। কাপড় তুলেই যে ও রোজ ছাত থেকে নেমে যেত তা নয়। তোলা কাপড়গুলো এক জায়গায় গুছিয়ে রেখে কোনদিন চুল বাঁধত। কোনদিন বা কার্নিস ধরে এদিক ওদিক তাকাত। এবং আমার দিকেও মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকত। "ময়না কি বোকা রে, শুধু তাকাবে, কথা বলবে না।" আমার চোখের সঙ্গে ওর চোখের মিলন হতো। মাঝে মাঝে ও মুখ টিপে কেমন যেন দুষ্টু দুষ্টু হাসত। আমার ভালো লাগত। তারপর এক সময় তোলা কাপড় দু হাতে গুছিয়ে ছাত থেকে নেমে যেত।

একদিন আমি ছাতে ওর প্রতীক্ষায় আছি। অথচ ও আসছে না। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল। সূর্য অস্ত গেল। অথচ ও এলো না। আমি অধীর হয়ে সারাক্ষণ ছটফট করছি। অনেকক্ষণ পর ও যখন এলো তখন চারিদিক অন্ধকার। পাতলা অন্ধকারেও ওর মুখ আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ও এলো। কাপড় তুললো। কিন্তু আজ আর চুল বাঁধল না। কার্নিস ধরে দাঁড়াল। স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকাল। কিন্তু মুখ টিপে হাসল না। ওর মুখখানা করুণ ও বিষণ্ণ মনে হোল। আজ ভেবে রেখেছিলাম ওর সাথে কথা বলব। কিন্তু শত চেষ্টা করেও বলতে পারলাম না। আজ ও ময়না পাখীর কুখ্যাতি গাইলো না। শুধু বললে, "ময়না পাখী এবার যে আমি অনেক দূরে চলে যাব, তুই কাঁদবি না। শেষ দিনে অন্ততঃ কিছু কথা বল।" কিছুক্ষণ পর ও ধীরে ধীরে ছাত থেকে নেমে গেল।

তার পরদিন ও আর ছাতে এলো না। সূর্য অস্ত গেল তবুও না।

অন্ধকার ঘনিয়ে এলো তবুও না। একদিন, দু'দিন, তিনদিন পেরিয়ে গেল তবুও এলো না। একি ও আসছে না কেন ? তবে কি ও আর আসবে না ? তীব্র যন্ত্রণায় মনটা ছটফট করতে লাগল।

অবশেষে অনেক দিন প্রতীক্ষার পর সত্যি একদিন ওকে দেখতে পেলাম। দীর্ঘ দু' মাস পর, সেই নির্দিষ্ট সময়ে, সেই ছাতে, কার্নিসে মেলা শুকনো কাপড় তুলতে ও এলো। কার্নিস ধরে স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে ও আমার দিকে তাকাল। কিন্তু একি আমি চমকে উঠলাম কেন ? ·········আমার মাথা ঝিম ঝিম করছে কেন··· ····· ? আমার হৃৎপিণ্ডের রক্ত কেন ওর সিঁথিতে ? তবে কি ········ ? আমি আর ভাবতে পারছি না। কারা যেন হো হো করে হাসতে হাসতে বলছে— তুমো হেরে গেলো। আমার চোখ ফেটে জল বেরুচ্ছে কেন ! আমি কি জেগে আছি ! না কি দীর্ঘদিন প্রতীক্ষার পর স্বপ্ন দেখছি ? দূরে কোথায় পূরবী রাগে শানাই বাজছে। শানাই তো নয়। ও যেন কার করুণ কান্না। ব্যর্থতার ব্যথায় ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছে শুধু।

শান্তহৃদা—হঠাৎ তার কান্না ভেজা নরম গলায় সম্বিৎ ফিরে পেলাম।

আমায় ডাকছেন ? পাচিলের দিকে এগিয়ে যাই একরাশ বিস্ময় নিয়ে। চোখে চোখে মিলন হয় না। দৃষ্টি নামিয়ে নেয় নীচের দিকে। কথা বলে না— শুধু কাঁদে আর মাঝে মাঝে চোখ তোলে।

কেন এমন হলো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রশ্ন করি।

তলাকার ঠোঁটটি দাঁত দিয়ে চেপে ধরে মেয়েটি আস্তে আস্তে বলে— ময়না কেন কথা বললো না। কেন মিথ্যে শুধু বোবা দৃষ্টি মেলে রইলো। কেন একবার জোর করে বললো না —তুমি আমার ?

শানাইটা জোরে—আরো জোরে কেঁদে উঠলো। দেখি মেয়েটি আঁচলে চোখ ঢেকে দ্রুত পায়ে নেমে যাচ্ছে।

দুটি চিঠি ঃ কটি কথা

সাথী রায়

কে ! চমকে ওঠে অলোক মিত্র ।

আমি বাবু, আমি ।

গনেশ ?

হাঁ বাবু, অন্ধকার হয়ে গেছে । আলোটা জেলে দেবো ?

আলো জালবি ? মৃদু হাসে অলোক । আলো জ্বাললেই কি মনের অন্ধকার যায় রে ? কালো দাগ মোছে না মন থেকে । গভীর হয়েই বসে থাকে ।

আজ্ঞে ! কি বলছেন বাবু !

না কিছু না । আলোটা জেলেই দে । বাইরের অন্ধকারটা কাটুক। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বহুবার পড়া চিঠিটা চোখের সামনে আবার তুলে ধরে ।

মধুকর,

এ নামে তোমায় যে ডাকতো, তাকে মনে পড়বে কিনা জানি না ! তবু সাহস করে আবার ডাকছি । শুনেছি তোমার সুরেলা কণ্ঠ নাকি থেমে গেছে, খেলার মাঠ থেকে হারিয়ে গেছে এককালের চাম্পিয়ান, মজলিশ থেকে মুছে গেছে সেরা মজলিশীর নাম । তবু, তবু তোমায় লিখছি সাহস করে । ভাবছি এ ডাক শুনে মধুকর যদি আবার গুনগুন করে ওঠে । আবার যদি ফিরে আসে পরিচিতের মাঝে । কিন্তু কেন ? কেন তুমি নিজেকে এ ভাবে সরিয়ে নিয়েছ ? কেন তুমি এমন ছন্দ তান লয় সব কিছু ভেঙে দিয়ে জীবনটাকে ছন্দহীন করে তুলছো ? শুধু কি সুনন্দার জন্যেই ? মধুকর, হয়ত বলবে সামান্য পরিচয়ের জোরে এ প্রশ্ন করার অধিকার নেই । কিন্তু না, আমি মানি না। কারণ একদিন আমি তোমায় ভালো বেসেছি । অবাক হচ্ছো তো ? খুবই স্বাভাবিক। সে ভালোবাসার

কথা কোনদিন প্রকাশ করিনি। আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে তোমার সামনে গিয়ে দেখেছি সুনন্দাকে। নীরবে সরে এসেছি। সুনন্দা আমার বন্ধু, ওর প্রতি আমার আকর্ষণও ছিলো তীব্র, তবু তোমায় নিয়ে মনে মনে যে স্বপ্ন রচনা করেছিলাম তা ওর কাছে প্রকাশ করতে পারিনি। প্রকাশ করেও লাভ ছিলো না, কারণ তুমি সেদিন সুনন্দাকে নিয়েই মনের বাসরে আসন পেতেছিলে। আচ্ছা মধুকর, মনে পড়ে তোমার সঙ্গে আলাপের প্রথম দিনটির কথা? আমার প্রতিটি মুহূর্তই মনে আছে। সুনন্দার জন্মদিনে প্রথমে দেখেছিলাম তোমায়। অর্গানের সামনে বসে গাইছিলে— "আমার পরাণ যাহা— চায়।" সৌম্যদর্শন সেই অলোক মিত্রকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, মুগ্ধ হয়েছিলাম তার গান শুনে। গানের পর সুনন্দা পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলো— অলোক মিত্র একাধারে গায়ক, খেলোয়াড় এবং ভাবী ইঞ্জিনীয়ার আর আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলো— বনানী সোম, আমার বান্ধবী। আর্টস্ এর ছাত্রী একটু আধটু সাহিত্য চর্চা করে। লজ্জা পেয়েছিলাম। আমায় সহজ করার জন্যে হেসে বলেছিলে— বনানী— অরণ্যানী— অনন্যা। নিজের সমস্ত লজ্জা একপাশে সরিয়ে রেখে উত্তরে বলেছিলাম— তুমি মধুকর। মনে পড়ে সেদিনের কথা? আমার পড়ে। আজও ভাবি মাঝে মাঝে। অথচ আজ আমি অধ্যাপক অনমিত্রের জীবনসঙ্গিনী। আমার একমাত্র সন্তান অমিতের মা। এরা যেমন মিথ্যে নয়, তেমনি মিথ্যে নয় তুমিও। বিয়ের পর নিজের মনকে অনমিত্রের হৃদয়ে সঁপে দিতে গিয়ে দেখলাম— মনের আয়নায় তোমারই প্রতিবিম্ব। অনমিত্রকে সবই বললাম, বললাম— তোমায় প্রতারণা করতে পারবো না। সে হেসে বললে— পাগল। জোর করে কিছু করতে যেও না, আস্তে আস্তে সবই ঠিক হয়ে যাবে একদিন। কিন্তু— কিন্তু ঠিক হলো কোথায়? সবই পেয়েছি, তবু কোথায় যেন একটা বাধা রয়ে গেছে মধুকর।

এরপর দীর্ঘ পাঁচ বছর কেটে গেছে।

সেদিন কার্সিয়াং যাওয়ার পথে যে মেয়েটিকে বাসে উঠতে দেখলাম সে আমাদের সুনন্দা। পরণে মিলের সাধারণ একটা শাড়ী, প্রসাধন নেই, অলঙ্কার নেই বললেই চলে। যে সুনন্দাকে একদিন দেখেছি— তার সঙ্গে এর কোন মিল নেই। চোখাচুখি হলো, তবু উচ্ছ্বসিত হতে পারলাম না।

॥ গল্প নয় ॥

সৌরভ

দেখি একটা চারমিনার ছাড়ুন। বাপরে উল্টো পথে এসে আপনার চিঠি দিয়ে যেতে হয়! কপাল গুনে আমার চাকুরি জুটেছে বলতে হবে!

—সিগারেট তো কাছে নেই! তাছাড়া সিগারেট খাওয়া ছেড়েই দিয়েছি।

উঁহু কাজটা ভালো করেন নি। সাহিত্যিক মানুষ, সিগারেট ছাড়লে লেখা আসবে কি করে?

সপ্তাহে দু-চারদিন সদানন্দকে আমার বাড়ীতে দেখতে পাই। এখানকার পোষ্ট অফিসের পিয়নের কাজ করে। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। প্রায় হাসি হাসি ভাব। ভালো লাগে। ভাবি, আজকের দুর্দিনের বাজারে হাসি মুখে কাজ করা কম কথা নয়। সাধারণত চিঠি দিতে এসে দু-পাঁচ মিনিট বসে কোন কোন দিন চাও খেয়ে যায়। তাই বলে আমার কাছে কোন দিন সিগারেট চায় না। এমনিতেই শ্রদ্ধা করে, হয়ত লিখি-টিকি বলেই।

—তাহলে বসছিনা আর। চরকির মত ঘোরা কাজ বসতে গেলে চলবে না।

সদানন্দ ব্যস্ততার সংগেই উঠে দাঁড়াল, দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে ফিরে তাকাল।

—আসল কথাটাই তো ভুলে গেছি। গল্পের প্লট আছে। কথাটা বলেই চোখ দুটোকে নাচালো। সদানন্দের কাছে গল্পের প্লট। কথাটা সবে ভাবতে শুরু করেছি। ও বলল—আরে বাবা। একাবারে প্রেমের গল্প। তবে আর বলছি কি! সত্যিই প্লট আছে।

—পকেট হতে বার করলো একটি খাম। খামের মুখ খোলা। ভেতরে যে বস্তু আছে তাও খুব ওজনদার অনুমান করে নিতে সন্দেহ হোলনা। ভেতরে কি বস্তু আছে? খামটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল পড়বেন। হাতে নিয়ে খুলে দেখলাম চিঠির মত করে লেখা।

আমি পড়ে কি করবো। তাছাড়া এ চিঠি আমিই বা পড়বো কেন? কে লিখেছে, কাকে লিখেছে, চিঠির মালিকইবা কে?

—চিঠির মালিক কে জানিনা। কে কাকে লিখছে তাও জানিনা। যে রামপদ হকার ছোকরা পোষ্ট অফিসের সিল্ দিয়ে ব্যাগ বাঁধে, গত পরশু দিন সেই এটা আমাকে দিয়ে বললো, সদানন্দদা ডাক্‌বাক্সে একটা খাম ছিলো— ঠিকানা লেখা নেই। তা ভাবলাম নিশ্চয় পত্র প্রেরকের ঠিকানা আছে তার কাছেই ফেরৎ পাঠানো যাবে। ও হরি তাও নেই। কি মন গেল পকেটেই রেখে ছিলুম, রাত্রে কৌতুহল নিয়ে পড়ছি। পড়ছি আর বুকের ভেতর একটা ব্যথা অনুভব করছি। ভাবলুম ভালো জ্বালা তো? চিনি না জানি না কোথাকার কে মাঝখান থেকে আমি কষ্ট পেতে যাই কোন দুঃখে। ভাবলুম ছিঁড়ে ফেলে দিই। পারিনি। কেন-কে-জানে। মনে পড়লো তোমার কথা। লেখক-দা-কেই দিয়ে দিই এটা। সাহিত্যিক মানুষ গল্পের প্লট পেতে পারে। এক মনেই শুনছিলাম ওর কথাগুলো। শুনেছি পিয়নের কাজ করলেও সদানন্দের লেখা টেখা পড়ার অভ্যেস আছে। তা আবার সাহিত্য করে না তো? নিজের লেখাটাই আমাকে পড়িয়ে নেবার তাল খুঁজছে। কথাটা ভেবেই ফেললাম। শুনলাম তো সব। আমি পড়ে কি হবে বলো? তোমার কাছেই রাখো ওটা। ওর হাতে দিলাম খামটা।

— পকেটে থাকলে আমার ব্যথা বাড়বে। বুকের ভেতরটা খচ্ খচ্ করতে থাকবে। এই রইলো টেবিলে তুমি পড়ে বাপু যা হয় করো। সদা-নন্দ খামটা টেবিলের উপর রাখলো।

আর কোন কথা বলার অবকাশ দিলনা চলে গেল। তারপর হতে ওটা এ-ভাবেই পড়েছিল।

একদিন রাতে আমার অবস্থা ভালো নেই। কি মন গেল, খামটা খুলে লেখাটা পডতে শুরু করলাম। কিছুটা পড়ায় বুঝলাম কিছু একটা অদৃশ্য শক্তি আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে। চিঠির সম্বোধনেই আছে "তুমি"। কে এই "তুমি"? আমার মনে বিরাট একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন! এক মনে পডে চলেছি সুদীর্ঘ পত্র যেন শেষ হতে চায় না। পড়তে পড়তে এক জায়গায় এসে থামলাম। পড়া যাচ্ছে না মনে হলো—জলের ফোটা পড়ে লেখাটা মুছে গিয়েছে। তারপরের অংশটুকু পড়তে শুরু করলাম।

—জানো প্রিয়তমা, ভালোবাসা প্রেম কি জিনিস তা কখনই জানতে পারতাম না, তুমি না আমার জীবনে এলে। সেই ছেলে বেলায় সাহিত্যিক-দের লেখা উপন্যাসগুলো চুরি করে পড়তাম যখন—কতই বা তখন বয়স! চৌদ্দ কি পনের হবে। উপন্যাসের নায়ক নায়িকাদের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়তাম। কল্পনা করতাম উপন্যাসের অমনি নায়িকা আমার জীবনেও একদিন আসবে। তারপর কেটে গেছে কতগুলো দিন। আমার চারি পাসে দূর হতে যে সব মেয়েদের দেখতাম ভালোবাসা প্রেম করা দূরে থাক তাদের প্রতি যেন কি রকম ঘৃণা হোত। এমন কাউকে দেখলাম না যার কাছে বলবো,—আমি তোমার। আমি যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে। তুমি আমার সেই রাণী যাকে রাজপুরীতে যক্ষরাজ রুপোর কাঠি ছুঁইয়ে পাথর করে রেখেছে। আমি সেইরাজকুমার যে তোমাকে উদ্ধার করবে।

এমনি করেই যেত দিন। মনে হোতো প্রেম ভালোবাসা ওসব লেখক-দের নায়ক নায়িকাদের জন্যেই। বাস্তবে তার দেখা মেলে না। হঠাৎ করেই তোমাকে দেখলাম। দেখেই বুঝলাম এই সেই রাজকন্যা। তোমাকে পাবার জন্যে পাগল হয়ে গেলাম।

আর তুমি সোনার কাঠির ছোঁয়া পেয়ে জেগে উঠলে। আমার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে বললে—এসেছো তুমি? এসেছো তুমি রাজকুমার! আমাকে বাঁচাও। আমাকে উদ্ধার করো, আমি যে যুগ যুগ ধরে তোমার আসার অপেক্ষাতেই ছিলাম।

তোমাকে ঘোড়ার পেছনে বসালাম। পক্ষীরাজ ছুটলো—অজানা-অচেনা পথে। সদ্য জেগে ওঠা রাজকন্যে জড়িয়ে ধরলো তার প্রিয়তমাকে তার রাজাকে! সে ছুটে চলার শেষ নেই—বিশ্রাম নেই। পড়ে গেল, আছাড় খেল, আবার ছুটলো—ওদের পালাতে হবে। যক্ষরাজের সীমানার বাইরে চলে যেতে হবে।

পৌঁছে গেলাম রাজ্যের বাইরে। আর ভয় নেই। তুমি আবেগে জড়িয়ে ধরে মুখ রাখলে আমার বুকে। তোমার কোমল মুখখানি জড়িয়ে আদর করলাম। তোমার শুভ্র দেহ বল্লভের মধ্যে মুখ লুকালাম। তুমি, সেই রাতের কথা তোমার মনে আছে। আমাদের সেই প্রথম মিলনে বিছা-

নার চারিপাশে ফুল বিছানো ছিল না।. ছিলনা সানাইয়ের সুর, ছিলনা শঙ্খধ্বণী। মহল্লার নারীকণ্ঠের উলুধ্বনি।

কিন্তু মেঘলোক হতে স্বর্গের দেবতারা পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, স্বপ্নলোক হতে পৃথিবীর অমর প্রেমিক প্রেমিকা নেমে এসেছিল। শিরিফুরাদ, লায়লা-মজনু, সাজাহান, মমতাজ, লুৎফাসিরাজ এমনি কত প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের কোলাহলে আমরা নিজেদের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলাম না। প্রভাতে ঘুম ভাঙতে দেখলাম চারিধারে অসংখ্য পুষ্প। রাতের নীরবতায় কখন পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল জানতে পারিনি।

তুমি বলতে প্রিয়তমা আমরা চির বসন্তের রাজ্যে চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবো। আমরা কখনও বর্ষার মুখ দেখতে চাইবো না। আমিও তো বলেছিলাম জীবন সংগ্রামে হার মানব না।

মনে আছে তোমার? স্বর্গ লোকের ভেলায় বসে পুষ্পরথে আমার সেইসব মধুর রাত গুলোকে কিভাবে রাঙিয়ে তুলাম?

তোমার ভাই, হ্যাঁ—তোমার ভাই সৈন্য সামন্ত নিয়ে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে ফিরে গিয়েছিল রাজপুরীতে। সেখানে ফিরে নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হোলো। দূরে বসেই নিক্ষিপ্ত করলো তীর। বিষাক্ত তীরের ছোবলে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল রাজপ্রাসাদে আর আমাকে বন্দী করা হোলো কারাগারে।

একুশটা দিন সেই কারাগারে প্রায় অভুক্ত থেকে জানালার ফাঁক দিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আমি একজন মানুষ, খুব সাধারন মানুষ, লোকবল ছিলনা, অর্থবল ছিলনা, ছিলনা সৈন্য সামন্ত। ছিল শুধু তার প্রিয়তমার জন্যে অনন্ত প্রেম, অনন্ত প্রেম সাগরের মতই যার বিস্তৃতি। সেই প্রেম, সেই ভালোবাসা দিয়ে সে পারলোনা তার যুগ যুগান্তরের মরমিয়াকে বুকে বেঁধে রাখতে। এ যে তার কতবড় ক্ষত, কতবড় জ্বালা, এক তুমি ছাড়া কেউ বুঝবে না সুমি!

সমাজ, সংসার, দাম্ভিকতা এগুলোই কি সব? তার উপর কিছু নেই? মন বলে কিছু নেই, হৃদয় বলে কিছু নেই?

তোমার মনে আছে সুমি, প্রায় আমরা রাজপুরীতে পত্র পাঠাতাম। একদিন ফোনও করেছিলাম। তোমার মনে আছে বৃদ্ধ রাজার অসুখের সং-

যাদে কতদিন তোমার চোখ হতে মুক্তকণা ঝরে পড়েছিল। বলতে পারো শুধি তার মূল্য কি ওরা দিতো ? যাদের মধ্যে মমতা নেই, যাদের মধ্যে মানবিকতা নেই তাদের কাছে সততার কোন মূল্যও নেই। তাই বলে আজকের পৃথিবী-তো হৃদয় হীন হয়ে যায়নি।

আমি তো দেখেছি সাদা বকের দল যতোদিন মেঘলোকে মিতালি করেছে, পাশাপাশি থেকে। সেখানে স্বার্থ ছিলনা, ছিলনা অন্য কিছু। কিংবা ধারা ফুলেদের বিভোর হওয়ার মুহূর্তগুলো। ভীষণ ভস্মর যারা, কিংবা নোংরা তাদের প্রতিও গোলাপের আত্ম কেন্দ্রিকতা নেই। হ্যাঁ, তাই, তাই তো শুনতে পাই, শব্দ, ভাষা, অক্ষরগুলো রিম ঝিম শব্দে ঘুরছে, ঘুরছে আমাদি চারিদিকে।

এখানে সূর্য, ওখানে আলো, এখানে হাসি ওখানে অন্ধকার। পৃথিবীটা তো কোন দিনের জন্যে অসুন্দর ছিলনা। পৃথিবীর রূপ রং বাতাস তো কোন দিন মলিন ছিলনা। আজও নেই, হতে পারে না। যারা নোংরা করেছে, যারা মলিন করেছে, যারা অসুন্দর করেছে তাদের আমি মানুষ ভাবি না, সত্যিই তারা মানুষ নয়, তাই। তাই আবার রাজপুরীতে রাজকন্যেকে ঘুমিয়ে পড়তে হয় রূপোর কাঠির ছোঁয়ায়।

তোমার সমস্ত ছবি, তোমার সমস্ত কথা, তোমার সব কিছু বুকে জড়িয়ে ধরে রাতের তারাদের সংগে জেগে থাকি। ভেসে আসে সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর—ঘুমোও সবুজ সোনা, অনেক রাত হোলো।

কিন্তু ঘুম যে আসে না। রাতের প্রহর শুনতে শুনতে প্রভাতি আলো নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। বসন্তকালেও গান শুনতে হয় বর্ষার। শব্দগুলো ভেঙ্গে পড়ে সেই দীঘার সমুদ্রের উচ্ছসিত ধ্বনির মত। মনে পড়ে তাজ-মহলের শ্বেত শুভ্রতার কথা। কুতুবের পাশে কিছুটা সময়, আগ্রা, দিল্লী, ফতেপুর, সিক্রীর কেল্লার চারিধারের অদৃশ্য ছুটাছুটির কথা। কিংবা ধরো জামসেদপুরের সেই বিখ্যাত জুবেলি পার্কে জলের রঙিন ফোয়ারার উৎসব। এমনি কত স্মৃতি, কত হাসি গানের ফুলঝুরি। রাজপ্রাসাদে ধরে নিয়ে গিয়েছে তোমাকে। রূপোর কাঠি ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে রাখা হবে। ঘুমিয়ে থাকবে তুমি ? কিংবা ধরো যদি কখনও সোনার কাঠি ঠেকিয়ে তোমাকে জাগানো হয়—ধরো সেটা যদি গভীর রাত হয়, তুমি কি শুনতে পাবেনা

একটা চাপা, ' নীরব বোবা-কান্না !. একটা বেদনার কণ্ঠস্বর কিভাবে গুমরে গুমরে ম' হ্ন ?

তুমি বলো. কখনও কোনদিন কি সে বোবা কান্না শুনতে পাওনি ? রাতের চিন্তাগুলো তোমার ভেঙ্গে যায়নি ? আজ রাতে ! হ্যাঁ আমি শুনেছি স্বামীর কান্না। শুধু আজ কেন ! প্রতিদিন শুনতে পাই। প্রতিটি মুহূর্তে শুনতে পাই।

তুমি কি সারারাত জেগে গুমরে গুমরে কাঁদতে থাকো ?

আমি আর বাঁচার কথা ভাবি না। সমাজ, সংসার, মানবিকতা, মমতা, দয়া, সব পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছে তুমি। আমি তাই আর বাঁচার কথা ভাবি না। একদিন আত্মহত্যার কথা ভেবে ছিলাম। গভীর ভাবে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছি, স্বর্গলোক হতে নেমে এলো শিরিফুরাদ, এলো লুৎফা, হ্যাঁ যে মহীয়সী নারী তার মৃত নবাবের সমধি পাশে সারা জীবন, জীবন প্রদীপ জ্বেলে দিতেন, যিনি মিরনের বিবাহ প্রস্তাবকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে বলেছিলেন, গাধার পিঠে তিনি চড়তে পারেন না। আমি দেখতে পেলাম সেই লুৎফাকে। আমি দেখতে পেলাম শাজাহান প্রিয়া মমতাজ এসে দাঁড়িয়েছেন, শিরি, লায়লা, এমনি আরো কত—আমি সংখ্যা নির্ণয় করতে পারছিলাম না। তাদের পাসে তুমি এসে দাঁড়াতেই তোমাকে চিনতে পারলাম। তোমার সে কি অপরূপ মূর্ত্তি। চোখ মুখে সে কি স্বর্গীয় জ্যোতি। আমার হাতে একরাশ শ্বেত পদ্ম দিয়ে বললে মৃত্যু নেই।

আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম কার ? তুমি বলে উঠলে প্রেমের।

ঘুম ভেঙ্গে যেতে দেখলাম চারিদিকে গভীর অন্ধকার। পৃথিবী ঘুমিয়ে আছে। তুমিও কি ঘুমিয়ে আছো ? —তোমার চিরদিনের রাজা।

চিঠি পড়া শেষ। আমি বাইরের আকাশটা দেখতে গিয়ে বুঝলাম অনেকটা রাত হয়েছে। চিঠিটা তখনও আমার হাতে ধরাই ছিল। মধ্যেকার কিছু লেখা পড়া যায়নি। জলের ফোঁটায় যে লেখাগুলো মুছে গিয়েছিল।

কিভাবে লেখাগুলো মুছে গেল। লিখেছে না সদানন্দের চোখের জলে ? খুলে আবার শেষের দিকের অংশটা পড়তে গেলাম। পড়া গেলনা। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে মুছে গিয়েছে শেষের অনেকখানি অংশ।

কি আশ্চর্য—কিছুক্ষন আগেই তো শেষটুকু আমি খুব ভাল করে পড়তে পেরেছিলুম।

হাঁা—আমার খুব ভালোই মনে আছে। তবে? কোথা হতে জল এলো!

সদানন্দ!

সদানন্দ ভীষণ চালাক লোক তো? শেষ পর্য্যন্ত নাম ঠিকানা বিহীন চিঠিটা আমাকে গছিয়ে দিয়ে গেলো!!!

অলোক চট্টোপাধ্যায়ের **রকবাজ** গল্পের শেষাংশ

সে সুযোগ আর আসেনি। ওঃ, সেই বিষমাখানো কথাগুলো এখনো মনে আছে তার। রাস্তার লোফার রকবাজ কোন সাহসে তুমি এ বাড়ীতে পা দিয়েছ? বস্তীতে যাও, সেখানে আলাপ করার মতো অনেক মেয়ে পাবে। কুহেলীও থেমে থাকেনি সেদিন। বলেছিলো—জানো বাপী, এই জানোয়ারটাই দলের পাণ্ডা। রাস্তায় বেরুলে কেবলই তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে। দারোয়ানকে দিয়ে আচ্ছা করে—

কোন কথা বলেনি শান্তনু। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিলো অপরাধীর মতো; দারোয়ান এসে হাতটা চেপে ধরতে খেয়াল হলো। সে আজ কত-দিন আগেকার কথা অথচ মনে হয় বুঝি সেদিন।

নিজের সিটে ফিরে আসে শান্তনু। ওরা দুজন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন; শান্তনুকে দেখে নীরব হন। ফ্লাস্ক থেকে বিস্কুট কফি বের করে নিয়ে মৃদু চুমুক দেয়। সামনের ভদ্রলোক তখন ইতস্তত: করছিলেন কিছু বলার জন্য। পকেট থেকে গোল্ড ফ্লেকের প্যাকেটটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বের করে কি যেন ভাবে শান্তনু, তার পর দ্বিধাটুকু মন থেকে ঝেড়ে ফেলে একটি সিগারেট বের করে। ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হন, তারপর হঠাৎ চিনতে পারার ভান করে বলেন: আরে, আমাদের শান্তনু না?

ব্যঙ্গের হাসি হাসে শান্তনু। বলে: আপনাদের কিনা জানিনা তবে আমি শান্তনুই বটে। যাক, তাহলে চিনেছেন রকবাজ লোফারকে?

ভদ্রলোক আমতা আমতা করেন। কি যে বলো—তুমি হলে ভারত বিখ্যাত সার্জন ডাঃ শান্তনু ভট্টাচার্য্য। তুমি রকবাজ হতে যাবে কোন দুঃখে?

চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে শান্তনুর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুজনকে একবার দেখে নিয়ে বলে: আট বছর আগে বাড়ীর দারোয়ান দিয়ে মার খাইয়েছিলেন যে দুঃখে—

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই কুপ থেকে বেরিয়ে আসে শান্তনু। এদিক ওদিক তাকিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। কিছুতেই যেন সহ্য করতে পারছেনা ওদের, অথচ আশ্চর্য, ওদের চিন্তাই মনটাকে আনমনা করে তুলছে। অপমানের জ্বালাটা স্থির থাকতে দিচ্ছে না। বার বার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে সেই পুরোন দিনের লজ্জা।

কথাটা মা বাবার কানেও উঠেছিল। ফলে, বাবার লাঞ্ছনাও কম সহ্য করতে হয়নি। নিজের প্রতি অপরিসীম রাগ ঘৃণা আর হতাশা নিয়ে শান্তনু বাড়ী ছেড়ে ছিলো সেই সন্ধ্যায়ই।

তারপর ?

তারপর জীবনের আর এক অধ্যায়। সবই স্বপ্ন বলে মনে হয় আজ। মনে হয় অবিশ্বাস্য স্বপ্ন বুঝি শেষ হবে একদিন। সেদিন দেখবে সে আর ডাঃ শান্তনু ভট্টাচার্য্য নয়—বকবাজ লোফার শান্তনু। নিজের মনেই হাসতে থাকে। হ্যাঁ এটুকু স্বীকার করে দিব্যেন্দু রায়ের অবদানও তার জীবনে কম নয়। অপমানের কশাঘাত না এলে হয়ত চেতনা ফিরত না—দিক দর্শনও হত না তার।

ট্রেনের গতি কমে আসে। এবার জানতে হবে। পায়ে পায়ে নিজের কূপে ফিরে আসে শান্তনু। মেয়েটির চোখাচুখি হতেই সলজ্জ হাসি হেসে মেয়েটি কুপ ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ভদ্রলোক নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে বলেন : তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছিলাম শান্তনু।

অত্যন্ত নিস্পৃহ গলায় উত্তর দেয় সে—বলুন।

বলছিলাম কি তুমি তো একদিন আমার কুহেলী মাকে মনে মনে বিয়ে করতে চেয়েছিলে তা কুহেলী তো এখনো বিয়ে করেনি তাই যদি তুমি—

কথাটা শেষ না করেই হাসি মুখে থেমে যান তিনি। তার মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তনু বলে : হঠাৎ একটা লোফারের সংগে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছেন কেন ? রকবাজীতে ডক্টরেট পেয়েছি বলে ? তাছাড়া ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখুন বসতির কটা মেয়ের সংগে আলাপ করে বেরিয়েছি—

ট্রেনখানা পালটা ষ্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। স্যুটকেশ হাতে নিয়ে শান্তনু নামার জন্যে প্রস্তুত। কথার খোঁচাটা ভদ্রলোক নীরবে সহ্য করে বলেন—পাটনাতে তোমার ঠিকানাটা যদি—

শান্তনু হাসে। রকবাজদের কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকে না দিব্যেন্দুবাবু। সবরকমই তাদের ঠিকানা। খোঁজ নেবেন, কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন। আচ্ছা চলি নমস্কার।

ভীড়ের মধ্যে মিশে যায় শান্তনু। তবু দূর থেকেও তার মাথাটা উঁচু হয়ে চোখে পড়ে দিব্যেন্দু রায়ের।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কবিতা

কর তুমি ধুলা মোরে সবার পায়েরও তলে
আমি যেন লভি হে বিশ্রাম
চাহিনাগো সিংহাসন লভিতে ছলে বা বলে
বাড়াইতে চাহিনাগো নাম।

বিঃ দ্রঃ—কাজী নজরুল ইসলাম ও প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কবিতা দুটি দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্য প্রাপ্ত।

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা

সূতা দিয়া মোরা স্বাধীনতা চাই
বসে বসে কাল গুনি'
জাগরে জোয়ান বাত ধরে গেল
মিথ্যার তাঁত বুনি।

২৩/১২/৩২

এক্ষণত তেশট্টি

শেখ নজরুল ইসলামের কবিতা

॥ সেই দিন ॥

এখনওতো রাত অনেক বাকি হয়নি গান গাওয়া।
কটাদিন শুধু পরিচয় আর আলাপন গিয়াছে থেকে অনেক চাওয়া।
আবার তুমি যেদিন আসিবে ফিরে আমার হৃদয় তলে।
ঘুম হতে উঠবো জেগে অবাক নয়ন মেলে।
চোখের জলে সাগর হয়ে যায় তবুও তোমায় পাইনা কাছে।
কেইবা দেয় বলে ওগো কোথায় সে আমার প্রিয়া আছে।
বল আর কতকাল আর কতদিন এমনি বর্ষার গান গাইবো।
তোমায় দূরে রেখে আর কতদিন এমনি দূরে থাকবো।
আখি সীমানায় নেই ঘুম রাত জেগে তারাদের মিছিলে।
আমি তো জানি প্রিয়া ভাসিছো তুমিও চোখের জলে।
কত রঙিন স্মৃতি মনে পড়ে যায় মনে পড়ে কতো রাতের কথা।
তারা এসে ভেঙ্গে দিয়ে চলে যায় আজ রাতের নীরবতা।
নীরবে একা গেঁথে চলি মালা আসবে যেদিন দেবো পরায়ে
তোমায় সোনালী অধর দেবো আবিরে রাঙায়ে।

সোনালী রোদের বন্যা
পয়ঘাটি

॥ ঝাঁথার বিথীতলে ॥

ঝাউবিথী ঝাউবিথী ঝউবনে আমরা হেঁটে ছিলাম দুজনে
মাত্র দুটিদিন কুড়াইনি ঝিনুক, সমুদ্র স্নান তাও না
গাইনি একটিও গান তবুও তা ছিল রঙিন।
অনেকেই ছিল সেথা ছিল আরো অনেক আমরা তখন অন্য জগতে
তোমার মনখানা আমার মনে। ঝাউ বিথীর মধুগুঞ্জন বাতাসে
সময় কাটতো বালুকা বেলায় আমরা পাশাপাশি দুজনে।
প্রিয়ার বাহু বন্ধনে রাতের প্রহরগুলো কেটে যেতো
ঘুম পরী দিতো না দেখা প্রতিটি ক্ষনে থাকতে কাছে
যখন যেখানেই যেতাম কখনও ছাড়তে না একা।
সৈকৎ ছেড়ে বিদায়ের দিন বেদনা ব্যথায় ছিল ভরা
শুনেছিলাম সাগরের বেদনাভরা গান সেই কবে এসেছি চলে
দুদিনের সব স্মৃতি সংঙ্গে নিয়ে এবং রেখে এসেছি অনেকটা অভিমান

॥ সেই অনাগত দিনে ॥

এমন যে হবে সখি কে জানতো আগে
সুখের ফুল ঝরবে দুঃখের রক্ত রাঙা অনুরাগে।
কেঁদে চলা পথ শুকাবে শেষ হবে পথ চাওয়া
প্রিয়াগো একদিন হবে মিলন হবে কাছে পাওয়া।
হৃদয়ের বাঁধনকে পারে খুলিতে জন্মান্তরের বাঁধন যায়না খোলা।
সাগরে মিশেছে যে নদী, দূরে থাকলেও যায়নাতো ভোলা।

সোনালী রোদের বন্যা
ছয়টি

যায় যাক বেলা চলে হবে গো মিলন চাঁদ ঝরানো রাতে
সেদিনই মিলবো আমরা আবার একসাথে।
অনেক কেঁদেছি প্রিয়া আর অশ্রু পারিনা ঝরাতে
ভাবিনি কখনও প্রিয়া, এমন যে হবে সখি কে জানতো আগে
জানি, আসিবে একদিন আবার আসিবে ফিরে
আবার তুমি জ্বালিবে দীপ, আমার শুন্য ঘরে।
আজ প্রহর কাটে বুকে নিয়ে বিরহ জ্বালা
অশ্রু নয়নে কেঁদে চলি, গেঁথে যাই ফুলেরও মালা।
সব কল্পনা প্রিয়ার মনেরও মন্দির ঘিরে
জানি আসিবে একদিন, আবার আসিবে ফিরে।
তুমি এসেছিলে যেদিন, শুন্য মরুভূমি হয়ে ছিল মরুদ্যান।
নীরব নিশ্চল নদীতে সহসা ডেকে ছিল বান।
কূল হারা গতি নিয়ে ফেলে ছিলো বেসেছিলো ভালো।
দুটি হৃদয়ের চকমকি উঠেছিল
পাথরের ঘর্ষণে বাহির হয়েছিল জ্যোতির্ময়ী মনে।
আজ শুধু মনের দুয়ারে স্মৃতিগুলো ধরে রাখি
বেদনা চেপে রাখি তোমার মুখটি মনে করে।
জানি আবার তুমি আসিবে, আসিবে একদিন
তোমার নিজেরই ঘরে।

সোনালী রোদের বন্যা

সাতষট্টি

॥ স্নেহ সাগরে ॥

সেই প্রথম তোমায় দেখলাম মাগো
আমার হৃদয় সর্বস্ব কেড়ে নেয়ার
চরম মুহূর্ত্তে তুমি ছিলে সামনে।
তোমার স্নেহময়ী মূর্তি সামনে রেখে
কতদিন পূজা করে এসেছি-
কতরাত ছবি একেছি তোমার ভাব-মূর্তির
সেই তুমি নিষ্ঠুর ভাবে কেড়ে নিলে,
তবুও মাগো তোমার অভয় দান ভুলিনি
বলেছিলে ওরা যেন—
নির্য্যাতন না করে।
তোমার সেই কাকুতি ভরা অনুরোধ
হৃদয়ে জাগিয়ে ছিল এক নতুন আশা
ভেবেছিলাম মাতো আছেন আমার।
বন্ধ খাঁচায় একুশটা দিনের
প্রতিটি মুহূর্তে মনে হয়েছে—
মাতো আছেন আমার।
ভয় কি এমনি মা আছেন যার
বিচ্ছিন্নতার আকাশে শূন্য মনে আজও ভাবি
ভয় কি স্নেহময়ী মা আছেন আমার।

॥ আজ শুধু তারই পথ চাওয়া ॥

আমার দুঃখে আমিই কাঁদি সে ব্যথা বুঝিবে না অন্যজনে
বুঝিবে সেই শুধু, প্রিয়ারে দূরে রেখে গভীর রাতে কেঁদেছে নিজেরই মনে।
পথের মাঝে হারায়েছে তার প্রিয়াকে চিরসাথী হয়ে এসেছিল দুদিন আগে
বন উপবোন অরণ্যে উঠে তার কাঁদন রোল প্রিয়া তবুও না তার জাগে।
আমার দুঃখের নয় কেহ সাথী আহত প্রাণে একা গান গাওয়া
আমার ব্যথা করিবে সুজন যে আজ শুধু তারই পথ চাওয়া।

॥ সব কিছু নিয়ে গিয়েছে সেই পাখী ॥

আমার মনের ফুল বাগিচা শুন্য আজি ফাগুনে দোলে
দূরে গিয়েছে সে সব কিছু নিয়ে গেছে চলে।
হাসি নেই নেই গান ব্যাথার কাঁদন রোলে ভরা বুক
দূরে গিয়েছে সব কিছু নিয়ে গেছে সুখ।
আমার ব্যথার কণ্টকও জালা তাও নিয়ে গেছে সাথে
শুন্য হিয়া মোর ঘুম নেই আঁখি পাতে।
দিনের আলোয় নাই বা এলে রাতের আঁধারে দিয়ো গো ধরা
অনেক দিন দেখিনি, দেখিনি তোমার কাজল পরা।

॥ সে দিন জুবিলি পার্কে ॥

তোমার মনে আছে সেই জুবিলি পার্কের কথা।
তখনও অভিমানে আমরা পায়রা উড়াতাম
কিংবা ধরো তুমি বলতে আমার দৃষ্টিটা নাকি
বার বার জনতার মিছলে ছুটে যেতে চাইছিল। কিন্তু জানতে ঠিক
চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে আমার মানবীর কাছে
প্রিয়ার কাছে আমার দুটি নয়নের তারা
তারা দুটি দেখতে মানসীর মুখ সাগরিকার আঁখি পল্লব
মিষ্টি রঙের রোশ নাই। তুমি বুঝতে
দুটি আত্মা মিলে মিশে এক হয়ে একই ধারায় বয়ে চলার পর হতে
আলাদা ভাবা এবং ভিন্নকরে কিছু দেখা আর কোনদিনও সম্ভব নয়
সব জেনেও তবুও কি অসম্ভব ছেলে মানুষী করতে ?
আমার কিন্তু ভালো লাগতো, জানো ভীষণ ভালো লাগতো
মনের রঙগুলো রঙিন ফোয়ারার সংগে মিশে
আকাশের দিকে মুখ তুলে ছুটে চলতো অসম্ভব তীব্র জোরে।
সেই রঙ এবং আলোর বন্যায় থাকতো তোমার মনের মাধুরি
তোমার হাসি তোমার গান তোমার সেই দমকা বাতাসের মত
প্রানবন্ত হাসি যা আমাকে মনে করিয়ে দিতো
উচ্ছাস ভরা জলরাশি তরঙ্গের কথা।
গুলবাগে নানা বর্ণের বিভিন্ন আকারের বর্ষা গোলাপ !
তখন তো বর্ষাকাল, তবুও গোলাপের হাসি হাস মুখ
আমাদের মিষ্টি মুখের মত সেই মুখ। আসলে মনটাই ছিল চির বসন্তের
তাই বর্ষার বেদনাভরা দিনে রাতে বসন্তকে খুঁজে পেয়েছি
রাজপথ জনপথ স্মৃতি সৌধ মিনারে এবং সেই ছোট্ট ঘরের নরম বিছানায়

ওখান হতেই দূরের পাহাড় ঘিরে রেখেছিল আমাদের
চির বন্ধন সুখে আমরা সবুজের মেলায়
হিংসা মুখের ছবি দেখিনি ভাবতে পারিনি, মানুষ নিষ্ঠুর হতে পারে
বন্য পশু হতে পারে এবং বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে
দুটি মিশে যাওয়া আত্মাকে। যে মিশে যাওয়াটা ছিল
নদী এবং সাগরের মিলনের মতই চিরন্তন।
কি জানি আজও হয়ত জুবিলি পার্কের সেই বেঞ্চিতে
আমাদের মত কেউ বসে। কিংবা প্রিয়ার হাত ধরে
রঙিন ফোয়ারা দেখে কিনা অথচ কতদিন মনের একান্ত অবসরে
তোমার হাত ধরে চলে যাই সেখানে।
আমি ডাক দিলেই তোমার মন ছুটে আসে
আমরা চলে যাই গোলাপ বাগিচার পাসে
বসন্তের গোলাপকে দেখি তোমার হাসির বেদনায়
মনে মনে উচ্চারণ করি সবুজ পার্কে সেদিন বর্ষা
দেখেছিলাম বৃষ্টির বিন্দুতে ধূপলোঘাসে কাদা জমে গিয়েছিল,
আজ কিন্তু পার্কের কোথায় বর্ষা নেই বসন্ত এসে গেছে।
চিরন্তন ফিরে ফিরে এসে যাওয়া বসন্ত। অথচ আজকের অশ্রু বন্যার
ভাবছিলাম, বর্ষা বুঝি নামবে না। বসন্ত এমনি করেই আসে তাই না!
তুমি বলো? আমিই বলছি
আর আমরা বর্ষার মুখ দেখতে চাইনা।
একদিন তুমিই বলেছিলে মনে আছে ঠিক তেমনিই।

সোনালী রোদের বন্যা
একাত্তর

॥ খেতাব তুমিই পাবে ॥

শপথের নিয়ম ভুলে গেছি জনাব উষ্ণতার রাজ্যে আমি মহারাজ
মরনকেও কুর্নিস করেছি শাস্তি দিয়োনা আমাকে !
মেঘ মল্লিকার চূড়ায় কখনও তুমি মন নিবেদন কে
করোনি ফুলের মালা হয়ে পরতে ! আমি পরেছি।
নির্ভেজাল কেশধামে সুবাস তো নওনি কখনও আমি নিয়েছি।
কোমল কুমারী কন্যাতে স্নান করে ধন্য হয়েছি জনাব
আমাকে ফাঁসি দিয়ো না। দিলেও পশু নামের খেতাব তুমিই পাবে
আমি নই।

॥ শকুনের হাসিতে আমরা ॥

আমি তুমি তুমি আমি
সময়ের গতিতে সামান্য কটা মিনিট।
একটু আলো একটু বাতাস পৃথিবীর এক কোণে একটা ঘর
একটি আকাশ একটি সূর্য্য একটি চন্দ্র একরাশ মুখকে দেখতে চেয়েছিলুম
হিংস্র শকুনের দল তাদের নখ থাবা দিয়ে দলে আঁচড়ে কামড়ে
ক্ষত বিক্ষত করে চলে গেল বিচ্ছিন্নতার আকাশে ফেলে দিয়ে !
আমি তুমি তুমি আমি
আজ চন্দ্র সূর্য্য আকাশ দেখতে পাইনা ওরা হাসে ওরা আনন্দ পায়
আমারা অন্ধকার গুহায় বসে থাকি। ওরা তৃপ্তি পায় খুশি হয়
তুমি আমি আমি তুমি, আমরা
শকুনের হাসি দেখতে দেখতে একটি দিনের প্রতীক্ষায়
আগামী একটি দিনের প্রতীক্ষায় থাকি।

সোনালী রোদের বন্যা
বাহাত্তর

॥ মানসী ॥

তোমার মনের আঙিনায় আমি
নিজের মনকে খুঁজে পেয়েছি।
অনেক পথ অনেক মাটি পার হয়ে
তোমার মনের সীমায় এসেছি।
ভালবাসার এতো সুখ
বুঝিনি আগে।
প্রেমের সুরভি মন রাঙায়
হৃদয় রেঙেছে তোমার অনুরাগে।
মনের তুলি দিয়ে তোমার ছবি এঁকেছি।
রাতের পরে দিন, দিনের পরে রাত
তোমার কথাই শুধু ভেবেছি।
অনেক নদী অনেক পথ পার হয়ে
তোমার মনের কাছে এসেছি।

॥ সাগরে মিশে যাবে একদিন ॥

এতো যে নীরবতা দেখা নেই হয় কথা
রাত জাগা পাখী বলে যায়। এক সাথে থাকি
মুখে মুখ রাখি দূরে থেকে দুজনায়।
কবে যেন দেখা হবে কোন সে ফাগুনে আজ শুধু পুড়ে চলি মনের আগুনে
স্মৃতি আজ কথা বলে যায়। জানতে কি গো আসবে এমনি দিন
সুখের পৃথিবী হবে মলিন দূরে থেকে কাটবে সময়।
একদিন বর্ষায় ভেসে যায় নদী আপন হারা হয় তার গতি
মিশে যায় সাগর মোহনায় আজ ভাবি শুধু ভাবি
নও তুমি ওগো ছবি ছিলাম যেমন আছি তেমনি দুজনায়।

সোনালী রোদের বন্যা
তিয়াত্তর

॥ এমনি করে আর কত দিন ॥

মনের প্রিয়া সে শোনাতাম তাকে মনের কথা
গিয়েছে চলে, কোথায় তারে খুঁজে পাবো শোনাবো কাকে মনের কথা।
আঘাত দিয়ে নয় কিংবা ছিলনা দূরে ঠেলে দেওয়ার অলিখন
ছিল সারা জীবন ধরে বুকে ধরে রাখার প্রতিশ্রুতি
ছিল জন্ম জন্মান্তরের দাবি। তারও চাওয়া ছিলনা
নীরব করে দিয়ে বন্দী ঘরে বন্দিনী হতে তবুও নিতে হয়েছে বিদায়
দাম্ভিকতা, চক্রান্তের কাছে পরাজিত হয়ে। দুঃখের সাগরে ভাসায়ে
রাতের তারাদের কাঁদায়ে নিয়েছে বিদায়!
খুঁজে আজ আমি মায়া কে জানে আমার সেই প্রিয়া আজ কোথায়।
কোথায় গেলে পাবো দেখা আমার মনের সেই যে রানী
জীবন সব কিছু ভুলে গিয়ে ভুলে গিয়ে শুধু তাকাই যে জানি।
ব্যাকুল নয়নে আবেগ জোরে আমার মন বসন্তের দরদিয়া
আমার সব সুখের হাসি সে আমার সব দুঃখের মরমিয়া
কোথায় গেলে পাবো তাকে কোন পথে গেলে মিলবে দেখা
মেঘ বাদলা রাতে তাকেই খুঁজে চলি পথে একা একা।
আমার কাদল রোলে ছিন্নতার হৃদয় কলি
হৃদয়ের সমগ্র বাসনার তারই করপুঞ্জে দিয়েছি অঞ্জলি।
আর কত দূরের পথ সে জানিনা আর কত বাকি
আঁধার আলো পথে হেঁটে চলি তারই দুরাশায় আজও একাকি।
রাত জাগা পাখি ফিরে চলে আসেনা ফিরে আমার প্রিয়া সে
বন্দেনী! বন্দনা তার একটি জনে
কঠিন শক্ত বাঁধন রেখে গেছে আমারও এ মনে।
দূরে থেকে আর কতদিন এমনি করে চাও ওগো দুঃখের সাগরে ভাসাতে?
কতদিন আর থাকবো প্রিয়া এমনি একা?

মনে পড়ে জোছনা ভরা চাঁদের কথা সেদিনের সেই হাসি গান
মান অভিমানের পালা বদলের দিনগুলো
কত মিষ্ট সুখলিপি মধুগুঞ্জন মুহূর্তে।
আর আমি পারিনা এমনি করে বয়ে নিয়ে যেতে বেদনা অশ্রু
এমনি করে আর পারিনা জেগে থাকা তারাদের দেখতে।
অন্ধকারের পাখী হয়ে বসে থাকা আর নয় সহনিয়া প্রিয়া
সহনিয় আর নয় আর আমার একা একা চাঁদ দেখা।
আমার মনের মন্দিরে কত দিন আরাধনা করে পূজা দিয়ে এসেছি।
দেবতার তৃপ্তির পথে অতৃপ্তির বাসনা মরছে মাথাকুটে মরণেরও আগে।
বিধতার আদালতে আবেদন নিবেদন কত সহস্রবার হিসেব রাখিনি
বুক ভরা জ্বালা নিয়ে প্রতীক্ষায় কেটে যায় দিগন্ত বিস্তৃত সীমা রেখা
হয়নি সময় হয়নি বেলা তোমার আসার ?
তবে বলে দাও আর কতদিন এমনি করে চোখের জলের বন্যা নামাবো
আর কত দিন গুনে যাবো আকাশে তারাদের সংখ্যা
বলে দাও আর কত দিন আর কতদিন এমনি কাটবে একা।

॥ পাওয়ার পূর্ণতায় ॥

এসেছিল সে এসেছিল জীবনে সব হাসি কলতান।
গিয়েছে চলে বলে গেছে সব জীবনের অবসান।
থেমে গেছি—থেমে গেছে সব থামেনি বুকের জ্বালা।
চলে গেছে সে যায়নি শুকায়ে তার দেওয়া ফুলের মালা।
সব কিছু চলে যাবে যাবে না—প্রেম সে যে অমর অক্ষয়।
জীবনের পাওয়ার পূর্ণতায় আজ আর নেই মরনেও ভয়।

'সোনালী রোদের কন্যা'
পাঁচাগুর.

॥ একটি দিনের জন্য ॥

এ দেখাই শেষ দেখা নয়
আবার দেখা হবে চাঁদ ঝরানো রাতে
এ কথাই শেষ কথা নয়
আবার মিলব মোরা একসাথে।
একটি দিন ঝরে গেল
আসে নতুন দিন
প্রেমের রঙ গাঢ় হয়
হয় না কখনও মলিন।
এ লেখাই শেষ লেখা নয়
আবার হবে লেখা
এ দেখাই শেষ দেখা নয়
আবার হবে দেখা।
অন্ধকার আসে সাথে নিয়ে
নতুন একটি দিনের আলো।
প্রেমের বিরহে জ্বলেনি যে
প্রিয়ারে বাসেনি ভালো।

সোনালী রোদের বন্যা
ছিয়াত্তর

মনওয়ার সুলতানার (সরস্বতী সাহা) কবিতা

॥ প্রশ্ন ॥

আমি তো কোন দোষ করিনি যখন তুমি আমার নিঃসঙ্গতাকে ভেঙ্গে
ভরপুর যৌবনের খেলাঘাত করলে নিঃশব্দে আমি খুলে দিয়েছিলাম দ্বার।
করিনি কোন রকম অংহকার আমার পরশ রাগে তুমি বঞ্চিত
আমার সঙ্গ সুধার সে তুমি বিস্মিত, কখনও তুমি ফেরনি রিক্ত চিত্তে
কিংবা কোন তীব্র বেদনা বিত্যুতে। প্রতি চুম্বনে পেয়েছো স্বর্গসুখ,
আমার প্রেমে করেছি তোমায় দারুন উৎসুখ।
ওগো আমি তো কোন ছলনা করিনি, তবে কেন তুমি দূরে দূরে থেকে
আমার শরীরের প্রতিটি অণু পরমাণুতে জ্বালিয়ে দিচ্ছো বিরহের আগুন।
কি কারণে আমাদের ভালোবাসাকে, গভীর অন্ধকারে করে দিচ্ছো লীন।
কেন তুমি আমাকে শুন্য করে ত্রাসের বিকট ভয় দেখিয়ে
করতে চাইছ অথ পরাজয় কি কারণে তুমি বিদায়ের গানে
গভীর ব্যথা দিয়ে আমার প্রানে, ভুলে যেতে চাইছো আমার পরিচয়।

সাতারের

॥ তুমি পরাজিত নও ॥

তুমি পরাজিত নও প্রিয় হৃদয়ের সঞ্চিত প্রেম ভাণ্ডার থেকে
সমস্ত প্রেম সুধাই দিয়েছ প্রিয়াকে ঢেলে
"জাকাৎ" হিসাবে।
অথচই তোমার প্রিয়াত্মার কাছে
এটাই ছিল তোমার একান্ত করজ ।
বেলোয়ারী চুড়ির ঝলমলে রশ্মির মত
আমাদের প্রেম বৈজয়ন্তী সৌন্দর্য শোভা নিয়ে
বসন্তের দক্ষিনী বাতাসে দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠে।
এইতো আমাদের চরম সুখ !!
ব্যথিত বেদন আমাদের গঙ্গু করতে পারবে না।
তোমাকে আমি বরণ করে নিয়েছি
চিরসঙ্গী হিসাবে শত যুগ ধরে।
শোনিত প্রবাহ ধ্বনিত হচ্ছে চির বিজয়ের গান।
মনি মুক্তা খচিত খোয়াব ঘরের পালঙ্কে
তুমি আর তোমার বেগম।

নিজের অজান্তে ॥

সাগর নিজের অজান্তেই মনকে নিজেকে সঁপে দিয়েছি।
মনের অজান্তেই মনকে উন্মাদ করেছি।
আমি এখন প্রেমে অন্ধ এর বিচিত্র শোভা
আমার চোখে মুখে, আমি জাত জানিনা
"অভিজাত সেটাই শুধু জানি
আমি ধর্ম্ম মানিনা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম চলছে

আটাত্তর

এটাই শুধু মানি, তাই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে
নিজেকে নিজের সমাজ থেকে দূরে রেখে
নিজের অজান্তেই একটা মালা পরিয়ে দিয়েছি তোমার গলায়।
সাগর! তোমার এই ছলনায় কেন বুঝিনা তুমি কি তোমার ধর্মের ভয়ে
আসল নাম লুকিয়ে নিজেকে আমার স্বধর্মীর করে
সহ ধর্ম্মিনী করতে চাও? তবে আমার দেওয়া মালাটাই
আমার গলায় পরিয়ে দাও এই হোক আমার মনিহার

॥ বিষন্ন মন ॥

খালি হুইস্কির বোতলটাকে আর সহ্য হয়?
যদি ভরা থাকতো তবে না হয় অন্তত মরা নদীতে
বান ডেকে যেতো একবার।
গধূলির ম্লান আলোর মত ম্লান দেখাচ্ছে মুখের হাসিটুকু
পাতা বাহারের বাহার আর রজনীগন্ধার গন্ধ যেন কিছুই নেই
যৌবনের উজ্জলতা হৃদয়ের মধুর্যতা একে একে অসম্পষ্ট অস্বচ্ছ
হয়ে গেছে সব।
কি পাইনি, কি পেয়েছি তার হিসেব নিকেশ করতেই
কেটে গেছে জীবনের খানিকটা সময়।
মৌন বেদনায় খালি হুইস্কির বোতলটাকে
আর মিত্র মনে হয়না।
এর থেকে ভরা সোডাওয়াটারের বোতলটাই জানে
তাতেই অনন্ত প্রানে সাড়া জাগাতে পারবো
ফিরে পাবো, একান্ত ভাবে সেই নিজেকে।

উৎসর্গিত

॥ ভালোবাসার ডাক ॥

ভালোবাসা মোরে ডাকে হাতছানি দিয়ে
যেতে তার কাছে খুব কাছে।
চায় তাড়াতাড়ি আলিঙ্গন করে বেঁধে নিতে
নকল ভালবাসা ধরে ফেলে না পাছে।
ভালোবাসা মোরে চায় অন্ধ করে দিতে
ধুলি ছুড়ে মেরে চোখে, যদি কাউকে হৃদয়ে বেঁধে
সপুরুষ, সুমহান দেখে
ভালোবাসা মোরে চায় বোবা করে দিতে
কোন যাদু মন্ত্রের বলে
কথা যাতে না পারি বলতে তার দিকে চেয়ে।
ভালোবাসা চায় মোর গলে মালা দিতে
সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে
বিজন ঘরে চায় আবদ্ধ করে রাখতে
মহা শক্তি দিয়ে ভুলিয়ে।

॥ বসন্ত ॥

অনেক গুলো দিন উচ্ছাস বসন্তের আনন্দে
কেটে গেছে রঙে রসে, পুরস্কার কি পেলাম ?
পেলাম শুধু বুক ভরা বেদনা
বাস্তব যে এতো নিষ্ঠুরতা
কল্পনায় ও তা কল্পনা করা যায় না।
মনে হোতো পৃথিবী বুঝি সবুজ কচি পাতার মতই নরম

বাস্তবে কঠিন পাথরে ভরা, তা জানতাম না।
তবুও দেখি, বর্ষার ঝর ঝর বৃষ্টি ধারায়
ধুয়ে নিয়ে যায় মনের মলিনতা, দুঃখ ব্যথা কাতরতা।
আনন্দ স্মৃতি মধুর তৃপ্তি আনে মনে ক্ষণিকের তরে,
আবার ফিরে যায়, মন তার কর্ত্তব্যে
প্রিয়তমর জন্যে কাঁদে গোপনে।
অবাঞ্ছিত বেদনা কেন দগ্ধ করে প্রতি মুহূর্ত্তে
হৃদয়ের আগ্নেয়গিরিতে, মরুভূমীর বুকে।
আলোড়ন জেগে চলেছে সর্ব্বক্ষণ, সন্তর্পনে
গভীরতার প্রদীপ সিমান্তে।
আরধ্য দেবতাকে পেয়ে লিখে যায় পাথরের বুকে
ঘৃণার অশ্রুতে বেদনার গান।
মনের মন্দিরে সাজিয়ে রাখে টক্ টকে লাল
বসন্তের দিনগুলোকে অন্তহীন অসমাপ্ত যার রূপরেখা।

॥ জাফরি ॥

জাফরির আড়ালে ওরা কারা কোটি কোটি বছর আগের সৃষ্টি রহস্যের,
নায়ক-নায়িকা, আদম এবং ইভ, আরবের মরুভূমির মরীচিকার স্বপ্ন
গোধুলীর ছায়ার মতই ম্লান। বিভ্রান্তের মত ছুটেছে সবুজ প্রান্তরে
তবুও দিগদর্শন হলোনা। পেছনের পারদ উঠে যাওয়া দর্পনে
নিজের রূপটা স্পষ্ট ভাবে ধরা যায়না। ইশকের উত্তাপে নীলাভ আলোয়,
খুলে যায় মনের বন্ধ দরজা, ক্ষত বিক্ষত পৃথিবীতে শোক গীতিও
স্তব্ধ হয়ে থাকে।
খট্খটে রোদ্দুরে শুকনো জমিতেও জল শুষতে চায় না।
উদ্দীপ্ত বহ্নিশিখা ছুটে চলে সত্যি প্রেমের নিদর্শন নিয়ে।

একাশি

॥ আমরা ॥

এই সোনা ঝরা দিনে মিষ্টি মধুর বাতাসে
যৌবন আবেগের রোমান্সে
আমি কি তোমায় আপনি বলতে পারি ?
তাই তুমি দিয়েই শুরু করলাম,
তুমি দিয়েই শেষ হবে, এ জীবন প্রদীপ।
তুমি আমার হবে, আমি তোমার হব
তুমি আমি মিলে একাকার হয়ে
সৃষ্টি করবো, ভালোবাসার ইতিহাস
জীবন সায়াহ্নেও খেলবো আমরা যৌবন খেলা।
ভুলেও মনে করবো না হারিয়েছি মত্ততার স্বাদ
মন আমাদের হবে চির নবীন
চির হরিৎ বৃক্ষ পত্রের মত
এসো অসীম আকাশের নীচে তুমি আমি হাত ধরে
গেয়ে যাই জীবনের গান।
সে গানে আশা নিয়ে ছুটে আসবে
আশা নিয়ে যত সব ব্যর্থ প্রেমিকের দল
আশ্বাস বানী পেয়ে মন তাদের নেচে উঠবে আনন্দে
তাই গাইবে এক, নতুন জীবনের গান।
আমি তুমি মৃদু হেসে
চেয়ে দেখবো দুচোখ মেলে
আনন্দে জেগে উঠা তারাদের কোলাহল।

॥ জনতার মিছিলে ॥

মানুষের মিছিল দেখেই আমি পরিতৃপ্ত
আটতলার একটি ঘরের ছোট্ট জানলা দিয়ে
জীবন্ত মানুষের জীবনের অভিঘাত হাতড়ে চলা
কি যে দুঃসহ ! ভাবতেও পারি না— নিষ্ঠুরতার পোড়া রঙ
এতো ভয়ংকর এবং এতো বেশী বেদনা দায়ক।
চিররুদ্ধ কারাগারে কি পাপে বন্দী হয়ে আছে এ জীবন ??
কারা রক্ষীদের চেয়েও তারা ভয়ংকর
যারা ব্যাক্তি স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে চাইছে।
চেয়েও দেখেনা তারা মানুষের মিছিল জনতার কোলাহল।
ভাবেনা মনের সব রঙ পাষণ্ডের যাঁতাকলে পিষ্ট হলে
মানুষের বুক কতটা বেদনায় কাঁদে !!
পাষাণ বুকে অন্যের সুখ অসহ্য !
তাই ওরা বন্দী করে রাখে
রাখে, চার দেওয়ালের বদ্ধ
চিররুদ্ধ আবহাওয়ার আবদ্ধ করে।

॥ তোমার জন্য ॥

তুমি জীবনকে উপভোগ করছ আর আমি শুধু বেঁচে আছি
একটি জিনিস বুকে নিয়ে সেটা হোলো তোমার স্বপ্ন
তুমি পৃথিবীর রস শোষণ করছ আর আমি শুধু ভেবে মরি
একটা কথা মনে করে, সেটা হল তোমার প্রশ্ন।
তুমি যৌবনকে নিয়ে খেলা করছ
আর আমি যৌবন আগলে রাখছি

একটা আশা হৃদয়ে নিয়ে সেটা হল তোমার জন্য।
তুমি বিশ্ব ভ্রমণ করছ আর আমি হারিয়ে গিয়েছি
একটা নিষ্ঠুর ভয়ংকর জাগায় এসে
সেটা হলো তোমার মনের গহন অরন্য।
তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ে হাসছ আর আমি শুধু কেঁদে মরি
একটা দুঃখ মনে করে, সেটা হলো, আমাদের ছাড়াছাড়ি।
তুমি সব ভুলে আনন্দে আছ, আর আমি শুধু গুমরে মরি
একটা ব্যথা প্রাণে নিয়ে, সেটা হল তোমার বাড়াবাড়ি।

॥ সে জীবনের বুঝি অন্ত নেই ॥

জীবনে তো হার মানতে চাইনি তাইতো অনুভব করিনি
শীতের রাতের ভীরু ঝাউবনের পাতা কাঁপার অনুভূতি।
জীবনে হাসতে চেয়েছি তাই শত দুঃখের মাঝেও
মুক্ত বিন্দুর মত সচ্ছ দু'ফোটা চোখের জল ঝরে পড়েনি কখনও
সেই দু'চোখের দীপে জালবো আলো আর আশা
হৃদয়ের সততা আর প্রেম নিয়ে, গড়া হবে একটি সংসার।
এ পুলকিত জীবনে, বিশাল বক্ষের স্পন্দনে
চির সাথী হয়ে থাকবে, দুর্দ্দম ক্ষুধা আর ভালোবাসা,
অনন্ত কাল ধরে যে সাধনা ছিল
সেই সাধনা আজ রূপ নিল একটি মধুর মিলনে।
প্রেম আজ সফল আর মিলন শুধু অগ্রগতির পথে,
যে সোনালী সুন্দর রঙে, আজ রেঙেছে যে জীবন
সে জীবনের বুঝি অন্ত নেই, নেই তার সীমা বদ্ধতা।

॥ হঠাৎ মেঘ হঠাৎ বৃষ্টি ॥

এই অকালে হঠাৎ মেঘ হঠাৎ বৃষ্টি কেন ?
বুঝি স্তরে স্তরে আরো মেঘ জমবে
বৃষ্টি হবে ধরার পরেও নিঃশেষ হবে না।
আকাশের কোলে সূর্যের হাসি চাঁদের স্নিগ্ধ দৃষ্টি
সবই কি তবে বিদায় নিয়েছে!
বিদায় নিয়েছে কি পূর্ণিমা রাতের আভা ভরা উচ্ছ্বাস।
দিগন্তের রক্তিম আলোও কি
আর অভিমান করে রাঙিয়ে দেবে না আমার প্রতিক্ষিত মনকে।
তবে কি নিয়ে বেঁচে থাকি ?
না! এই অকাল বর্ষণ থেকে যাক, থেমে যাক তার নিষ্ঠুরতা
না হলে আরো বর্ষণে বন্যা হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাক
আমার নগণ্য দেহটাকে
তার সংগে সংগে হয়ে যাক
অপেক্ষা জীবনের অসহ্য যন্ত্রণা।

॥ চির বিজয়ী আমরা ॥

কত যুগ ধরে যমুনার পাশে স্বর্গীয় প্রেমের নিদর্শন নিয়ে
দণ্ডায়মান এই তাজমহল!
জলে তার প্রতিবিম্ব পড়েছিল দিগন্তের সোনালী আলোয় !!
পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তুমি আর আমি তাজের সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম
আর বিস্ময়ে অভিভূত হচ্ছিলাম সাজাহানের গগন চুম্বী প্রেমের নিদর্শন দেখে।
প্রেমাবেগে আমরা আরও নিবিড় ভাবে দাঁড়ালাম।

তোমার উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম বার বার
আবেগে জড়িয়ে ধরে বলেছিলে
এই তাজের মতই উচ্চ এবং পবিত্র আমাদের ভালোবাসা।
দৃঢ় বন্ধনে বাঁধা আছি আমরা জীবনের সুখ দুঃখের হাসি কান্নার দড়িতে
প্রাণ দিয়ে আমরা বর্ষাবাষ্প ব্যাকুলিত সময়কে চিরতরে বিলুপ্ত করবো।
নিষ্ঠুর বাধাকে পদদলিত করে আমরা উত্তীর্ণ হব জীবন পরীক্ষায়।
চিরকাল অসীম আনন্দে ভেসে যাব জীবনের সিক্ত চামেলির মাধুরীধরায়!!
চির বিজয়ী অমৃত পান করে আমরা ভালোবাসার
প্রদীপখানি জ্বেলে রেখেছি নির্মল হৃদয়ের পবিত্র মন্দিরে।

॥ সমুদ্র সৈকত ॥

আঁধার সন্ধ্যায় অনন্ত অন্ধকারেরর মধ্যে সমুদ্র সৈকতে তুমি আর আমি
চারিধারে গভীর নির্জনতা আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র
আর পাশে মত্ত জলস্রোত!
গভীর আলিঙ্গনে চুম্বনে নেশায় পাগল হয়ে যায়
দু'জন অকৃত্রিম প্রেমে নর ও নারী।
ঝাউবনের থর থর কম্পনে মৃদু মন্দ বাতাস দোলা দিয়ে যায়
অন্তরের গভীর স্থানটুকু পর্যন্ত!
কি অনন্ত আনন্দে শিহরণে পুলকিত করে বার বার,
তোমার দৃঢ় বাহুতে বাঁধা, প্রিয়ার কোমল দুটি হাত
চিরদিনের যুগ যুগের জন্যে সঁপে দিয়েছি
তার হাতে আশা আকাঙ্খা সব কিছু তোমার পাদ পদ্মে।
সৃষ্টির প্রারম্ভেই আমরা উভয়ে উভয়ের কাছাকাছি বাঁধা আছি প্রিয়
কোন মস্কারই এর বিঘ্ন ঘটাতে পারে না
মানুষের চক্রান্তও হবে ধূলিসাৎ।

॥ মানুষ কেন মরে ॥

শুধু এ রহস্য জানতে মানুষ কেন মরে
শত চিন্তার জালে মনটাকে করেছি যাযাবরের মত অস্থির
শুনতে চেয়েছি মানুষের বুকের শশব্দ দাপাদাপি আর কান্না
কিন্তু বেঁচে থেকেও কেন মরা! এবং সেই মৃত্যুর অব্যক্ত ক্রন্দন
কেন যে বুঝি না, অসীমের প্রাণে মন চায় সারাটা জীবন।
আকাশ কুসুম স্বপ্ন নাই বা থাকল
তবু থাক সাফল্যতার ইঙ্গিত
মানুষ সেই আনন্দেতেই ফিস্ ফিস্ পাতার মর্মরের সুরে
নিজের অজান্তেই হাসবে।
দুঃসময়ে যদি না থাকে আশ্বাস, তবে কি মানুষ মরে ?
মরে বুঝি অপার পক্ক ফলের মত
অসময়ে গাছ হতে পড়ে।

॥ সফল স্বপ্ন ॥

ভাঙ্গা বেড়া টপকে পা কেটে অনেক রক্ত ঝরিয়ে
এসেছি তোমার কাছে বহু চোখ সিক্ত করে
নতুন প্রেম উদয়ের ইতিহাস নিয়ে।
আমার স্বপ্ন আজ সফল চলেছি নতুন উদ্দীপনায় নতুন স্বাদে
বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটায় আমি আহত হয়েছি যে কতবার
বিদ্যুতের ঝলকানিতে ভুলেছি পথ
তবুও জোনাকির আলোর পথ চলে এসেছি
তোমাকে বরণ মালা পরাতে।
এখন তুমি হাসছ, এখন আমি হাসছি
আর পেছনে রেখে এসেছি
আঁখিজলে ভরা কটা মুখ

॥ কবিতা একান্ত আমার ॥

কবিতা আমার কবিতা সে, একটি পাতা লিখে হয়না ছেঁড়া তার
আমার কল্পনায় লেখা সে কবিতা, সে কবিতা আমার।
কবিতা আমার কবিতা সে, একটি রাতের বসন্তকে, যে নিজেকে নয়
সুরভি সন্ধ্যার বসন্তকে. বেসেছে সে নিজের করে ভালো।
কবিতা আমার কবিতা সে, কবিতা আমার সেই মুগ্ধ রাত
যেরাতে আমি দেখেছিনু স্বপ্ন, পেয়েছিনু ভালবাসার উগ্র আস্বাদ।
কবিতা আমার কবিতা সে, কবিতা আমার সেই কবি মন
ধরা দিয়েও যে পালিয়ে থাকে ভয়ে
একান্ত আমার সেই একান্ত আপন।

॥ তুলনা ॥

অগণিত কবিতার ডালি সাজিয়ে তোমাকে আবিস্কার করলাম
শ্রেষ্ঠ কবিতা রূপে।
অসংখ্য তারার সংগে তোমাকে তুলনা কোরলাম ধ্রুব তারার সংগে,
এই অভিশপ্ত জীবনে ওগো তোমার পদরেখা যেন
ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত স্বর্গীয় প্রেম সুধা পান করে
তোমাকে বরণ করেছি যুগ যুগান্তরে ধরে।
অসম্ভব পৌরুষত্ব দেখে প্রিয় তোমাকে হৃদয়ে মানলাম
বীর পৃথ্বিরাজ সম।
উপন্যাসের চরিত্রে দেখেছি উদারতা মাধুর্যতা পূর্ণ নায়ক রূপে,
বাগিচার বিভিন্ন ফুলের মাঝে
তোমার গুনের তুলনা করি
সুন্দর গন্ধরাজের সংগে।

—•—

সাবধান ! নগর বাসী সাবধান !

—শ্রীমৃগাঙ্ক শেখর রায়।

সজাগ থাকো নগর বাসী
(আজি) দস্যুরা তবদ্বারে।
লুণ্ঠন কারী ওরা
পিচ্ছিল পথে আসিয়াছে তাই
রক্ত হাতে বারে বারে।
শিকারী মার্জ্জার সম
সম্ভাব্য সুযোগের সন্ধানে
ব'সে ওৎপেতে।

সততার নামে
স্বার্থের ছুরিতে দেয় শান।
ন্যায় নীতি বিচার বোধ
তুচ্ছ এ পৃথিবীতে
নারীর শাহী অস্ত্রাঘাতে খান্ খান্।

সাবধান ! নগর বাসী,—
এসেছে চরম দুর্দ্দিন।
গড়ে তোল,.................
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
প্রতিবাদ,
প্রতিরোধ,
প্রতিশোধের
দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড।

এর জন্যই কি সংগ্রাম/শ্রীমৃগাঙ্ক শেখর রায়

পঙ্গু বিকলাঙ্গ জীবনের
কি প্রয়োজন ?
ক্ষয়িষ্ণু ভগ্ন প্রায় সমাজ ব্যবস্থায়
পশু আর মানুষ
দুইই সমান।
জৈবিক প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি,
সামান্য ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সংগ্রাম,—
বর্ত্তমান সমাজের মূল উপজীব্য।

আবহমান দুনিয়ায়
"সভ্যতার" শুভ্রতার অন্তরালে
"মিথ্যার" আবাস :
শুনবনা,
দেখবনা,
বলবনা,
এই তিন মন্ত্র—
বস্তুবাদী জীবনের কঠিন শপথ।

"আমার অবস্থিতিই সর্ব্বাধিক প্রয়োজন।"
এর জন্যই কি.................. ?
জীবন মরণ সংগ্রামের প্রস্তুতি
পথে-প্রান্তরে, নগরে-বন্দরে।

সোনালী রোদের বন্যা
সবাই

অতএব মানসী ॥

অসিত কুমার বসু

আমার হৃদয়-বাগানে
অজস্র ফুল ফুটেছিল।
জুঁই-চামেলী, সন্ধ্যা-মালতী
সব ফুল ফুটেছিল।
আবার আমারই অজান্তে
তারা সব অকালে ঝরে গিয়েছিল!

হয়ত তারা বিশ্বস্ত বাগান ভেবে
আমার হৃদয়-কাননে স্থান করে
নিতে চেয়েছিল। কিন্তু হায়—
স্বল্পায়ু সেইসব ফুলদের
একটাও আমি বাঁচাতে পারিনি!
তাই আবার আমি
নূতন ফুলের সন্ধান করেছি।

প্রেম-ভালবাসা বুঝি এমনি করেই
হৃদয়-কাননে আসে।
আবার অকালে ঝরে পড়ে!
তখন আমারই অজান্তে আমি
একের ভালবাসা হারিয়ে
অন্যের ভালবাসা খুঁজে মরি।
তাকে ভালবাসি!
অতএব মানসী
তোমায় আমি ভালবাসি।

॥ বন্ধুর বিদায়ে ॥

শিশির কুমার মাইতি।

প্রিয় যদিও অপ্রিয়   স্মৃতির প্রদীপ জ্বালিও
বিবর্ণ বিষণ্ন বাসরে ;
পুস্ত সাথীর ব্যথা   হয়েছে তুচ্ছ কথা
শূন্য সে মন-আসরে।
নিত্য ছিল যাওয়া-আসা   তারে নিয়ে কাঁদা-হাসা
আজ সব অশ্রুপাত :
মনের নায়ক হারা   বিশীর্ণ বিবর্ণ যারা
তারি দ্বারে পাতে হাত।
নতুন সাথীর খোঁজে   নতুন মনের ভোজে
কেটে যাবে কটা দিন ;
দান মান সব শেষ   তুচ্ছ বসন বেশ
ফেলে হবে নিঃস্বহীন।
তবু প্রতি প্রাতে মোর   কমল ভাঙিবে ভোর
সুখ স্বপনে ম্লান মুখ ;
সজল সরল মন   হৃদে ভাসে অনুক্ষণ
ভেবে পাই মহা সুখ।

॥ মনে করো ॥

তাপস কুমার মণ্ডল।

মনে করো এই পৃথিবীটা
নবীন পান্থশালা,
মনে করো এই আলোটা,
শেফালী ফুলের মালা

কতজন ভাসে নবীন আশায়
নতুন স্বপ্ন দেখিয়া
কতজন হাসে, কাঁদে হতাশায়
স্বপ্নভঙ্গে জাগিয়া।
কত যে প্রাস্থ হইয়া আস্ত
নিভে গেছে ঝড়ো বাতাসে,
কত যে নবীন হইয়া প্রবীন
মিশে গেছে চির উদাসে।

হৃৎপিণ্ড ॥

শ্রীমান বসন্ত বৌরী

বুকের মাঝখানটা চিরে
ছিঁড়ে এনে দেখো ;
মোর হৃৎপিণ্ডটা কত গাঢ় লাল !
ঠিক যেন বৃন্তচ্যুত রক্ত-গোলাপ।
ধারালো ছুরির ডগাটা দিয়ে
হৃৎপিণ্ডটাকে দু'টুকরো করে দেখো,
ভিতরে রয়েছে আমার
জমাট কালো রক্তে গড়া
একটি শাশ্বত : প্রেমের মানস-প্রতিমা।
হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ওঠে রক্তের তুফান।
দাউ দাউ করে জলে
অনুশোচনার অগ্নি-শিখা।
হৃৎপিণ্ডের বাঁ পাশে নীড় বেঁধেছে
একটি প্রেমের চকোরী।

আমার হৃৎপিণ্ডের সবটুকু রক্ত নিঙড়ে
পিপাসা মিটিয়েছি রক্ত-পিপাসুর,
ফলিয়েছি রক্ত-ফসল ভিজিয়েছি মাটি,
লাল করে দিয়েছি পুবের আকাশ,
পলাশের পাপড়ি
প্রিয়ার সিঁথে,
মায়ের চরণ আর শাড়ীর আঁচল,
ইতিহাসের প্রচ্ছদপট আর রাজপথ॥
রাঙিয়েছি নিপীড়িতের ফ্যাসাশে চোখ,
বিবর্ণ ললাট,—
মিছিলের নিশান, ফেষ্টুন আর
দেওয়ালের পোষ্টার।
হৃৎপিণ্ডের রক্ত দিয়ে
মুছে দেব পৃথিবীর কলঙ্ক-রেখা,
এঁকে দেব মৃত্যুর কপালে
রক্ত-তিলক।
মাতৃপূজার যজ্ঞ-বেদী-মূলে
তাজা হৃৎপিণ্ডটাকে দেব উপহার!

॥ রূপসী কবিতা ॥

—অনিল কুমার চক্রবর্ত্তী

রূপসী কবিতা অয়ি, এ কি অভিনব
অনুপ্রাস-ছন্দ :- যতি-মিল-সুর হারা !
নিরালংকারা রূপসী, বিধবা কি কব,
যুগধর্ম্মে বিবশা কি তুমি। নিল যারা
তোমার ভূষণ হরি'— কভু কি তাহারা
হেরিয়াছে রূপ তব ? তবে কি সাহারা-
মরীচিকা ভ্রমে কিবা ভ্রমিয়াছি আমি,
কৈশোর যৌবনে যবে রামধনু রংঙে
হৃদয় রঞ্জিত হলো দীর্ঘদিন-যামি
ছন্দঃ সুরে-গন্ধে-রূপে-লীলায়িত ঢঙে !
বর্ত্তমানে রূপহীনা, ভূষণ বিহীনা,
তুমি কেন ছন্দঃসুরে হেরি এত দীনা।
অয়ি কবিতা রূপসী, চক্ষে দানো আলো ;
ছন্দঃ-সুরে সবাকারে বাসি যেন ভালো।

॥ যাত্রা কর শুরু ॥

—প্রবীর সরকার

আমার যৌবন অতীত প্রায়—
তিরিশটি বছর চলে গেছে জলস্রোতের মত।
কিন্তু এই তিরিশ বছরে আমি কি পেয়েছি,
যৌবনের আনন্দ কি উপভোগ-করতে পেরেছি ?
দেখেছি কি কোকিল-ডাকা তিরিশটি-বসন্ত,
দেখেছি কি তুষারাবৃত পর্বত চূড়ার ঝলমলে রৌদ্র,

দেখেছি কি নীল সমুদ্র মাঝে অস্তাচলগামী সূর্য,
দেখেছি কি ইষ্টারের প্রাকালে পুষ্পিত চেরি বৃক্ষ ?
—কিছুই দেখিনি।
দেখেছি শুধু কপট আনন্দে মুখর এই বিশ্বকে।
তবে আর দেরি কেন ?
এস, এবার যাত্রা শুরু করি—
বাকী চল্লিশটি বছরতো দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে
পারব কি এর মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ উপভোগ করতে
পারব না।
তবুও যেটুকু পারব
সেইটুকুই হবে আমার অনন্তকালের পাথেয়,
পরলোকের সুখ, আনন্দ।
এবার তবে যাত্রা শুরু করি ॥

॥ একক ॥

—নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য্য

তুমি, আমি পাশাপাশি অনেকক্ষণ
দেহ ও মন কাছাকাছি অনেকক্ষণ
বলা কথা অনেক
অ-বলা কথা আরও অনেক
দেহ ও মন নিয়ে খেলা সর্বক্ষণ
স্বপ্ন ও অনুভূতি প্রতিক্ষণ।
তোমার আমার চোখের ভাষা এক
তোমার আমার ভবিষ্যৎ এক
তোমার আমার মনের কথা এক
তুমি আমি হরিহর আত্মা !

শ্রীমতি বিমলা বসুর কবিতা

॥ রুদ্ধ বেদনা ॥

অভিযোগ নাহি মোর কিছু,
নাহি মোর কোন বেদনা।
যদি কিছু ব্যাথা থাকে মনে,
থাক! মনে তাহা জমা ॥
লাঘব করিতে চেওনাকো ব্যাথা
ব্যাথার ব্যাথীও হলে,
কমিবে না কিছু, ভরিয়া উঠিবে
দ্বিগুন ব্যাথার থলে ॥

॥ সঠিক ॥

রাত্রির পরে দিন আসে
দিনের পরে রাত্রি,
জন্ম আগে, না মৃত্যু পরে,
মৃত্যু আগে, কি জন্ম পরে,
বলতে ওগো পারো কে, বা
মিথ্যা কিবা সত্যি ॥

একশত সাতান্ন

॥ ভিক্ষা ॥

কেহ তো আসেনা   মোর ঘর হতে
  কেহ তো খোঁজেনা মোরে,
আমি শুধু হায়,   তৃষাতুর হ'য়ে
  বেড়াই ঘুরি চারিধারে।
যারে ভাবি মোর,   অতি সে আপন
  সেই সরে যায় দূরে,
অজানিতে দেখা   তবু হয় চেনা
  অতীব স্নেহেতে ঘিরে।
নাহি কোন বাদ   নাহিকো বিবাদ
  সবে দেখে সমচোখে,
নিজ জন শুধু   খুঁজিয়া বেড়ায়
  কোথা দোষ মম দেখে ;
অচেনা যে মোরে   বাসিবে ভালো
  সেও সহেনা তবু,
বলিতে পারেনা   করোনা ওকাজ
  ওর কোন গুণ নেই কভু।
যত দোষ আছে   সবই হয় মোর
  সবেরি কারণ আমি
ওরা সব জ্ঞানী,   করে নাকো ভুল
  ধরাতে তাইতো গুণী।
নাহি কোন জ্ঞান   নাহি কোন গুণ
  বুঝিতে পারিনা, কি, ভাল,
ওহে দয়াময়,   কৃপা করে তব
  দেখাও আমারে আলো।
তোমার প্রাসাদে   বড় গুণী জন
  যেতে পারে তব কাছে,
অতি অভাগা   আমি শুধু হায়
  নাহি লাগি কোন কাজে।

॥ বন্ধন-মুক্ত ॥

পথিক এসো, এসো মোর সাথে
সুদূর দিগন্ত প্রসারী পথে,
ভয় ভাবনা তুচ্ছ করি সব,
ভুলে যাও তবে নিজ সম্পদ।
ফেলে দাও তবে গর্ব্ব অহঙ্কার
আছে যাহা কিছু অনিষ্ট সাধিতে।
তাকায়ে থেকোনা আর বন্ধ মায়াতে ॥
পথিক ! এসো, এসো মোর সাথে ॥

সংসারের কর্ত্তব্য নাহি হয় শেষ,
পুরুষানুক্রমে তুমি ধরে রবে রেশ ;
মনুষ্যত্বের মান থাকে নাকো কিছু
মানুষ বলিয়া তব পরিচয় শুধু !
তাকায়ে থেকোনা আর মিথ্যা মায়াতে,
পথিক ; এসো, এসো মোর সাথে ॥

মানুষের পরিচয় চাও যদি দিতে
সংসারের বন্ধনে বেঁধোনা নিজেকে,
জাতি, মান ভুলে, সমব্যাথী হবে,
আলোকের পথ তবে আপনি পাইবে !
মিছে কেন চেয়ে থাকো বন্ধ মায়াতে ॥
পথিক এসো ; এসো মোর সাথে ॥

কাজ তবে নহে শুধু ক্ষুদ্র সীমা মাঝে,
দিগন্ত প্রসারী পথ রয়েছে সম্মুখে।
নিজেরে মুক্ত কর, মোহ মায়া হতে।
পথিক এসো ; এসো এসো মোর সাথে,
সুদূর দিগন্ত প্রসারী পথে ॥

॥ পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো ॥

পবিত্র ভূষণ সরকার

অনেক ভালোকথা বলতে জানো মুখোশের আড়ালে
নগ্নরূপ ইতঃস্তত: নড়ে ওঠে কেউটে সাপের ছোবলে
ভেবেছো চোখে ধুলো দিয়ে বোকা বানিয়ে দেবে,
ভেবোনা তুমিও রেহাই পাবে ;
নিজের জালে নিজেকে জড়িয়ে তুমিও শেষ হবে অচিরে ।

একটু সাবধানে চলো ভাই
ষ্টীলের ছুরি শান দিচ্ছে মনুষ্যত্ববোধ আর ঔচিত্যবোধ
আর আমার বিবেক
একদিন ধার উঠবে, আর তীক্ষ্ণ হবে ছুরির ডগা
একদিন তোমার সৌখিন মুখোশ টেনে তুলে
বিবস্ত্র কোরে তোমার বুকে ছুরি আমূল বসিয়ে দেবে
আর্ত্তনাদে আর্ত্তনাদে আকাশ ফাটিয়ে দিলেও
সেদিন কেউ আসবেনা তোমায় বাঁচাতে
তোমার চিতায় কেউ ফুল ছড়াবে না
কেউ স্মরণ করবেনা তোমায় পোড়া মুখ ।

ভাই একটু ভেবে চলো
আর কপট চাতুরি ছাড়ো
আর পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো ।

॥ একটি যুবকের অকাল মৃত্যু ॥

শ্রীঅঞ্জন সরকার

একটা খবর কেউ শুনেছেন ?
যদিও কাগজে, রেডিওতে
বের হয় নি।
যদিও খবরটা সম্পূর্ণ চেপে দেওয়া হয়েছে।
তবুও সবাইকার মুখে মুখে
কিছুটা বা ভয়ে গোপনে
হৃদয়েতে স্থান করে নিয়েছে
একটা খবর—
একটা যুবকের অকাল মৃত্যু।
হ্যাঁ সবাই জানি।
কি কষ্টে কেটেছে ওর শিশুকাল
কিন্তু এত কষ্টেতেও ওর স্বাস্থ্য
হয়ে উঠছিলো সুন্দর থেকে সুন্দরতর
কিন্তু মাত্র পঁচিশ বছর পুরণ হবার
আগেই তাকে খুন করা হলো
লক্ষ লক্ষ জোড়া বিস্মিত চোখের
সামনে, তাকে গলা টিপে হত্যা করা হলো
অথচ, আমরা পারলাম না।
জানাতে পারলাম না।
শুধু কানা ঘুসা চলছে—
একটা যুবকের মৃত্যু।
তবে আসুন—
এই যুবকের মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে
শপথ নিই, প্রতিজ্ঞা করি, স্বপ্ন দেখি
নতুন একটা সুস্থ সবল শিশুর।

॥ জীবানন্দ দাস, তোমাকে ॥

নির্মল কুমার সিংহ মহাপাত্র

তোমার সৃষ্টির অর্ঘ্য নিবেদিলে চিরন্তন করে
হে কবি, হে বিশ্বপ্রেমিক :
জীবনের আনন্দ সঞ্চয় অমর তুলির টানে
রেখে গেলে চির অক্ষয় করে
কাব্যের অমরাবতী তীরে।

যুগে যুগে 'ধানসিড়ি নদী'টির ধারে
পাঙচিল উড়ে যাবে-উড়ে যাবে বক
শুভ্র ডানা মেলে, দিগন্তের পানে ;
তারি মধ্যে হে বাঙালী
দেখা যাবে তোমার প্রকাশ।

'শ্রাবস্তীর কারুকার্য মাখা' কোন মুখ
কিম্বা কোন 'অন্ধকার বিদিশার নিশা'সম কেশ
যদি কোন দিন কোন ক্ষণে,
প্রতিভাত হয় কোন বঙ্গললনায় ;
সেইদিন জীবনবীণার সূক্ষ্ম তারে
কোন এক বঙ্গসন্তানের হৃদে
ধ্বনিত হইবে সেই নাম—
তোমার সৃষ্টিতে অমর
সেই 'নাটোরের বনলতা সেন'।

প্রয়াসী ॥

মহঃ রফিক

মেরুদণ্ডে জমে ওঠা ভয়াল তমিস্রা বদরক্তের প্রসারন
তোমার একাগ্র নিষ্ঠা খাড়ন্ত ছুরির তীক্ষ্ণ ডগায়
বুকের মধ্যে হামান দিস্তার শব্দ সচকিত উন্মাদনা
লৌহ বেষ্টনী গরাদের অভ্যন্তরে লাখো লাখো
শানিত জ্বলন্ত সেই চোখ।
শুনেছো বর্ত্তমানে পিতামহদের আর্ত্ত কণ্ঠস্বর
মশাল আলোয় লাল হবে সবুজ নক্ষত্র।
বর্ত্তমানে সুযোগের প্রতীক্ষায়
কাটিয়েছো নির্জলা ত্রাণ্ডির রাত
অথবা আফিঙ্‌ নেশায় আচ্ছন্ন পীতাভ মোমেজ্জা
সার্কাস মাষ্টারের ইলেকট্রিক শক্‌ খেয়ে খেয়ে
এখন শান্‌-পান্‌-পোড় কঠিন ইস্পাত
সুপ্ত আত্মায় অনুসরন ধ্বনি বাস্তিল পতন।
সেই সব ক্রম অনুসারী—
শিথিল রক্তের তন্ত্রীতে প্রয়াসী
টাওয়ারের নতুন চূড়া
কাঁকর মাটির কঠিন সিংহাসন ॥

॥ কবিতার জন্য ॥

শ্রীনিতাই চন্দ্র রায়

কবিতাকে পেতে চাই হাতের মুঠোয়-
তপঃসিদ্ধ তাপসের ঐশী আশ্বাসে,
কবিতার কোলে যেন স্বপ্নরা ঘুমোয়
পথশেষ পথিকের প্রশান্ত প্রশ্বাসে।

আমি তো আকুল-প্রাণ 'ও'র দেখা পেতে,
'ও' কখন উঁকি দেবে বুকের আঁধারে ?
আমি রাত খুঁজে চলি 'ও'র উৎস পথে,
উচ্ছ্বসিত ফোয়ারায় 'ও' কেন নামেনা ?

আমি স্বাতী নক্ষত্রের পথ চেয়ে হাটি
'ও'র স্পর্শ পেতে কভু গায়ে মাখি মাটি,
শিশুর দেয়ালা থেকে স্বপ্নিল যৌবনে
'ও'র ঘ্রান ছুঁয়ে যায় লিলুয়া পবনে—

সেই তীর্থে উত্তরণ আর কবে হবে
যেথা হব প্রাপ্তকাম, তৃষা দূরে যাবে ?

॥ বন্দী শিবিরের বন্ধুকে ॥

শ্রীমতী শুভা চন্দ

বন্দী ! এই তো সেই সুযোগ
এবার পালিয়ে যেতে পার ।
এই পালাবার শেষ সুযোগ
কঠিন হাতুড়ীর আঘাতে
হাতুড়ীর পর হাতুড়ী মার ।

এখন প্রহরীরা ঘুমের ঘোরে ঢলে গ্যাছে
আর উপর ওয়ালারা ?
আওরৎ এর আঙ্‌রাখায় মুখ রেখে ;
উপলব্ধি করছে স্তনের বিন্যাস
এইতো সুযোগ মার ।
এবার তোমরা হাতুড়ি মেরে
পালিয়ে যেতে পার ॥

॥ চিন্তাগুলো আমার ধোয়ো অভিধানে ॥

ধ্রুবজ্যোতি বাগচী

সেই সময় এসো,

দিশচক্রবাল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যখন
সবুজ প্রলেপের দারুণ অভাব
রেকর্ডপ্লেয়ারে অনুরনিত প্রেত প্রেতিনীদের
অট্টহাসির সুর
পৃথিবীর পাখীদের যখন ডানার শিশির হারিয়ে
ফিরে যাবার পালা।
আমি ডায়েরী খুলে একগলা কলহদানীতে ডুবে
সুর শুনবো........
আমার হাট করা বুকের পাঁচরাগুলো দিয়ে
হা-হা করে রাত নামবে
তোমার শরীরে, প্রত্যেকটি অবয়বে

দেখবে, মৃত্যুর মতো এক দীর্ঘ প্রশান্তি
জেনে নিচ্ছে তার অপরাধ.... ।

॥ ভাগ্যের দোষে ॥

অমলেশ ভট্টাচার্য

আমি যখন লেখার সব সরঞ্জামগুলো সাজিয়ে,
লিখতে বসলুম টেবিলে,
তখনই একটা ঘূর্ণি বাতাস ঢুকে ঘরে
সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে গেল নিমিষে!

আমি যখন ওকে ভালবেসে,
ঘর বাঁধতে চাইলুম একান্তে,
তখনই ও অন্য জায়গায় বিয়ে করে,
আমাকে কাঁদিয়ে চলে গেল দূরে!

আমি যখন একদিস্তে কাগজ কিনে,
অ্যাপলিকেশন করতে লাগলুম বারে বারে, উচ্চ চাকরীর মোহে,
তখনই আমার নিজের চাকরী থেকে,
বরখাস্ত হলুম ছাঁটাইএর দৌলতে !

আমি এখন ভাগ্যের দোষে,
সবকিছু খুইয়ে, সবার অপমান সহ্য করে,
একটা কিছু করবার আগ্রহে, ঘুরছি মিথ্যে মিথ্যে,
বাঙালীতো—তাই কাঁদি শুধু ঘরের নিভৃতে।

॥ এ রাত ॥

অতুল দাস

ধরনীর সূর্য-স্নান সাঙ্গ হল,
সাঙ্গ হল সরসীর জল-খেলা।
তারপর এল এ রাত।
এ রাত এল নবীনে-নতুনে,
কনক ভূষণে—
যে রাত ওদের একান্ত কামনার।
কালের দ্বন্দ্বে এ রাত মুছে যাবে,
সে রাত আসবে—
আসবে রাতের পর রাত।

শিথিল হবে বর-কনের,
আঁচলের মন্ত্রপুতঃ গিঁট।
এক দিন মুছে যাবে 'বর-কনে'ব আখ্যাটাও,
নতুন করে আখ্যা পাবে 'জনক-জননী'ব!
তবু যেন মনের স্মৃতি কোঠায়
সে রাত থাকে এ বাত হয়ে—
জীবনেব শেষলগ্নের পাথেয়।

॥ উত্তর তিরিশ ॥

পার্থ সারথি

বছর মাস দিন প্রহর ক্রমশঃ গড়িয়ে গেল
দ্বিতীয় জগতের মুখোমুখি   নিহত প্রজ্ঞা
আহত আয়েশ   অনিবার্য খেলা
অথচ এ জন্ম অমন কিছু খেলা নয়
যদিও মোগল বাদশাহের মত আফিঙ্ গিলে
চুঁ মেরে পড়ে আছি আজ অনেক বছর
জলের অক্ষরে   বিলাসী বয়স
উত্তর   তিরিশ
সূর্য্যটা মুখ লুকিয়েছে উটপাখির বিন্যাসে
যন্ত্রনার পেণ্ডুলামটা দুলছে নিষ্ঠুর কৌশলে
যৌবন যেন দৌ-নৃত্য
অথচ মাটি ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে
চাঁদটা ক্ষয়িষ্ণু দৃষ্টির আড়ালে
এবং কিছুই বোঝা যাচ্ছে না ঐকান্তিক ঐশ্বর্য্যে
যদিও জীবনটা এখন প্রপ্নতাত্ত্বিক ফসিল
মনে হলেও   রুধির মস্তিষ্কে
উত্তর তিরিশ

সেখ সাদরে আলমের কবিতা

॥ রাত্রি বাস ॥

একটানা চলতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ি।
ওদেরকে বলি ; ছোট হোক এই পথ।
মামুলী রঙের কুয়াশা ভেদ করে কিছুটা বোদদুর
এক পশলা বৃষ্টীর মত সহসা নেমে আসুক।
পোড়ো বাড়ীটার কোণ থেকে সবে যাক
ক্ষুদ্র জীবগুলো। সহজলভ্য হোক পাথেয় ;
অন্ধকাব শেষে জেগে উঠুক গৃহস্বামী
তার রাত্রিবাস ছেড়ে ॥

॥ পরিবর্ত্তন ॥

সব কিছুর সাথে পবিবর্ত্তন আন
গোটা কবিতাটাবই। শুধু
গদ্যেই হবে পরিচয় এ পৃথিবীব।
আগুন আর শিল্পটুকু থাক
বেঁচে যাবে কারিগর ॥

॥ সমাধি ॥

জামানা পাল্টে গেছে ; বললে
হাস্নুহানা। প্রভাত হবাব সঙ্গেই
নাকি সুরে মোরগ ডেকে উঠবে।
রাতের আঁধারে ডেকে যাবে তোমার সমাধি ॥

॥ রাত্রি গভীর ॥

ভাস্কর ভট্টাচার্য্য

রাত্রি এখন গভীর ; চারিদিক নিস্তব্ধ ;
নিস্তব্ধ ঐ কোলাহল মুখর রাস্তাগুলো,
যেগুলো সকালে প্রচুর জনসমাগমে হয়ে উঠেছিলো মুখর,
এখন তারা স্তব্ধ।

জোনাকীপোকাগুলো ঘরময় উড়ে বেড়াচ্ছে,
আর হয়ত চেষ্টা করছে এই সূচীভেদ্য অন্ধকারকে দূর করতে
কিন্তু পারছে না ;
তাতে অন্ধকারই বাড়ছে মাত্র।

ঐ যে দূরে রাত্রির নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙে শোনা যাচ্ছে
পেচকের উন্মত্ত পৈশাচিক জয়োল্লাস,
আর হতভাগ্য শিকারটির করুন ও মর্মভেদী শেষ আর্তনাদ।

জানলার ধারে বসে আছি,
আর ভাবছি রাতটা কখন শেষ হবে,
কখন ঐ আকাশটা লালে লাল হয়ে উঠবে ;
আর তারপর উদিত সূর্য্য আস্তে আস্তে প্রখরতর হবে,
গর্তের ভেতর ঢুকে যাবে সেই সব জীবের দল,
যারা আলো সহ্য করতে পারে না।
আর শুনতে পাবো না এই পৈশাচিক জয়োল্লাস,
কিম্বা হতভাগ্য কোন শিকারের শেষ আর্তনাদ।

॥ নির্জন তটিনী ॥

গীতা ভট্টাচার্য্য

নাই আজ কোলাহল
তটিনী নিরুত্তর
ভগ্ন হয়েছে সব—
সাজানো কত ঘর ॥

কত শত বনলতা
কত কত ফুল
ধু-ধু করিছে সদা
শুধু ভগ্ন কূল ॥

নাই নাই সেথা আর
কথার গুঞ্জন,
হয়না দেবের আরতি....
সেথা শুধু যে নির্জন ॥

জ্বলে নাকো বাতি আজ
আর ঘরে ঘরে
সবাই নিশুতি সেথা
মগ্ন আঁধারে ॥

জাগিবে কী ওরা আর ??
সেই বৃক্ষলতা ?
জাগিবে কী পুনঃ আর
হারানো—বসুধা ॥

॥ সে কি সুখী যে জন উদাসী ॥

অভিজিৎ ঘোষ

একদা অবৈধ হবার ভয়ে অচেতন শৈশবেই
জীর্ণমেরুদণ্ডে বিপন্ন করুন ডাকে তুলেছিলাম আর্তনাদ
আর অসংহত জটিলতায় অস্থির অস্থির প্রচলিত অস্তিত্বের
বিষাক্ত বিশ্বাসে ভেবেছি আমিই জাতিস্মর
যে কিনা অভিশপ্ত শরীরী প্রতিচ্ছায়ায়
প্রস্ফুটিত মৃত্যুর ঘনিষ্ট স্বপ্নের কাছাকাছি।
যার আত্মার সঞ্চিত অনুভবে হা হা, অট্টহাস্তে
বার বার প্রতারিত উদার উপেক্ষায় শুভ্র গৈরিকে প্রচণ্ড প্রলয়
খুলে যায়, নরকের দ্বার।

আর মমতার সেই অপমানে
পরিচয়হীন আত্মজ আত্মহত্যা করে অনুরক্তের মতো
অতর্কিত আক্রমণেই মেনে নেয় অবৈধ দুঃখ নিয়ে সত্য ভেবে
যে ভাবে আমার মৃগনাভি স্মৃতির দাবী
পথিমধ্যে লুঠ হয় স্বার্থভক্ত পূজারীর হাতে
যে ভাবে আমার স্বপ্নের পবিত্র রক্তপাত কবিতার
অটুট পাণ্ডুলিপিতে অমরত্ব ঘোষণা করে।

আজ সেই আমি লুপ্তগর্ব মাতৃস্নেহে ক্রমাগতই নেমে যাচ্ছি গভীর অতলে
যে ভাবে প্রকৃতির নৃত্যের তালে তালে মাটি ফিরে এসে মাটির ভিতরে
পুরুষের অশান্ত ক্রন্দন অনিন্দিত ছন্দে ফিরে চায় ধ্রুব অধিকার
যে ভাবে আলোড়িত অন্ধকার স্বাহার নূপুর ছন্দে ধুলি ঝড় তুলে দিগ্বিদিকে
অপরূপ হিরন্ময়ী বিভায় মিশে যায় ধুম্রনীল অগ্নিকেতুতে।

আর লোকে বলে :
অবোধ ভিখারী নাকি বড়সুখী উদাসী বৈরাগী মন্ত্রে।

॥ নদীর খেলা ॥

গীতা ভট্টাচার্য

উৎপাটিত বৃক্ষ মূল
টল মল নদী কূল ?
নদী আজ উন্মাদিনী ।
কিসের পেয়েছে সাড়া
চলেছে আজ জ্ঞান হারা
কোথা যে তার স্থিতি । ?
শত শত ঢেউ তুলি
শেষ ক'রে গৃহগুলি
ধাবিত কার পাণে !!
মরণের নাহি ভয়
হইতেছে আপন জয়,
তাই এত স্ফূর্তি চিতে ॥
নাহি যাবে আদালতে
না হইবে বিচার শেষে
চিরন্তণ মুক্ত সে—যে ॥

॥ দু'টি মিছিল কাল সকালে ॥

নির্মল সেনগুপ্ত

দু'প্রান্ত থেকে দু' মিছিল
মাটিকে কাঁপিয়ে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে
চলার ভঙ্গী বলে দেয় ওরা
দুর্দম অভিযাত্রী !

দুই শত বার

সামনে ওদের বাধার পাহাড় সারি সারি,
পথ দুর্গম, রক্ত পিছিল, যেতে হবে বহুদূর—
নিশ্চয়ই জানি ঘনিয়ে আসবে
রাত্রি !
আকাশের মুখে তবুও মায়ের হাসি.
ধ্রুব তারাখানি ওদের পথ দেখাবে—
ভোরের আগেই ওরা খুব কাছাকাছি
পা মেলাবে একসাথে।
সূর্য উঠলে পদ্মা গঙ্গা মিলে মিশে একাকার
সময় আসবে স্বর্গের চাবি জয় করে আনবার !!

॥ প্রেম ॥

অমলেশ ভট্টাচার্য্য

তুমি এসেছিলে
শরতের শিউলি ঝরা প্রভাতে,
ধীরে ধীরে সবুজ ঘাসের উপর পা ফেলে
সকালের সোনালী আলোতে !
আমি ঘাসের উপর তোমার শুভ্র
পা দু'খানি দেখে,
বুঝেছিলুম তুমি আমার কাছে এসে,
আমার কাঁধে ঠাণ্ডা কামনা বিহীন হাত রেখে
বলবে,—'কেমন আছো ?'
আমি হাসব শুধু ক্লান্ত বিষন্ন মুখে
তোমার ধপধবে মুখের দিকে চেয়ে !

॥ পল্লীর ইজ্জৎ হানী ॥

অমলেন্দু রায়

পল্লীর দ্বারে দ্বারে
খুঁজেছি অনেক কবিতার ভাব
পল্লীর মাটি খুঁড়ে।

গ্রামের আকাশে, গ্রামের বাতাসে
গ্রাম্য প্রাণীর প্রতি নিঃশ্বাসে
আহত প্রেমের রক্ত পলাশ
বাসি ফুল সদা ঝরে,
খুঁজেছি অনেক সরস কবিতা
পল্লীর প্রতি দ্বারে।

কথাও কবিতা কেঁদেছে বিরহে
ভেঙেছে পরাণ বোমার আঘাতে
আজ পল্লীর বুকে ঘুরিছে কবিতা
বেইমান পরিচয়ে,
খুঁজে পাই নাই প্রানের কবিতা
পল্লীর সৌরভে।

মৃত পল্লীর ইতিহাস
শুধু আধুনিক পরিহাস
পল্লীর সেই মৃত দেহ আজ
পড়ে আছে এই গ্রামে,
সেই পল্লীর সুখ বিকায় শহরে
এক পয়সার দামে।

॥ আর আমি আলোর স্বর্গে যাব না'ক ॥

নন্দ দুলাল আচার্য্য

আর আমি আলোর স্বর্গে যাব না'ক।
অন্ধকারের শরীরে নিজেকে মিলিয়ে
অরণ্যের প্রতিবেশী হবো।
তবু,
অসাবধানে চলাফেরা;
ভুলক্রমে আলোর সিঁড়িতে পা দিলেই,
একটা দর্পনের বিতাড়নে স্থিরতা হারাই।
মসৃন কাঁচের গায়ে ভেসে উঠে দুটি চোখ।
হিংসার আগুনে স্নাত সেই চোখ অশ্লীল, কুৎসীত॥
কুৎসিত দাঁতের ফাকে গলে গলে ঝরে পড়ে লালা।
মানুষের অবয়বে হায়নার নির্মোক জড়ানো।
আঁতকে উঠি আমার এ কদাকার প্রতিচ্ছবি দেখে!
আমি এতো অসুন্দর বিবেকের মসৃন দর্পনে?

॥ আত্মরূপ ॥

অঞ্জন মজুমদার

আমি নিজেকে উপলব্ধি ক'রেছি
আত্মচেতনার অদ্ভুত শক্তিতে
অস্থির স্ফীত প্রস্তরের মতো পথে প্রান্তরে তাই
বার বার জ্বেলেছি আগুন।
আমার চেতনার রশ্মিটা
একশো পাওয়ারের হওয়া সত্ত্বেও

দুই শত পঞ্চের

অন্ধকার রাতকে আলো দেখিয়েছে,
বিপ্লবের আগুনের লাল রঙে।
তোমাদের ক্ষুদ্র জোনাকীর আলো
আজ নিষ্প্রভ নিশ্চল নয়।
বিপ্লবের লেলিহান শিখায়
জ্বলছে এবং জ্বলবে শোষকের কঙ্কাল।

॥ আর বোলনা 'জেগোনা' ॥

তুহিন শংকর চন্দ

শীত আও, রাধাটি একটু তুলে দাও
তোমার শুভ্র দুটি স্তনের নির্য্যাস নিই
আরেকবার।
অপসরীর বুকের আঁচর
আমায় ভুলাতে পারবে না কোনদিনও :
জানালাটা একটু খুলে দাও,
হাওয়া উঠুক।
তমসায় ভরে যাক দিগন্ত
তারপর
একটু ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে
তাকাই তোমার দিকে।
এখন আর বোলোনা
তুমি জেগোনা।
পবিত্র আত্মাটিকে নষ্ট করোনা !

আমি বড় তৃষ্ণার্ত।
আমায় একটু খাবার জল দাও।
এখন আর অমনটি করে বোলোনা
তুমি 'জেগোনা'।

পঁচিশ বছরের স্বাধীনতা ও আমরা ॥

শ্রীসলিল কুমার দত্ত

পঁচিশ বছর,
কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের আবির্ভাব :
কিন্তু মোদের বুকের ছাতি হয়নি দরাজ,
লিক্‌লিকে পায়ে হাঁটছি পাশা,
মনের শান্তির ঘটেছে তিরোভাব ॥

রজত জয়ন্তী,
অর্দ্ধ ভারতবাসীর নেই রজতে পরিচয়,
ওরা অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, হাহাকারে মরে;
অশিক্ষার অন্ধকারে ক্লীবত্ব পায়,
জীবনটা শুধু কান্না—আর কিছু বুঝি নয়?

আমরা স্বাধীন,
মনে নেই ভয় করিনা কাউকে পরোয়া ;
তাই ঘুষখোর, মুনাফাখোর, ভেজালদার দেশ লুটে,
বেকারে বেকারে দেশ ছেয়ে যায় ;
ব্যাপারটা হয়েছে যেন নিতান্ত ঘরোয়া।

গদীতে সরকার
হুমকি ছাড়ে, হুকুম মানাতে নারে,
কেবল সততার খোলসতলে ছিনিমিনি খেলা,
শোষণ, তোষণ, পোষণ যেন শাসনের পরিচয়,
সংসারের চাকা চলে ভিক্ষা করে দ্বারে।

নিপীড়িত যারা,
জাগে বার বার চায় ন্যায্য অধিকার,
কিন্তু রক্তের নদীতে নেয়ে, হয়ে মৃত্যুঞ্জয়,
খুঁজিছে নেতৃত্ব এক দুর্জ্জয় মহান,
নবীন নাও ভার, পূজারী সার্থক স্বাধীনতার।

দ্বাই শত সন্তেরু

॥ যেহেতু ॥

সোনালী দত্ত

আচ্ছা, তুমিই বলো
সেন্ট পার্সেন্ট উচ্ছ্বাস গলা তাপে
জীবনকে গালিয়ে নিয়ে খুশীর ফানুস হয়ে
ফেটে পড়া আর
বিরহের রঙহীন ফ্যাকাশে সমুদ্রের
মুহূর্তের কতগুলো অস্থায়ী ঢেউ হয়ে
ভেঙ্গে যাওয়া কি এক ?
না, এক নয়।
যেহেতু, আনন্দ ও বিরহ এক নয়।
যদিও বিরহেরও আছে
একাকীত্বের আনন্দ
তবে, তা হলো কারুন্যের বেদনা মিশ্রিত।
তাই, আমি সাদা খুশীর উচ্ছ্বাসে
ফানুস হয়ে ফেটে যেতে পারি।
যেহেতু, ফানুস আনন্দের প্রতীক।
হয়ত বলবে, হৃদয়ের স্রোতেও
মাঝে মাঝে আনন্দের ঢেউ-এর
উদ্দামতা ওঠে।
বলব, কিন্তু সেন্ট পার্সেন্ট ব্যর্থ প্রেমের
অসহ্য উত্তাপে
জীবন সমুদ্রের ঢেউ-গুলোও তো
ক্ষণিকের আয়ু হারায়।
যেহেতু, বিরহ হচ্ছে প্রণয়ের পরের
অন্ধকারাচ্ছন্ন দুঃখময় কালো সময়টা ॥

॥ কফি হাউসে ॥

অমিয়ধন মুখোপাধ্যায়

শুনেছি

সভ্যতার উত্তাপ ছোটে

কফি হাউসে

কফির চুমুকে চুমুকে।

মানুষের ভিড় গুণে

চেনামুখ খুঁজে খুঁজে

অকারণ শব্দ ধ্বনি

সমুদ্রের গর্জনে।

কফির উত্তাপে

শিরা উপশিরায়

সাহিত্যের উচ্ছাস জাগিয়ে তোলে

যেমন দৈব কৃপায় অন্ধ পায় দৃষ্টীর তীক্ষ্ণতা।

অনেকের মত আমিও এসেছি

বালির রাজ্য মাড়িয়ে উটের পিঠে

কফি হাউসে

তীক্ষ্ণ উচ্ছাস নিয়ে

ক্লান্ত শরীরে

সাথে করে স্বরচিত কবিতার পাণ্ডুলিপি।

দেখেছি

বেকার যৌবন

কফির চুমুকে কি ভীষণ উত্তাল

ওদের মুঠোয় বিশ্বসাহিত্য

যেন এক ঝাঁক বাকসিদ্ধ পাখি।

সাহিত্যের প্রগতি

টগবগিয়ে ছুটে চলেছে
টেবিলে টেবিলে
আমি যেন নিঝুম হয়ে পড়ি
বাকসিদ্ধ পাখীর কলোরবে
কারণ আমার সূর্য্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ ॥

॥ কে নেবে এ বিচারের ভার ॥

তপন চৌধুরী

কসাই খানার সারিবদ্ধ ঝুলন্ত
ছাগ শিশুরা আজ নিহত ।
তীব্র-অব্যক্ত যন্ত্রনায়
জমাট রক্ত তার ঘোলাটে চোখে
ঝরে তাদের অজস্র প্রতিবাদ ।
তারা চায় বিচার !
কিন্তু, কার কাছে 'এ' বিচারের ভার ?
মানুষ-না-দেবতার !
নিহত ছাগশিশুদের খাদক-ঘাতক
সে-তো মানুষের দল,
বড়ো কথা সে প্রতিটি রক্তে রঙ খরিদ্দার
দেবতা ? —আমি মহান,
কিন্তু নির্বিকার !
তাই আজ বাংলার পথে ঘাটে,
জল্লাদের হাতে গড়ে উঠে
যত মৃত-মানুষের কংকাল করোটির পাহাড় ।
তারাও পায়না বিচার ।
কেননা প্রতিটি করোটি নিয়ে বেচা কেনা করে
এই হিংস্র মানুষেরই দল !!

দুই শত কুড়ি

॥ আসামের আয়নায় বাংলা ॥

তপন চৌধুরী

সর্বত্র আসাম আর কাছাড়ে,
কি বীভৎস যন্ত্রনায় প্রত্যহ
স্বাধীনতার পঁচিশটি বসন্তের তাজা রক্তে;
এমনকি গর্ভের ভ্রূণেরা নিঃশব্দে
কত মহান একুশে ফেব্রুয়ারী গড়ে।
ওখানে ভূমিষ্ঠ সন্তানের সুতীক্ষ্ণ চিৎকার,
বিনিদ্র রাতের প্রতিটি মুহূর্তে; মুমূর্ষ মায়ের মুখে
হিংস্র হায়েনার দল নৃশংস মৃত্যুর ছবি আঁকে।
আর এখানে ? মানুষ নামে ক্লীবেরা,
যত উলঙ্গ আদম আর ইভ, প্রত্যহ
বাংলার সবুজ মাটি আর আকাশে
এক নিরাপদ জীবনের স্বপ্ন দেখে।

॥ অসীম শূন্যতা ॥

জয়ন্ত বিজয় দাশ

কিছুটা দূরে হাত বাড়িয়ে
তোমার মলিন দেহ স্পর্শ করে
আবার ফিরে আসি অচেতন সংসারে।
সেখানে তখন অসীম শূন্যতা........।

এর পর একের পর এক দেখা
প্রিয়জনের অসংখ্য মুখ
চোখে মুখে হিংস্রতার ছাপ ;
তাই, আমার পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়
একটা ছোট্ট শিশুর খেলাঘরে।

শঙ্কর ঘোষের কবিতা

॥ কর্ত্তব্য ॥

"কর্ত্তব্য নরের নিত্য
স্বার্থ পরিহার,"
আত্মকেন্দ্রিক জীবন নহে
সবার উপকার।
সুখ, দুখ তুচ্ছ, এ সংসারে
বৃথা করে অন্বেষণ।
সবার উপর সত্য
জ্ঞান উপার্জন।
প্রবাসে কাটায় জীবন
বদ্ধ মায়া জালে,
নিভায় জীবন দীপ
আশার কবলে।
মহাজ্ঞানী, মহাজন করে
কীর্তি সুমহান
হৃদয় মন্দিরে পূজে
তাই সর্বজন।

॥ ভালবাসার সঙ্গী ॥

একটি ফুল ফুটল বাগিচায়।
ভেবেছিল নিঃসঙ্গ, কিন্তু বাতাসের দোলায় খোঁজ পেল
প্রতিবেশীর, পরশ পেল তাদের, পেল কিছু সান্ত্বনা।
সূর্য্য উঠল, সোহাগ ভরে মুছে দিল তার শিশির অশ্রু।
ভ্রমর এল, সোহাগে নত হয়ে জানালো তাদের নিমন্ত্রণ।
সযতনে কোলে দিল ঠাঁই।
দিনান্তে, বিভাহীন, মলিন তনুখানি নত হয়ে চেয়ে নিল ক্ষমা।
বৃন্তচ্যুত হয়ে ঝরে পড়ল মাটি মায়ের কোলে।

শ্রীশুভ বাইন

ডাইরির ছেঁড়া পাতা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ লিমেরিক ॥

বল ভাই লিখব কি আর অধিক
দেখতে দেখতে হয়ে গেলাম মস্ত সাংবাদিক।
ঘুরে ঘুরে দেশ বিদেশে
দুর্ঘটনা অবশেষে
উঠে দেখি আমি এক ক্ষুদ্র করণিক॥

॥ ধারাবাহিত ॥

একটা শব রক্ষণাবেক্ষণের ভার
দিয়ে গেল পূর্বপুরুষের দল।
জানালার ওপাশে বাতাস
একটা মরা নিমগাছে আছড়াচ্ছে
ইশারায় ডাকছে আমায়
আকাশ পাঠিয়েছে নিমন্ত্রণ
তার মাঝে হারানোর।
নক্ষত্রের ব্যাপ্তি আমার দ্বারে
একটি আলোকিত পথ!
তবুত হবে না যাওয়া
অনুপস্থিত উত্তর পুরুষ
কার হাতে দিয়ে যাব ভার
এই শব রক্ষার
হে মহাকাশ, আমায় ক্ষমা ক'রো।

মনে রেখো ॥

কল্যাণ মুখোপাধ্যায়

মনে রেখো আমিও ছিলাম—
হতভাগাদের দলে
হতাশার গান গেয়ে
মিছিলেতে সারি দিয়ে
আমিও ছিলাম ॥

মনে রেখো আমিও ছিলাম—
প্রতিবাদ জানাতে এসে
রাজপথে রক্ত করবী যারা—
করে গেল দান,
তাদের দলের দলী আমিও ছিলাম ॥

মনে রেখো আমিও ছিলাম—
জননীর বুক কাটা আর্তনাদ
প্রেয়সীর অশ্রুজল—
যেইদিন রাজপথে বিকিয়ে গেল
পেল না তার এতটুকু দাম
তাদের দলের দলী আমিও ছিলাম ॥

আমি কবি—
যত হতাশার আর বেদনার
আমি যে তাদের জাত ভাই
মৃত্যুরে আমি করিনা তো ভয়—
মৃত্যুরে আমি চুমু খাই ॥
আমি ছিলাম, আমি আছি
তোমাদের কবি হয়ে—
আমি চিরদিন বেঁচে থাকবো ॥

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

॥ মধ্যবিত্তে ট্র্যাজেডী ॥

পথের শেষে, তালে তালে নেচে উঠে উল্লসিত শব্দবান
গভীরে তার রক্ত মাখানো হাতের ছাপ
করছে ইন্দ্রজাল বাচাল এটি কপাট।
যেমন থার্মোমিটারের পারদ উঠা নামা নামা উঠা ক'রে
শেষে রোগীকে করে রোগ মুক্ত।
অথচ পরে তাঁর মনেই থাকেনা একদিন
কোন কারণে ডেঙ্গু জ্বরের মতো কোন কিছু একটা হয়েছিলো।।
আবার
মনের শেষে, অনেক আতংক কাঁপে
রাত্রিদিন ঘুমহীন চোখের উপর :
নিদ্রালু শিয়রে আমার কোন প্রতীক দেয় ডাক,
কবি উঠো আর ঘুম নয়, এবার লেখো
আমাদের মত সর্বহারার কথা।
পরের দিন কিন্তু নিদ্রা কাটতেই দৈন্য সংসার দেখে
আমি সোমনাথ, অন্যের ক্রীতদাস হ'য়ে
স্বপ্নের কথা বিলকুল ভুলে যাই।

॥ বিবক্ষা ॥

আমার মন কাঁদে একটানা তোমার দুঃখ দেখে ;
যদিও ইচ্ছে হয় এই মুহূর্তে তোমার অংশীদার হ'লে ভালো হতো।
যেমন মেঘ আনে রসবার্তা ধরা ক্লিষ্ট ধরনীর বুকে
যেমন কাক জটলা পাকায় স্বজনের মৃত্যুতে—তেমনি ঐরকম

কিছু একটা করতে পারলে
অন্ততঃ মনের কাছে শান্তি পেতাম।

'বিবেকের আর্তনাদ প্রতিধ্বনি তোলে
কালের অতল গহ্বরে—শান্তি যেখানে পরাভূত।
আমি 'দোষ' তাই নিবীড় দুঃখে নির্যাতিত হয়ে
মঙ্গল গ্রহে পা বাড়ায়।
যেহেতু মন্ত্রোউচ্চারনের প্রথম শব্দটি ভুলক্রমে
ছুঁড়েছি মঙ্গলগ্রহের প্রাঙ্গনে।

আহ্নিক গতিচক্রে বিবর্তিত সমাজসত্বা।
দেখতে দেখতে যেমন ফুরিয়ে গেল ১৩৭৮ সাল
....আবার পলমুহূর্তে '৭৯—প্রভাত গ্রীষ্মের উত্তাপ ছিল।
বুঝিবা 'ভালবাসা' শব্দটিও হারিয়ে যায় সেই ভাবে।

॥ রহস্য সন্ধানী ॥

শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত

আজি এ নিঃসঙ্গমন ভর করি রাত্রির পাখায়—
চলিছে আপন মনে অজানা হইতে অজানায়!
কে তারে দিয়েছে ডাকি কোন দিক হ'তে দিগন্তরে,
কাহার বন্দনা-গানে চিত্ত তার উঠিতেছে ভ'রে
কিছুই জানিনা। শুধু সীমাহীন সম্মুখের পানে--
জানি সে চলেছে কার অন্তহীন-ব্যাকুল-সন্ধানে।
অর্দ্ধরাত্রে নামে ঘুম সঙ্গীহীন চাঁদের নয়নে;
তারার প্রদীপ জ্বালি সীমাহীন-সুনীল-শয়নে

রাত্রি সে তপস্যা করে একাকিনী শয্যাতলে জাগি
আলো মাখা, পাখী ডাকা, পুষ্পে ভরা প্রভাতের লাগি !
মন মোর রহস্যে আজি আর মুগ্ধ নাহি হয়,
নবতর এ রহস্যের অন্তহীন কোন পরিচয়
আজি সে লভিতে চায়, তাই শুধু সম্মুখের পানে—
শ্রান্তিহীন চলিয়াছে অজানা সে কাহার সন্ধানে ॥

আমার প্রেমের মৃত্যু হলো ॥

মহাম্মদ হাফিজ

বাইশটা বসন্ত ধরে তোমাকে আমার ভালবাসা দিয়ে ছিলাম
তবু তোমার মান ভাঙেনি তুমি ভালবাসনি,
দৃষ্টির শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে আমার যন্ত্রনা কে দেখেছো
আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তামাসা করেছ........
আমার ভালবাসার সঙ্গী তবু হওনি ॥
তোমাকে নিয়ে রূপকাব্য লিখব বলে রূপ সাগরে ডুবতে আমি চেয়েছি
এখন তুমি লজ্জা রাঙা ঘোমটা তবু খোলনি—
বার বনিতার মত বিবস্ত্রা হয়ে রূপের বাহার। তুমি নিয়েছ
'সোনার কাঠি' সঙ্গে রেখে দেশ দেশান্তরের রাজপুত্তুর-স্বপ্ন দেখে
আমার মত কবি রাজার কাব্য রানী হতে চাওনি ॥
দিন দিন কত দিন আমি তোমায় লায়লা মজনুর প্রেমের কাহিনী
শুনিয়েছি
তবু তোমার মনে প্রেমের বাঁশী বাজেনি—
তুমি ভালবাসনি—!
অবশেষে 'রূপোর কাঠি' এসে স্বপ্ন দিলে ভেঙ্গে
আমার প্রেমের মৃত্যু হলো সাত সাগরার তের নদীর পারে ॥

॥ স্কেচ ॥

পুলিন চক্রবর্ত্তী (শ্রীভোলানাথ)

আমি ম'রে গেছি।
আমি মৃত :—
আমি দেখছি, স্পষ্ট দেখছি
আমার মধ্যে পচন ধরছে ক্রমে,
আমি পচে যাচ্ছি।
গলে গলে দিন থেকে দিন
খসে পড়ছে
আমার এক দিনকার
অনেক সুযত্নে তৈরী
রক্ত-মাংস-চর্বি :- সব

আমি দেখতে পাচ্ছি—
অনেক কবরের মাঝে
আমিও তো কবরে শায়িত—
অন্তিম শয়ন-স্বপ্নে।
আর, আমার এ'দেহটা ক্রমে
নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাচ্ছে
ধরনীর ধুলি-কণা সনে
কণামাত্র চিহ্ন না রেখে।

আমি কবরের মাঝ থেকে
অনুভব করছি
আমার হৃদয়ের স্পন্দন,
আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস।
আমি জোর করে বলতে চাই
আমি বেঁচে আছি—

আমি জীবিত ;—
আমার মন বলছে, তাই।
কিন্তু........
আমার বিবেক ?
নিষ্ঠুর বিবেকের ও'যে
তিক্ত-রূঢ় কঠিন নির্দ্দেশ, —
"তুমি মৃত"।
এ'দুয়ের মাঝে
সোচ্চারিত হ'য়ে উঠে আমার মনের কথা-
(সবার প্রাণের কথা)
আমি বেঁচেও নেই, আমি মরিওনি :—
আমি বেঁচে মরে আছি।

॥ রিলিফরোড পার হয়ে ॥

অলোক ভাদুড়ী

অন্ধকারের কীটদের
আমার বড্ড ভয়
কেননা রাত চলা পথে
হাততালি আমার সম্বল।
অথচ এই নিঃছিদ্র অন্ধকারে
বুঝিবা আকাশের চাঁদও-ফাঁকি দেয়
নির্বোদ এ পৃথিবীকে।
দ্বারে দ্বারে যখন
অসংখ্য আলোর প্রতিশ্রুতি
মাথা ভাঙ্গে—
গ্রামীন উন্নয়ণ সমিতি চৌকাঠে
তখন স্বপ্নগুলো—নাছোড় বান্দা
রিলিফরোড পার হয়ে
অন্ধকারে আলো চায়।

। একটি পাগলের জন্য ॥

গোপীনাথ দাস

অফিস পাড়ায় কেরানীর মিছিলের ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া বেকার আমি।
যেন নতুন স্বপ্ন বাসি ফুলের মালা।
অন্ধকার গলির পাশে রুগ্ন কুকুর ছানার বাসা ;
আমার বাসাটা ঠিক তারই মতো।
"আমি" মানুষ কুকুর,
চাল নেই চুলো নেই, শুধু ভবঘুরের মতো,—
ঘুরছি এই পৃথিবীর ঘূর্ণিপাকে ;
হাজার মানুষের চাকরীর স্লো-গানে—
হারিয়ে যায় আমার বুকভরা আশার বানী।
অলকা বলেছিলো "তুমি বড় শিল্পী হবে !"
হেড পণ্ডিত বলেছিলো "অপূর্ব্ব স্ট্যাণ্ড করবে" !
বাবা বলেছিলো "ছেলে ইঞ্জিনীয়ার হবে" !
'মা' মরার সময় বলেছিলো "অপুকে ডাক্তার করো" !
পাড়ার লোক বলত "ছেলেটা সাহিত্যিক হবে" !
প্রায় সবার কথাই ভুল হ'লো-আমি বেকার রয়েছি।
'আমি' সমাজ বিরধী।
অন্ধকারের গুণ্ডা কিংবা ওয়াগান ব্রেকার,
অফিসের ভীড়ে ট্রাম অথবা বাসের পকেটমার।
শেষে কিন্তু অলোকার কথাইঠিক হ'লো—
আমি শিল্পী হয়েছি।
কখনও রাজ্য পথে, কখনও ফুটপাতে 'আমি'
ছবি আঁকি,—
রাম-রাবনের যুদ্ধ কিংবা হনুমানের লাফালাফি
সব শেষে এক কথা,—
আমি পা গ-ল হয়েছি।

ব্যার্থতার ইজেলখানা ॥

দেবাশীষ দাস

বৃষ্টি ধোয়া সকালের—
সোনাঝরা রদ্দুর,
ফুটে ওঠা শেফালীর
ভরা মুখ হাসির মত—
উঁকি দেবার আগেই ;
রঙ, তুলি আর
নিষ্কলঙ্ক ইজেলখানা নিয়ে—
বসে যাই সমুদ্র বেলায়।

সারাদিন বসে থাকি—
ছবি দেখি ;
সুবিশাল সমুদ্র ঢেউ-এর দোলায়।

থেকে থেকে বেলা বাড়ে ;
ক্লান্তির রাশ জমে ওঠে—
দু'চোখের পাতার কোনায়।
অবশেষে, সূর্য হেলে পূব থেকে পশ্চিমে,
দিগন্তে আঁধারের দেখা মেলে।
শীতল হৃদয় আর
ভারি পা দুটো নিয়ে—
উঠে দাঁড়াই।
নিস্কলঙ্ক ইজেলখানা—
নিষ্কলঙ্ক-ই থেকে যায়।

॥ সুভদ্রা ॥

দ্বারকার পথে ছিল কি বসন্তগান মঞ্জুরিত পুষ্পবনে ছিল কি সেদিন
ভ্রমর-গুঞ্জন ; যেদিন তোমার মনে এসেছিল ধনঞ্জয় অতি সংগোপনে ?
ছলনায় কবি তাঁরে বশ, করেছিলে স্বামীত্ব বরণ ; সুকোমল ভুজ বলে
চালায়েছ গাণ্ডীবীর রথ, সেই ক্ষণ দ্বারকা নগরী হ'ল মহা রনাঙ্গন।
নববধূ সাজে সাজাইলা ধরনীরে নবরক্ত দিয়া ; মুগ্ধ কবি গাণ্ডীবীরে
প্রেম সম্ভাষণে। ভাষায়ে নয়ন জলে কত কুল ললনায় আপনার জলে
পড়িলে সিন্দুর বিন্দু অতি দর্প ভরে ; কুলিশ কঠোর হাতে জনমের তরে
কেড়ে নিলে সকলের সিঁথীর সিন্দুর এত কি নির্মম তুমি এত কি নিষ্ঠুর ?
কত জননীরে করিয়াছ পুত্রহীনা, তবু ক্ষণিকের তরে তব মনবীণা
বলে নাই ব্যাথিতের করুণ ক্রন্দন হয় নাই হৃদিমাঝে ব্যথার স্পন্দন ?
ধন্য তুমি! ধন্য তব প্রেমের বাসনা, চরিতার্থ করিয়াছ হৃদয় কামনা,
বহায়ে রুধির ধারা দ্বারকা নগরে পার্থের অপরাজেয় কোদণ্ড টংকারে !
তুমি বীরাঙ্গনা, সে তো আমি জানি শ্রেষ্ঠ বীর জায়া ; তবুও কেমনে মানি
স্নেহময়ী জননীর জাতি তুমি নও ? প্রেমিকের প্রিয়তমা যদি তুমি হও
কেমনে ডুবায়ে দিলে সোনার সংসার দ্বারকার শতশত কুল ললনার ?
ক্ষুদ্র নয় আমি দেবী। নাহি গঞ্জি তোমা অপরাধ যদি হয় করে দিও ক্ষমা
মাতৃস্নেহে। উদ্বেলিত প্রেম যৌবনের যদি সত্য হয়, তবে এই ধরণীর
বক্ষে প্রতিদিন হাজারো প্রেমের কলি নির্মম সমাজ কেন পদতলে দলি
করিছে নির্মূল ? এসো তবে বজ্র হয়ে সমাজের ক্রুর শক্তি ভস্ম যেন হয়।
জ্বালাও প্রেমের বহ্নি বাববাগ্নি সম পোড়ায়ে ফুড়ায়ে দাও অতি ক্ষুদ্রতম
সমাজের বাধা বিঘ্ন। যুগ যুগ ধরে প্রেমের পূজা হোক মন্দিরে মন্দিরে।

॥ পরিবর্ত্তন ॥

তোমাকে পেয়েছি না পাওয়ার মাঝে
তোমাকে জেনেছি অজানার মাঝে
এই তো আমার সান্ত্বনা ;

তুমি আছ জীবন মরণ ছায়ে
চির গতিময় মহাকাবের নায়ে
তাই তোমারে করি বন্দনা ।

তোমার রথখানি না চালিত যদি
রুদ্ধ হ'ত গতিময় সৃষ্টির গতি
মহালোক হ'ত গতিহীন ;

হ'ত না নদীর কলতান
জানিত না বনে পাখীর কলগান
বারিধি হ'ত তরঙ্গ বিহীন ।

বহিত না দখিনা সমীর
সুরভি আসিত না দ্বারে মোর
চলিত না চন্দ্র সূর্য্য তারা ,

আলো ছায়া দিবারাত্রি
যত বিশ্বলোকের যাত্রী
হ'ত সবে গতিহারা ।

ব্যথা ভরা জীবনের মাঝে
এসে তুমি মরণের সাজে
নব জন্ম করিতেছ দান ;

তুই শত তেত্রিশ

ধ্বংশের মহা রনাঙ্গনে
প্রতিদিন প্রতি পলে পলে
বাজাত সৃষ্টির জয়গান।

তুমি আছ বন বনান্তরে
অতি ক্ষুদ্র অঙ্কুর ভিতরে
তাই বিশ্ব চির গতিময় ;

সর্বভূতে বিদ্যমান
আছ তুমি সুকল্যান
তোমারি হউক জয়।

না, না ;   তোমার না হোক জয়
রুদ্ধ হোক চির গতিময়
প্রবাহ তোমার, মায়াহীন ;

আড়ালে বসিয়া বার বার
মানুষের সুখের সংসার
ভাঙ্গিতেছ তুমি রাত্রি দিন।

ছোট শিশু ফুলের মতন
নিয়া বক্ষে করিছে চুম্বন
স্নেহময়ী জননী তাহার ;

বাসনা-কামনা সেথা নেই
ত্যাগের প্রতিমূর্তি এই
একমাত্র অনন্ত সুন্দর।

মাতৃ ক্রোড় হ'তে কেড়ে নিয়া
ছোট শিশুটিরে কী মন্ত্র দিয়া
পাঠাইলে যৌবনের দ্বারে ;

পুত্র পরিবার ছেড়ে শেষে
চলিল সে তোমার আদেশে
অন্ধকার মরণের পাড়ে।

প্রতিদিন রবির কিরণে
কুসুম বিকসি বনে বনে
মুগ্ধ করে ভ্রমরের দলে

যখন ঘনায়ে অন্ধকার
বন্ধ করি হৃদয়ের দ্বার
ঝরে পড়ে শুস্ক ধুলিতলে।

বিরহী ভ্রমর দ্বারে দ্বারে
গুঞ্জরিয়া রাতের আঁধারে
ডেকে বলে 'কোথা তুমি প্রিয়া'...

প্রতিধ্বনিয়া বাতাসে ভাসিয়া
বলে দেয় নিকটে আসিয়া
'পরিবর্ত্তন গেছে তারে নিয়া

আষাঢ়ের নব মেঘদলে
বিরহীয়া প্রিয়া লাগি বলে
প্রেমবাণী যক্ষের মতন,

এ শান্তনা তুমি না সহিলে
শরতের সোনালী সকালে
মেঘমালা করে পলায়ন।

বসন্তের নব আগমনে
কোকিল মধুর গানে গানে
চারিদিক মুখরিত করে,

শুধু দুটি মাস পরে তার
রুদ্ধ হ'য়ে যায় কণ্ঠস্বর
জেগে রয় বেদনা অন্তরে।

নীরবে অদৃশ্য হাত দিয়া
একে একে নিতেছে তুলিয়া
সুখের কুসুম বৃন্ত হ'তে ;

তুমি স্থির, তাই চলমান
অসীমের মাঝে এ ভুবন
শুধু তুমি সত্য পৃথিবীতে।

॥ সভ্যতার দ্বার ॥

নির্মল কুমার মাইতি

ইস! ছিঃ. ছিঃ, বুঝেও বুঝলে না কেউ,
ঐ বিরাট অট্টালিকার পাশে কেন ভিখিরীটা দাঁড়িয়ে থাকে ?
তাই, আমি দেখাতে চাই—তোমাদের চোখে আঙুল দিয়ে।
ঐ দ্যাখো! দ্যাখো তোমরা!! খাওয়ার শেষে এঁটো পাতাগুলো
যারা ফেলিয়ে দিল ভুলে তারা দেখল না ঘুরে ফিরে,
কুকুরের সাথে মারামারি করে, ভিখিরীটা লেগে থাকা ভোজ খায়.
জীব দিয়ে চেটে চেটে। ঐ অট্টালিকার ওপর থেকে
কারা যেন দেখে দেখে, হিঃ হিঃ করে হাসে।
তোমরা বল, ওরা আবার আজ, কোন সভ্যতার দ্বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে
ইশ! আবার, ঐ দ্যাখো!! বাবুর ট্যাক্সিটা গেল না দেখে শুনে।
ধাক্কা খেয়ে ক্ষুধার্থ ভিখিরীটা, হুমড়ি খেয়ে পড়ল গাড়ীর তলে,
পাকা কলার মত গেল পিশে। তখন সেই মুহূর্তে' গেল মারা
পেটে ক্ষিদে রেখে। এই দেখে, ওপরের বাবুরা হাসল জোরে জোরে।
ওদের মারলে. ওদের বলার কে আছে ; ওদের মায়েরাও. বাবুদের ছেলের মত
বাঁচায়েছে স্তন দিয়ে।

দুনিয়ার সংগা ॥

বৃন্দাবন গুছাইত

ধ্যান, জ্ঞান, শিক্ষা
সবই আজ ভূয়া।
আছে শুধু ভোজবাজী
আর আছে জুয়া।
দিনরাত জুয়া চলে
নেই ভালবাসা।
পৃথিবীতে এসে শুধু
বৃথা কাঁদা হাসা॥
শত্রু মিত্র বলে
নেই কিছু যার॥
সংগা হচ্ছে সেটা
এই দুনিয়ার॥

বন্ধু ভেবে যে লোকে
ছুটে যায় মিছে।
তারাই ঘুরছে শুধু
স্বার্থের পিছে।
বন্ধুর তরে কিছু
দিতে নয় রাজী
দুনিয়াতে দিনরাত
চলে ভোজবাজী।
পৃথিবী আর্সি আর
লোকগুলো কংগা
ভোজবাজী, টাকা, জুয়া
দুনিয়ার সংগা।

■ পলাতক

সাথী রায়

শংপুর খাঁজে খাঁজে অনেক বিস্ময়
সমতল—অসমতলের বিচিত্র রহস্য
খামীরা পাহাড়েব বনাঢ্য
পাহাড়ের আহ্বান
আমার প্রথম বসন্তের আলোড়ন
তোমায় আমি ভুলিনি 'লাইসি মা',
কোলকাতার ধর্মতলাব জনারণ্যে মুহূর্তে
আমায় চমকে দেয়,
"কোলকাতা তুমি বোঝনা রন্‌জন"
আমি কাপুরুষ পালিয়ে এলাম,
সাথে গোধুলি গোলাপের পরশ,
তোমার যৌবন খাজে, তীব্র মহুয়া নির্য্যাস
আমায় পাগল করেছিল,
সমতলের সমান আজ আমি ছাড়তে পারছিনা,
সে কি ব্যর্থতা আনলো তোমার মনে ?
মাওলাই এর মিষ্টি স্মৃতি, রাংগা ঠোঁট,
আপেলের মতো কাপাল, বুকে ছুরি
পিঠে বোঝা, হাতে পানের পসরা
বোঝা ঢাহনী নিয়ে, পায়ে বন্য বন্য
গন্ধ নিয়ে পুলিশ বাজারের সেই
নির্দিষ্ট জায়গায় আর অপেক্ষা করোনা
ভুলি যেও সমতলের একটি মিথ্যে
কথা, স্তোক. আমি ফিরবো সিমা,
"তোমাকে ভালবাসবো এ দৃঢ় প্রত্যয়
তোমায় নিয়ে ঘর বাঁধবো, এও প্রত্যয়"

॥ আমরা বেকার ॥

অলোক কুমার নন্দী

আমরা বেকার— দুর্বিষহ জীবনের এক অভিশপ্ত অধ্যায়।
ট্রামে-বাসে, শহরে-নগরে গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্রই
বেকারের স্রোত জীবনের অবিশ্রান্ত ধারায় প্রবাহিত।
লক্ষ লক্ষ সতেজ প্রাণগুলো শুকিয়ে মরে প্রাণের নিরুত্তাপে
বেকারের হাহাকারে। নিরুপায়-নিঃসহায়-নিঃসম্বল
দৈন্য, হতাশা আর পরাজয়ে তারা অচঞ্চল।
হতাশার গ্লানিতে আর অন্ধকার ভবিষ্যতের আতঙ্কে শিউরে উঠে,
কখনও বা রাজনীতির পঙ্ক ছায়ায় নেয় আশ্রয় কেউ বা উদভ্রান্ত চিত্তে
রঙীন আশার মোহে হয় ওয়াগন ব্রেকার, সাজে সমাজ বিরোধী।
হয়ত নিরর্থক জীবনের শেষ সান্ত্বনা সত্ত্বেও জীবন দেয় রেলগাড়ীর তলায়।
তবুও অসংখ্য হতাসা-দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত বেকার
বলিষ্ট জীবনের আশায় দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়
দুর্বার বাঁচার তাগিদ তাদের সান্ত্বনা জোগায়।
প্রতিনিয়ত সংকটের আবর্তে বিষাক্ত জীবন,
ভাব-প্রবন যুব-মানস উৎক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত,
যৌণ-সর্ব্বস্ব আচরণ অপসংস্কৃতির অবধারন।
তেজী সংগ্রামী মন নিরাশা কাতরে
প্রলুব্ধ, অপ্রগলভ। যদিবা কেউ
অমানবিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম-মিছিলে— লাঠি আর গুলি
অথবা বন্দি হয় শোষকের শৃংখলে। প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি
মিলিয়ে যায় ক্ষণিকের দুর্গতিতে—
স্বপ্নের হৃদয়টাকে ঝাঁঝরা করে দেয় মুহূর্ত্তে। তবুও—
আমরা দাঁড়িয়ে আছি নির্ভয়ে জীবনের শূন্য মরু উদ্যানে
বিদ্রোহের ধ্বজা নিয়ে।

দুই শত ঊনচল্লিশ

॥ সৈনিক ॥

দুর্গাপ্রসন্ন মালাকার

নির্ভিক এক সৈনিক আমি, এগিয়ে চলেছি আজো,
মা তুমি মোর, মরণ এনেদিও তোমারী চরণ তলে,
শত্রু যদি কভু তোমারে শৃঙ্খল পরাতে আসে পায়ে
তার আগে করিব শিরচ্ছেদ শানিত তরবারে।
যাহারে শৃঙ্খল পরাতে পারেনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ
আমি কেনো চলো সেই সেবাহতে রইচো দূরে আজ
মানব কূলে জন্মলয়ে যারে চিনেছি মা বলে.
তার থেকেও যে বড় যে জেনেছি জ্ঞান হলে।
তাই আজ এক সৈনিক হয়ে দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে
সীমানার পাশে চাহিয়া রই, শত্রুর অন্বেষণে।
যদি সে কভু এসে যায় মাগো তোমারী ভূমি মাঝে
দিও শক্তি মাগো, তুমি আঁড়াল হতে নির্ভিক সন্তান বলে।
এই আশির্ব্বাদ তোমা কাছে, মাগো আমি চাই
মা'য়েও যেনো হৃদয় মাঝে একটু শক্তি পাই
দুঃখীনী মায়ের ছিলামগো আমি, অভাগা এক সন্তান.
সেই মায়ের শেষ লাগি উজাড় করেছি প্রাণ।

॥ হারানো প্রেমিকার সন্ধানে ॥

পবন কুমার মাহাতো

প্রিয়তমা, যদি মোরে মনের গহন নিভৃত দ্বারে
ঠাই দাও এতটুকু। কি বলে কইব তুলে জানো
শুধু বলবো ওগো শোন, এসেছে তোমার হারানো প্রেমিক
এইটুকু শুধু মানো।
যেদিন তোমারে ছাড়ি গেনু লণ্ডনে
শিক্ষার তরে রাশিয়া জাপানে। সত্যিই হয়েছিলো মনে দুঃখ
তবুও জানিনা কেন আমায় নিয়ে গেল কোন পথে।
একাকী নিভৃতে শয়নে স্বপনে নয় জাগরণে
নয়ত লেকে কিম্বা বাগানে। তোমার ছবিটা এগিয়ে এসে বলে
ওগো যেওনা, বাঁচাও মোরে। যেতেছি যে ভেসে স্রোতে।
যদি কোন রেস্তোরাঁয় কিম্বা হটেলে
কোন রূপসী আমায় বলে, Are you my party
O, come please my darling, please come.
তদা মনে পড়ে তব কথা যেদিন মহুয়ার ছায়াতলে
মধুময় আবেগে জড়িয়ে মোরে বলেছিলে, O, boy I am very naughty
না ?

কিন্তু কেন, বলনা। Please solved the sum.
এমনই হেথায় কত নিশিদিন করেছি প্রেমের খেলা
শুধু তোমার ছবিকে ঘিরে। কিন্তু মনে জাগে শুধু একটি কথা
এলো নাকি কেউ টোপর মাথার দিয়ে তোমায় করতে বিয়ে।
তোমার রূপের তুলনা হয়না খুঁজেছি রূপের মেলা
তাইতো ফিরেছি তোমারই দ্বারে। উড়িয়ে দিয়ে বহু সহস্র ব্যথা
এসেছি তোমার বক্ষে বাঁধিতে বাসা সুমধুর মধু নিয়ে !

গোপা মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

॥ রাধা ॥

এ ঘোর জামিনী চমকে দামিনী মুখরা পূবালি বায়।
কুলের কামিনী রাধা বিনোদিনী শ্যাম দরশনে যায় ॥
আকাশে অশনি গরজিয়া ওঠে রাতুল চরনে কণ্টক ফোটে
বারি বরিষণে সিক্ত বসনে শ্যাম গুণ গান গায় ॥
শ্যামের প্রেমেতে পাগলিনী রাধা নাহি মানে আজ কুলের বাধা
মনিহারা ফণি হয়ে রাধারাণী কোনদিকে নাহি চায় ॥
শ্যাম মুখছবি হৃদয়েতে হাসে কমল আঁখি দুটি অশ্রুতে ভাসে
দু বাহু বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে শ্রীমতী দেখিতে পায় ॥

॥ যুগের দাবী ॥

মিল ও ছন্দে দিতে হবে বাদ
কবি হতে চাও যদি গো আজ।
ভাঙ নিয়মের বন্ধন যতো
ঘরে ঘরে গড় কবি সমাজ।

মোরা হব কবি বিনা আয়াসেই
ধন্য ধন্য গাবে সমাজ।
আমরা ঘুচাব বুর্জোয়াদের
যত অবিচার মিথ্যা সাজ।

আমাদের দাবী মানতেই হবে
বুঝি বা না বুঝি কাব্য আর॥

মনে যাই হবে লিখে ফেলো স্রেফ
মিলবেই তার সমঝদার।

ভাষার অভাবে কাব্য চর্চা
বন্ধ করতে হবে না আর॥

দেশী ও বিদেশী খেস্তি খেউড়
আজি কাব্যের অলঙ্কার॥

অশ্লীলতারে যে যতো ফোটাবে
ততই উচ্চে আসন তার॥

কি বলিতে চাও যজে না বুঝিবে
তারে দেবে ততো শ্রদ্ধাভার॥

রাবিন্দ্রীক যুগ হয়ে গেছে গত
নেই কোন দাম এ যুগে তার॥

কবি ও পাঠক সবাই নব্য
নাব্য তাদের আবিস্কার॥

। চাহিবার নাই কিছু আর ॥

মুক্তি দিয়েছ তুমি সব দায় থেকে
চাহিবার নাই কিছু আর

কবরের শান্তিতে যেন গো ঘুমায়
চির অশান্ত আত্মা আমার।
মোর, চাহিবার কিছু নাই আর।

হরিণী মনটা কেঁদে বলে
কেন মিছে মায়াতে জড়ালে
এ বাঁধন ছিঁড়ে কোন দিন
বল সে জীবন পাবকি আবার ?
মোর, চাহিবার নাই কিছু আর।

দুই শত তেতাল্লিশ

পৃথিবীর ধুলা কাদা মেখে
হেঁটেছি অনেক পথ আমি।
দেখেছি দু'চোখ ভরে
পাহাড় সাগর মরুভূমী।
কত কথা গান হয়ে বাজে
আমারি এ হৃদয়ের মাঝে।
স্মৃতিগুলো সুর হয়ে যেন
নাম ধরে ডাকেনা আবার।
চাহিবার কিছু নাই আর।

॥ আমার যে ॥

সাগরের ঢেউ কে পারে গুনতে
কে পেয়েছে তল তার!
কি হবে তাহারে পিছু থেকে ডেকে
মিছে গেঁথে ফুলহার ॥
দেখ, নীতি আঁকে ছবি বেল ভূমি কব
আপন হিয়ার তার।
হেলাভরে সবি মুছে দিয়ে যায়
ঢেউ দিয়ে বার বার।
মনের মাধুরী মনেতেই থাকে
দেখিবে কেমনে তায়!
পদ্ম দেখেছ সৌরভ তার
দেখেছ কি কভু হায়?
সিন্ধুর কাছে বিন্দু সুধায়
কি গান শোনাব বলনা আমায়।
কত নদী গান গিয়েছে শুনায়ে
হিসাব কি আছে তার।
তবে, কি হবে তাহারে পিছু হতে ডেকে
মিছে গেঁথে ফুলহার!